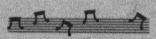
অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক
অনিল লিথোগ্রাফিং কোং, ১৩ শশীভূষণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত এবং কৃষ্ণনগর
আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত

বাবা ও মায়ের সঙ্গে সাতবছরের শচীন কর্তা



উৎসর্গ

ব্রজেন বিশ্বাস, 'ব্রজতরঙ্গ'-র স্রষ্টা

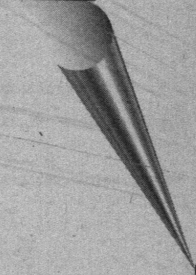


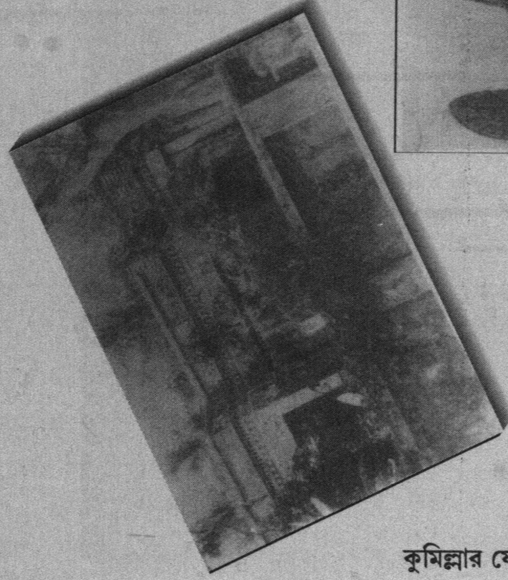
বারো বছর বয়সে শচীন কর্তা

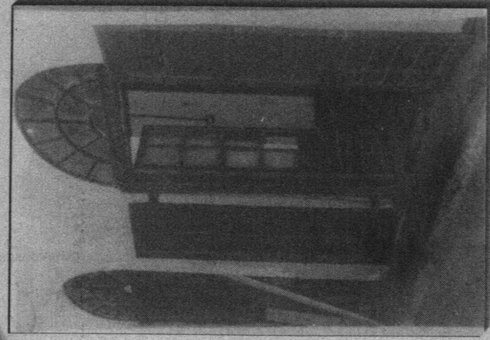


রাজপোষাকে শচীন কর্তা













কুমিল্লার যে বাড়িতে শচীন কর্তা জন্মেছিলেন তার নানা অংশের দৃশ্য

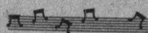
প্র. কা. শ. কে. র ক. থা

বহুকাল পুষে রাখা স্বপ্ন সফল হল আমাদের প্রকাশন সংস্থার ; সেই সঙ্গে, আমরা মনে করি, ত্রিপুরা তথা সমগ্র বাংলাগানের শ্রোতা-রসিকজনেরও। ত্রিপুরারই কৃতী সন্তান বন্ধুবর শ্যামল চক্রবর্তীর দীর্ঘকালের পুষে রাখা ইচ্ছে আর আমাদের স্বপ্ন মিলেমিশে একাকার হয়ে প্রকাশিত হল বহু প্রতীক্ষিত, (কারণ আমরা বিশ্বাস করি, এই কাজটি যে কোন বড় সংস্থা অনেকদিন আগেই করতে পারত) 'ভাটি গাঙ বাইয়া'। বাংলাগানের যারা নিবিষ্ট শ্রোতা তাঁদের কানে এমনকি রক্তপ্রবাহে মিশে গেছে শচীন কর্তার গান। তাঁদের অনেকেই চাইছিলেন কর্তার জীবন ও গান নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হোক। আমরা তাঁদের ইচ্ছে ও প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পেরেছি সেটা সময়ের বিচার। এখানে তাঁদের কথাও উল্লেখ করি যাঁরা নিয়ত পাশে থেকে আমাদের সহায়তা করেছেন। অঙ্কুর দেববর্মণ, রবীন সেনগুপ্ত, রমাপ্রসাদ দত্ত, গিরীন্দ্রশেখর মজুমদার, পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়, বাপী রায়চৌধুরী, মনোজ সর্দার (যে খুব কম সময়ে বইটির ডিটিপির কাজ করে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছে)—এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রথিতযশা শিল্পী দেবব্রত ঘোষ-এর কাছে। তিনিও কর্তার একজন গানমুগ্ধ। প্রমাণ তাঁর সৃষ্টি, প্রচ্ছদ।

শুভব্রত দেব

আগরতলা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০০

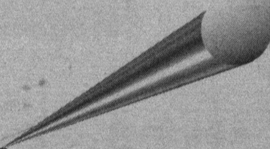
শচীনকর্তা স্ত্রী মীরাদেবীর সঙ্গে
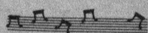


লেখকের অন্যান্য বই

তিনি নতজানু হবেন (কাব্যগ্রন্থ)
জিন জীবন ক্লোনিং, পথের শেষ কোথায়
বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী
পরমাণু মহাভারত
ডি. এন. এ. যুদ্ধ
পরমাণুর অন্দরমহল
বরণীয় বিজ্ঞানী
বিজ্ঞানের পৃথিবী, বিজ্ঞানীর পৃথিবী
ধর্ম বিজ্ঞান সংস্কৃতি
বিজ্ঞানের সুখ দুঃখ
আশ্চর্য আবিষ্কার
অবিস্মরণীয় আবিষ্কার
তারায় ভরা আকাশ
বড়ো বিজ্ঞানীর ছোটবেলা বড়োবেলা
সীমানা পেরিয়ে বিজ্ঞান
স্মরণীয় বিজ্ঞানী (যৌথ রচনা)
বিজ্ঞানীর ঘর, বিজ্ঞানীর বাহির
বিজ্ঞান এভাবেই এগোয়
ডারউইনের দুনিয়া ও মুশকিল আসান কম্পিউটার
লুই পাস্তুর
জিন ও জীবনের মানচিত্র
যুদ্ধ চাইনা আর (অনুবাদ)
প্যারিস ই দ্য টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি (অনুবাদ)
আকাশ প্রদীপ (সম্পাদনা)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ (সম্পাদনা)
যে আবিষ্কার পৃথিবী বদলায়
পল রোবসন
মাটির সুরের রাজা আব্বাসউদ্দীন

মধ্যবয়সে শচীন কর্তা





নিবেদন

প্রশ্রয় পেতে থাকলে কেউ কেউ বেশ উদ্ধত হয়ে উঠে। গোপাল অতি সুবোধ বালক। তার কথা উহ্য থাক। মাসির প্রশ্রয়ে রাখাল দুরন্তপনা ছাড়িয়ে দুর্ব্যবহারে মেতেছিল। কেউ কেউ বলবেন হয়তো, রাখালের দশায় আমিও পৌঁছেছি। পল রোবসনের জীবন নিয়ে লিখেছিলাম। সজ্জন পাঠকের অভাব হয়নি। আব্বাসউদ্দিন সাহেবের জীবনকথা লিখেছি, পাঠক আমায় দূরে ঠেলে দেননি। বলতে দ্বিধাবোধ করিনা, পাঠককূলের এমন প্রশ্রয় আমার ঔদ্ধত্যপনা বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশ্রয় যদি দুর্জনের না হয়, সাহসে প্রবৃত্ত হতে আপত্তি কোথায়?

শচীনকর্তার জীবন বৃত্তান্তে মনোযোগী হয়েছি। ত্রিপুরা রাজবাড়ির ছেলে, রাজা মহারাজা হবার কথা ছিল। রাজা মহারাজাই হলেন। রাজপ্রাসাদের সিংহাসনের বদলে মানুষের মনের আসনে অফুরান ঐশ্বর্য ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। এক জীবনে রাজারা আর কতদিন সিংহাসনে থাকেন! শচীনকর্তা কয়েক প্রজন্মের কাছে 'রাজা' হয়ে বেঁচে রয়েছেন। রাজবাড়ির টানাপোড়েনে কুমিল্লার সাধারণ বাড়িতে জন্মাতে হয়। নানা নিশ্চিত-জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে অমসৃণ জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিলেন।
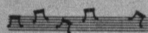
ছোটবেলা থেকে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছেন। জল মাটি জঙ্গলের গান সংগ্রহ করেছেন। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সংগীতগুরুদের কখনও ভুলে যাননি। কলকাতা ও মুম্বাই-দুই মহানগরে সংগীতের অধীশ্বর হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। নগর জীবনে কতোরকমের হাতছানি। প্রতিভাবানদের কেউ কেউ সেই হাতছানিতে সাড়া দিয়ে কেমন কাদা গায়ে মাখেন, কম



ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সঙ্গে আশিস খাঁ



ওস্তাদ বদল খাঁ



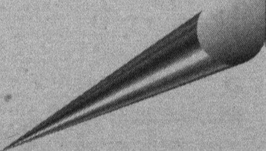
বেশি আমাদের জানা রয়েছে। শচীনকর্তা এমনতরো ভাবনার বাইরে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নিজের সৃষ্টিকে আপোসের হাতে সমর্পণ করেননি। লোকগানের অভিজ্ঞতা আর ধ্রুপদী গানের তালিম তাঁর নানা সৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। সঙ্গীতবেত্তা রাজেশ্বর মিত্র বলতেন না নইলে, 'সমগ্র দেশের কাছে তিনি একটি আইডিয়ার প্রতীক।'

আক্ষেপ হয়, এমন মানুষকে চোখে দেখিনি। আজকাল বড়ো মানুষদের ব্যস্ত ও সৃষ্টিসমৃদ্ধ দিনযাপনের কথা অনুলেখকের কলমেও নথিবদ্ধ হয়। তেমন কেউ এই কাজ শচীনকর্তাকে নিয়ে করার তাগিদ অনুভব করেননি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা জায়গায় নানা বড় মানুষের স্মৃতিচারণা রয়েছে। ফলে অনুভবে তীক্ষ্ণ হলেও পরিসরে সীমিত। মন ভরে না। শচীনকর্তাকে আরও বেশি জানতে ইচ্ছে করে। স্মৃতিচারণার কিছু সাক্ষ্য আমরা এই বইয়ে রেখেছি। আকারে ছোট এক আত্মকথা আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে 'দেশ' সাপ্তাহিকের কয়েকটি সংখ্যায় পরপর বেরিয়েছিল। মুদ্রিত হলে আয়তন খুব ছোট হত না। হয়নি, এ-ও আমাদের কাছে বড় আক্ষেপের কথা। আমার রচনায় আমি নিশ্চিতমনে তাঁর আত্মকথা কাজে লাগিয়েছি। নানা কথা বলার ফাঁকে শচীনকর্তার নিজের মুখের কথা কতোটা দ্যুতিময় হয়ে উঠে, পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন। 'সরগমের নিখাদ' নামের এই আত্মকথা কি দুই মলাটের ফাঁকে মুদ্রণের প্রত্যাশা করতে পারে না? জন্মশতবর্ষের আর দেরি নেই। আমাদের দাবি রইল, এই কাজ কেউ করুন। গানপাগল মানুষ শুধু কেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিকাঠামোর আবশ্যকীয় কর্মের ভেতর কি এই কাজ পড়ে না? বইয়ে আমরা বেশ কিছু আলোকচিত্র সংযোজন করেছি। কিছু ছবি ব্যাকরণের বিচারে অস্পষ্ট, ইতিহাস জরুরি বলে দিতে দ্বিধা করিনি। বলার বাইরে না বলা হাজার কথা থেকে গিয়েছে। অসুর জগতের কেউ কেউ কোন দুর্বল মুহূর্তে সুরলোকের নাগরিক হতে চাইলে বাধা দেবেন কেন? না বলা কথার পাদপূরণ করবেন আগামীদিনে কেউ, এই প্রত্যাশা করতেই পারি।

এই কাজে বহু মানুষ আমায় সহায়তা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশ্বনাথদা ও অরুণাদির কথা বলব। আনন্দ পাবলিশার্স-এর রঞ্জন সরকার যখন যা চেয়েছি, দিতে সংকোচবোধ করেননি। বাংলাগানের বিবর্তন জানতে চাইলে যাঁর কাছে না গিয়ে গত্যন্তর নেই সেই বিমানদা, শ্রদ্ধেয় বিমান মুখোপাধ্যায়ের দুর্লভ স্মৃতিকথা এই বইয়ে কাজে লাগিয়েছি। আগরতলা গিয়ে অনেক সুধীজনের সাথে কথা বলেছি। শ্রদ্ধেয় অঙ্কুর দেববর্মণের স্মৃতি এই বইয়ে সংযোজন করেছি। নানা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন গিরীন্দ্রশেখর মজুমদার। করেছেন ত্রিপুরা বিষয়ক তথ্যের ঈর্ষনীয় সংগ্রাহক পল্টুদা। রমা প্রসাদ দত্ত। জরুরি কিছু লেখালেখি দিয়েছেন প্রাণবান অগ্রজ শিল্পী পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলি।

শচীনকর্তা যাঁকে অফুরাণ ভালোবাসতেন সেই শিল্পী ব্রজেন বিশ্বাস এখনও বেঁচে রয়েছেন। মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিক্ষণ লড়াই করে বেঁচে আছেন। এই বই তাঁকে উৎসর্গ করেছি। ব্রজেন বিশ্বাসের 'ব্রজতরঙ্গ' নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন শিল্পী শুভেন্দু মাইতি।

যৌবনে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়





বইয়ে ব্যবহৃত আলোকচিত্রটিও শুভেন্দুদা-ই দিয়েছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিছক প্রকাশক হলে 'অক্ষর' কেন, কোন প্রতিষ্ঠান থেকেই এমন বই বেরোতনা। গত বছর কলকাতা বইমেলায় শুভব্রত আর দেবব্রতদা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সানন্দে সম্মতি জানিয়েছিলাম। সামর্থ নিয়ে ভাবতেই চাইনি। এমন বইয়ের মুদ্রণ ব্যয় পরিণত দায়বদ্ধতা ও শ্রদ্ধাবোধ ভিন্ন 'অক্ষর' বইতে পারতো না। ত্রিপুরার প্রকাশনাকে যে ক'টি প্রতিষ্ঠান মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছেন নিঃসন্দেহে 'অক্ষর' অন্যতম।

পুরোনো নথিপত্র থেকে যথাসাধ্য সুষমায় আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন দীপক গুপ্ত। বন্ধু দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ নির্দ্বিধায় এই বইয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছে। তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

'স্মরণ' অধ্যায়ের লেখালেখিতে বানান পরিবর্তনে হাত দিইনি কোন। পাঠকের বিভ্রান্তি হতে পারে ভেবে বিষয়টি উল্লেখ করছি।

আমাদের দেশে শচীনকর্তাকে ভালোবাসার অনেক মানুষ রয়েছেন। তাঁদের অভিমত পেলে শচীনকর্তার জীবনচিত্রণের কাজে যুক্ত সব বন্ধুরাই আনন্দিত হবেন। আমার কথা আর আলাদা করে বলব কেন?
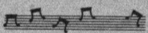
১, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

শ্যামল চক্রবর্তী

প্রবীণ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়



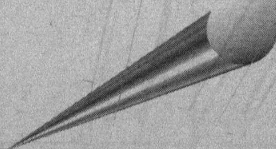
আবদুল করিম খাঁ

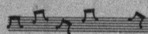


সূ চি প ত্র

নিবেদন
ইতিহাস ও উত্তরাধিকার ঃ পরিবারের উৎসকথা ১৫
শৈশব কৈশোর কাহিনী ২৮
কলকাতার উপাখ্যান ৩৭
মুম্বাইয়ের উপাখ্যান ৫৮
কথা মোহিনী চৌধুরী, সুর আর গান শচীন কর্তা ৬৭
কথা অজয় ভট্টাচার্য, সুর আর গান শচীন কর্তা ৭৪
স্মরণ ঃ শচীন কর্তা ১০২
রাইচাঁদ বড়াল ১০৩
ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ১০৫
নারায়ণ চৌধুরী ১০৭
সুরেশ চক্রবর্তী ১১৬
রাজ্যেশ্বর মিত্র ১২৮
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ১৩১
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯
আশা ভোঁসলে ১৪৯
সলিল ঘোষ ১৫২
অঙ্কুর দেববর্মণ ১৬২
নজরুল গানের শিল্পী শচীনকর্তা ১৬৫
পঞ্চম ঃ পরিচয় ও প্রতিভা ১৭০
বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে শচীনকর্তার সুরারোপিত গান ১৭৪
শিল্পী যখন শচীনকর্তা ঃ হিন্দুস্থান রেকর্ডের তালিকা ১৭৬
শিল্পী যখন শচীনকর্তা ঃ এইচ এম. ভি. রেকর্ডের তালিকা ১৭৯
শিল্পী যখন শচীনকর্তা ঃ এইচ. এম. ভি ক্যাসেটের তালিকা ১৮১
শিল্পী যখন শচীনকর্তা ঃ এইচ. এম. ভি. কমপ্যাক্ট ডিস্কের তালিকা ১৮৪
এক নজরে শচীনকর্তার জীবনপঞ্জি ১৮৫
এই ছিলেন শচীনকর্তা···· ১৮৮
সহায়ক বইপত্র

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ







গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়



ইতিহাস ও উত্তরাধিকার : পরিবারের উৎস কথা

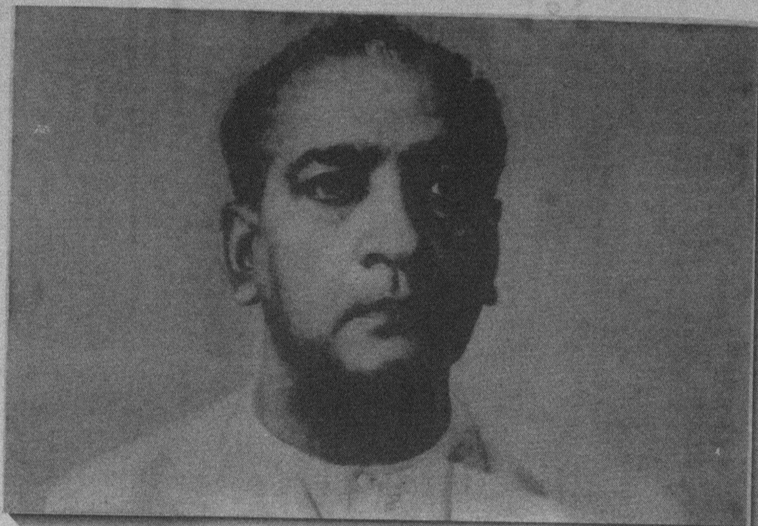
কীর্তিমান যে কোন চরিত্রের জীবনকাহিনী রচনায় পরিবারের পশ্চাৎপট বর্ণনা অপরিহার্য। শচীন কর্তার পরিবার রাজপরিবার। যদিও জানি আমরা, কোন সময়েই তিনি রাজ-সিংহাসনে আসীন ছিলেন না, মানুষের হৃদয়সিংহাসন জয় করে চিরআয়ুষ্মান হয়ে আছেন।

জীবনকথা নির্মাণের সাধারণ প্রথা বর্জন করি কোন প্রকারে? কর্তার বাড়ির অন্দর ও বাহির মহলের কথা কিছু না কিছু বলতেই হবে।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের সন্তান শচীন কর্তা। মহাভারত, পুরাণ ও রাজমালার পাতায় আমরা এই রাজপরিবারের বহু প্রাচীন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি। রাজার বাড়ির কথা বললে যে কোন ভূখণ্ডের অনেক সংঘর্ষ ও নির্মাণের আখ্যান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ত্রিপুরার রাজপরিবার কেমন? আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সুবিখ্যাত 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন—

'ভারতবর্ষে বর্তমানকালে যত রাজ্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম আর কোন বংশে একাধারে পাই না।'

পুরাণে রাজা যযাতির কথা রয়েছে। যযাতির পুত্র দ্রুহ্য। ত্রিপুরার রাজবংশ দ্রুহ্যের বংশধর বলেও একটা ভাবনা প্রচলিত রয়েছে। সে বহুকাল আগের কথা। আমরা তার পরিশুদ্ধতা বিচারে যাচ্ছি না। অনেক পরের 'মাণিক্য' বংশের আলোচনায় চলে আসছি। পাঠকগণ জানতে চাইবেন, 'মাণিক্য' বংশ কেন? উত্তর স্পষ্ট। এই আমলেই ত্রিপুরার



পাহাড়ী সান্যাল



কৃষ্ণচন্দ্র দে



সংস্কৃতিগত সমৃদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর শচীন কর্তা নিজেও 'মাণিক্য' বংশেরই অন্যতম বংশধর।
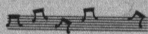
পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শুরুতে মাণিক্য বংশের উদ্ভব ঘটে। সেই বংশের শেষ রাজা ভারত স্বাধীন হবার এক বছর পর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশো বছরের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কিছু উজ্জ্বল উদ্ধার আমাদের আলোচনা করতেই হবে।

প্রথম মাণিক্যরাজ কে? নির্ভুল উত্তর জানা নেই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'মহামাণিক্য' কে ত্রিপুরার প্রথম মাণিক্যরাজ বলে অভিমত জানিয়েছেন। মহামাণিক্যের পুত্র ধর্মমাণিক্য। ধর্মমাণিক্য ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ রাজত্ব করেছেন। তাঁর সময়ের এক তাম্রলিপিতে লেখা ছিল, ধর্মমাণিক্যের পিতা মহামাণিক্য। 'রাজমালা' আবার অন্য কথা বলে। 'রাজমালা'র মতে মহামাণিক্য প্রথম মাণিক্যরাজ নয়। মুকুটমাণিক্য প্রথম রাজা। মহামাণিক্য হলেন মুকুটমাণিক্যের সন্তান। মুদ্রা ভিন্ন সাক্ষ্য দিয়েছে। ফলে এখন সবাই মহামাণিক্যকেই প্রথম মাণিক্যরাজ বলে মানেন। মহামাণিক্য বিষয়ে বেশি কথা জানা যায়নি। একটা কথা বলা হয়। তিনি বাংলার এক সুলতানকে পরাজিত করেছিলেন। এই বিজয় যুদ্ধে ত্রিপুরার রাণীও অসমসাহসিকতার পরিচয় রাখেন। ধর্মমাণিক্যের রাজত্ব বিষয়ে মুদ্রালিপি ও রাজমালার কাহিনীতে কোন ফারাক নেই। ঈশ্বরভক্ত ধর্মমাণিক্য তীর্থদর্শন শেষ করে বারাণসীতে দিনযাপন করছিলেন। এদিকে মহামাণিক্য রাজত্ব ভালভাবে পরিচালনা করতে পারছিলেন না। ধর্মমাণিক্যকে ফিরে এসে হাল ধরতে হয়। বাংলার সুলতানেরা যে সব জায়গা দখল করেছিলেন, সব ফিরিয়ে আনেন ধর্মমাণিক্য। ব্রহ্মরাজের কাছে হেরে পালিয়ে এসেছিলেন আরাকানরাজ। ধর্মমাণিক্য আরাকানরাজকে সিংহাসন পুনর্দখলে সহায়তা করেন। কুমিল্লার বিরাট দিঘী 'ধর্মসাগর' তিনিই খনন করিয়েছিলেন। বানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর তাঁর সময়েই রাজপরিবারের কাহিনী নিয়ে 'রাজমালা' গ্রন্থ রচনা করেন।

ধর্মমাণিক্যের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র রত্নমাণিক্য। তিনি ত্রিপুরার নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছিলেন। সম্ভবত রত্নমাণিক্য ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

রাজমালার প্রাসঙ্গিক কাহিনী এই সুযোগে পাঠকের কাছে হাজির করা যাক। ধর্মমাণিক্যের আঠারো সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট রত্নমাণিক্য। সতেরো সন্তানকে ধর্মমাণিক্য রাজ্যের অংশ ভাগ করে দিয়েছিলেন। রত্নমাণিক্য রাজ্যে ছিলেন না। গৌড়ের রাজদরবারে ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। গৌড়ের রাজার সহায়তা নিয়ে সতেরো ভাইকে পরাজিত করলেন রত্ন মাণিক্য। ত্রিপুরার রাজা হলেন। কেউ কেউ বলেন, ধর্মমাণিক্যের নাম ছিল ডাঙ্গর ফা। ছোট ছেলের নাম রত্ন ফা। গৌড়ের সুলতান প্রথম রত্ন ফা-কে 'মাণিক্য' উপাধি দেন। ফলে রত্নমাণিক্যের সময় থেকেই ত্রিপুরায় মাণিক্য রাজবংশের পত্তন হয়েছে। আগেই বলেছি আমরা, মুদ্রালিপি কিন্তু এই কথা স্বীকার করে না। রত্নমাণিক্যের আগেই ধর্মমাণিক্য ও

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ



তারও আগে মহামাণিক্য রাজত্ব করেছেন—এই কথাই বলে।

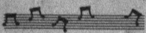
রত্নমাণিক্যের অবদান কি? গৌড়ের সুলতান বন্ধু ছিলেন তাঁর। কথা বলে দশ হাজার বাঙালিকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রসারে সচেষ্ট হন। বাঙালি সংস্কৃতির সাথে ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতির সুষম আত্তীকরণে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। চতুর্দশ দেবতা ত্রিপুরার প্রাচীন আরাধ্য দেবতা। মুদ্রায় রত্নমাণিক্য চতুর্দশ দেবতার পাশাপাশি নারায়ণ ও দুর্গার উল্লেখ করেছিলেন।

রত্নমাণিক্যের রাজত্ব শেষে পরপর দেশ শাসন করেছেন প্রথম প্রতাপমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, মুকুটমাণিক্য, দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্য। প্রথম জন অত্যাচারী ছিলেন। সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে তাঁকে হত্যা করে। বিজয়মাণিক্য উল্লেখযোগ্য রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। মুকুটমাণিক্য প্রথম প্রতাপমাণিক্যের ছোট ভাই ছিলেন। মুদ্রার লিপি অনুসারে তাঁর রাজত্বকাল মাত্র দু'বছরের। রাজমালার পাতায় তাঁর রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুকুটমাণিক্যের পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্যও বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। সেনানায়কেরা গোপনে তাঁকে হত্যা করে। সত্যি বলতে কি, ধন্যমাণিক্যের আগে পর্যন্ত রত্নমাণিক্যই প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। বাকিদের কথা ইতিহাসের খাতিরে উল্লিখিত হয় শুধু।

১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ধন্যমাণিক্য। তাঁর আমলের মুদ্রাতেই প্রথম ত্রিপুরার উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর রাজত্বে তিনি কোন বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেননি। বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সাথেও একাধিকবার লড়াই করেছেন। বাংলার নানা এলাকা দখল করে নিজের রাজত্বসীমা বাড়িয়েছেন। রাজমালায় এসব যুদ্ধের কাহিনী বড় করেই লেখা রয়েছে। শিল্প ও সাহিত্যের বিষয়ে ধন্যমাণিক্যের গভীর অনুরাগ ছিল। একাধিক বই বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, মহাদেববাড়ি তৈরি করেন। চৌদ্দ দেবতার বাড়িও তাঁর আমলেই তৈরি হয়। পঁচিশ বছরের মত তিনি রাজা ছিলেন। বসন্ত রোগে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরের রাজা ছিলেন ধ্বজমাণিক্য। ধন্যমাণিক্যের বড় ছেলে তিনি। তাঁর শাসনকালের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না। পরের রাজা দেবমাণিক্য। ধ্বজমাণিক্যের তিনি ছোট ভাই ছিলেন। ১৫২০ সাল নাগাদ তিনি রাজা হন। তান্ত্রিক ভাবনায় বিশ্বাসী রাজা ১৫৩০ সাল নাগাদ এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর হাতেই খুন হন। পরের রাজা বিজয়মাণিক্য। তিনি ছিলেন ধ্বজমাণিক্যের পুত্র। তাঁর রাজত্বকাল প্রায় তিরিশ বছর। তিন শ্রীহট্ট দখল করেছিলেন। সোনারগাঁও দখল করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। রেভারেন্ড জেমস লঙের রচনা ও আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে বিজয়মাণিক্যের কথা রয়েছে। তাঁর বড় ছেলে শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন না। ছোট ছেলে অনন্তমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা হন। শ্বশুর গোপী প্রসাদের চক্রান্তে দেড় বছর পর খুন হয়ে যান। এই প্রথম মূল রাজপরিবারের বাইরের

শচীন কর্তার গানের স্কুল 'সুরমন্দির'-এ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে গৃহীত চিত্র (১৯৩৬) চেয়ারে উপবিষ্ট কে. এল. সায়গল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শচীন কর্তা। ডানদিক থেকে চতুর্থ গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য (দাঁড়িয়ে)



একজন মানুষ সিংহাসনে বসেন। গোপীপ্রসাদের নাম হল 'উদয়মাণিক্য'। তিনি বছর পাঁচ ছয় রাজা ছিলেন। তাঁর আমলে চট্টগ্রাম আবার ত্রিপুরারাজের অধিকারের বাইরে চলে যায়। পরের রাজা হলেন জয়মাণিক্য। উদয়মাণিক্যের পুত্র। রাজপরিবারের বাইরের এই রাজত্ব বেশিদিন চলেনি। দেবমাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য জয়মাণিক্যকে হত্যা করে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করেন। ১৫৭৭ সালে অমরমাণিক্য রাজত্ব শুরু করেছিলেন। দশ বছর রাজত্ব করেন তিনি। বহু লড়াই করেছেন। বাকলাচন্দ্র দ্বীপ জয় করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে আসেন। চট্টগ্রামও জয় করেছিলেন এক সময়। আরাকান দখল করতে গিয়ে সফল হননি। নিজের পুত্র জুঝা সিংহ ঐ যুদ্ধে নিহত হন। নিজের রাজ্যেও নানা বিদ্রোহ দানা বাঁধে। কথিত আছে, তিনি বিষ পানে আত্মহত্যা করেন। অমরমাণিক্যের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র রাজধরমাণিক্য। বিষ্ণুভক্ত এই রাজার রাজ্যশাসনে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। মুদ্রালিপি থেকে মনে হয়, তিনি বারো বছর রাজত্ব করেছিলেন।

পরের রাজা ঈশ্বরমাণিক্য। 'রাজমালা'য় যে বংশতালিকা রয়েছে সেখানে ঈশ্বরমাণিক্যের নাম নেই। ফলে ঈশ্বরমাণিক্য বিষয়ে কোন কথাই প্রায় জানা যায় না।

রাজধরমাণিক্যের পুত্র যশোধরমাণিক্য ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা হন। পিতার মত তিনিও ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। তাঁর আমলে মুঘলরাজ ছিলেন জাহাঙ্গীর। মুঘলদের হাতে ত্রিপুরা আক্রান্ত হয়। 'রাজমালা'য় সেই আক্রমণ কাহিনী বিস্তৃত আকারে লিখিত রয়েছে। জাহাঙ্গীর বন্দীরাজা যশোধরমাণিক্যকে করদানের বিনিময়ে রাজ্য ফেরত দিতে চেয়েছিলেন। রাজি হননি তিনি। ঈশ্বর বন্দনা করে বাকি জীবন কাটিয়েছেন। এদিকে কিছুকাল পর উদয়পুরে মহামারী শুরু হওয়ায় মুঘল সরকার ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যায়।

ফাঁকা পড়ে আছে ত্রিপুরার সিংহাসন। রাজা হবেন কে? যশোধরমাণিক্যের কোন পুত্র নেই। মহামাণিক্যের কনিষ্ঠপুত্র ছিলেন গগন ফা। তাঁর বংশধর কছু ফা। কছু ফার ছেলে কল্যাণমাণিক্য নাম নিয়ে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিন্নবিচ্ছিন্ন ত্রিপুরাকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। রাজকুমারদের 'ঠাকুর' উপাধি দেয়ার নিয়ম তিনিই চালু করেন। বড় ছেলে গোবিন্দদেবকে যুবরাজ পদে নিয়োগ করেন। তাঁর আমলে মুঘলরাজ ত্রিপুরার দখল নিতে পারেনি। গরীব অনেক মানুষ তাঁর আমলে জমি ও অর্থ পেয়েছিলেন। 'কল্যাণসাগর' তিনিই খনন করান। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজা হলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমাণিক্য। গোবিন্দমাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন নক্ষত্র রায়। কল্যাণমাণিক্য রাজা হবার আগে গোবিন্দমাণিক্যের জন্ম। রাজা হবার পর নতুন রাণীর সন্তান ছিলেন নক্ষত্র রায়। ফলে রাজা হবার অধিকার কার বেশি এই নিয়ে বিতর্ক চলছিল। শুরু থেকেই নক্ষত্র রায় গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। মুঘলরাজের সাথে মিত্রতা করেছিলেন। একসময় গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনচ্যুত হন ও নক্ষত্র রায় সিংহাসনে বসেন। নতুন নাম হয় ছত্রমাণিক্য। এই দ্বন্দ্ব বিষয়ে দু'রকমের অভিমত রয়েছে। 'রাজমালা'তেই দু'রকমের কথা।

শচীন দেববর্মণ



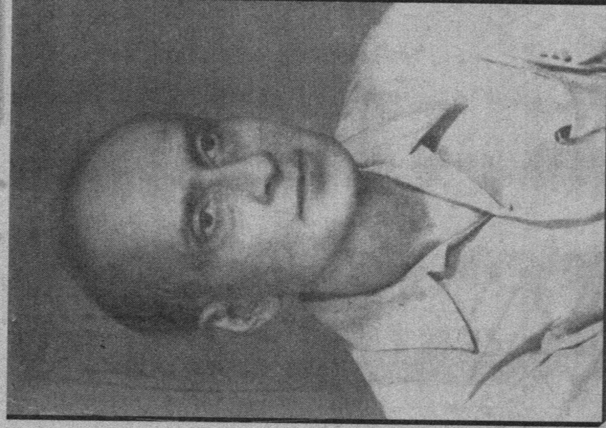
একটা অভিমত অনুযায়ী গোবিন্দমাণিক্য রক্তক্ষয়ে রাজি ছিলেন না বলে বিনা বাধায় সিংহাসন ছোট ভাইকে ছেড়ে দেন। অন্য অভিমত অনুসারে দু'ভায়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন গোবিন্দমাণিক্য। বিশেষ করে ছত্রমাণিক্যের বংশধরদের কাছে রক্ষিত 'রাজমালা'য় যুদ্ধের কথাই বর্ণিত রয়েছে। 'রাজমালা' রাজপরিবারের কাহিনী। নানা রাজার আমলে লিখিত হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষতা বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। সিংহাসন হারিয়ে গোবিন্দমাণিক্য কিছুদিন রিয়াংদের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই সময় বাংলার শাসক সুজা ভাই ঔরঙ্গজেবের ভয়ে পালিয়ে চলে এসেছিলেন। খবর পেয়ে ঔরঙ্গজেব গোবিন্দমাণিক্যের কাছে ফার্সী ভাষায় লেখা একটি পত্র পাঠান। সুজাকে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানানো হয়। চিঠিটি ত্রিপুরা সরকারি মহাফেজখানায় গেলে আজও দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়বার গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ বিষয়েও নানা মত। কারও কারও অভিমত, ছত্রমাণিক্য মারা গেলে সাধারণের অনুরোধে গোবিন্দমাণিক্য সিংহাসনে বসেন। কারও মতে যুদ্ধে ছত্রমাণিক্যকে পরাজিত করেই গোবিন্দমাণিক্য দ্বিতীয়বার রাজা হন। দ্বিতীয়বারের রাজত্বকালে রিয়াং জনসাধারণের অসন্তোষ বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রশমিত করেন তিনি। প্রজাদের কল্যাণে অনেক ভালো কাজ করেন। বাঁধ তৈরি করে গোমতীর বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা করেন। উদয়পুরে গোমতী তীরে ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নানা বিষয় নিয়ে যতোই চাপান উতোর থাক, একথা সত্যি যে গোবিন্দমাণিক্য রক্ত ও হিংসা পছন্দ করতেন না। দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত বলিদান প্রথা তিনিই আইন করে বন্ধ করেছিলেন। ফলে 'চন্তাই' বা রাজপুরোহিতেরা তাঁকে ক্ষমা করেনি। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'রাজর্ষি' ত্রিপুরার এই রাজ-আখ্যানকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। 'চন্তাই' চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন রঘুপতি। মানবিক ও দানবিক মূল্যবোধের সমাহারে 'বিসর্জন' কালজয়ী চরিত্র অর্জন করেছে। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দমাণিক্যের জীবনাবসান ঘটে। পরের রাজা রামদেবমাণিক্য। গোবিন্দমাণিক্যের পুত্র। তাঁর শাসনকালে একবার তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারিকানাথ ঠাকুরের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুত হন। পরে পুনর্দখল করেন। রামদেবমাণিক্য তেরো পুত্রের পিতা ছিলেন। জীবিত ছিলেন চারজন। রত্নদেব, দুর্জয় সিংহ, ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি। রত্নদেব নাবালক ছিলেন। তাই শ্যালক বলিভীম নারায়ণের অভিভাবকত্বে রত্নদেব 'দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য' (১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে) নামে রাজকার্য চালান। রত্নদেব তখন পাঁচ বছরের বালক। বাংলার সুবাদার বাহাদুর খাঁ-র হাতে বলিভীমের ক্ষমতা অপহৃত হয়। দ্বারিকানাথ ঠাকুর এই সুযোগ নিয়ে আবার রাজা হন। নাম গ্রহণ করেন নরেন্দ্রমাণিক্য। দু'বছর পর আবার সিংহাসনচ্যুত হন। দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য সিংহাসনে বসেন। ধীরে ধীরে রাজকার্যে দক্ষতা অর্জন করেন।

দুর্জয় সিংহকে যুবরাজ ও ঘনশ্যামকে বড়ঠাকুর পদ দান করেন। চন্দ্রমণিকে বাংলার সুবেদার দরবারে রাজপ্রতিনিধি করে পাঠান। ঘনশ্যাম কিছুতেই 'বড়ঠাকুর' পদে খুশি ছিলেন

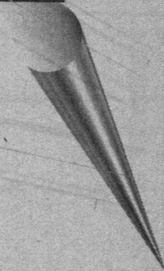


অমিয়নাথ সান্যাল



ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



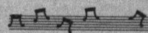


না। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। মহেন্দ্রমাণিক্য নাম গ্রহণ করেন। চন্দ্রমণিকে বাংলা থেকে ফিরিয়ে এনে 'বড়ঠাকুর' করেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রমাণিক্যের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। যুবরাজ দুর্জয় সিংহ এবার দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য নামে রাজা হলেন। মুঘলসেনারা একবার তাঁকে যুদ্ধে হারালেন। পরে তিনি আবার জয়ী হন। এই সময়ে ছত্রমাণিক্যের বংশধর জগৎরাম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। মুঘলদের নানা গোপন কাহিনী শুনিয়ে ত্রিপুরায় নিয়ে এলেন। জগৎমাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। মুঘলেরা তাঁর নিরাপত্তার ভার নিলেন। যুদ্ধ বিবাদে ত্রিপুরার রাজপরিবার বারবার জড়িয়েছে। এরকম হয়নি কখনো। স্বাধীনসত্তা লোপ পেয়ে ত্রিপুরার প্রকৃত শাসন মুঘলদের হাতে আগে কখনও যায়নি। পাহাড়ঘেরা ত্রিপুরার চাকলা রোশনাবাদ মুঘলদের হাতে ছিল এতকাল। জগৎমাণিক্য মুঘলদের কাছ থেকে চাকলা রোশনাবাদ এলাকার জমিদারি নিয়েছিলেন। এদিকে ধর্মমাণিক্য মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের সহায়তায় 'চাকলা রোশনাবাদ'-এর জমিদারি নিয়ে নিলেন। সিংহাসনেও বসেছিলেন আবার। বেশিদিন বাঁচেননি।

এবার চন্দ্রমণির পালা। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দমাণিক্য নামে রাজা হন। দশ বছর রাজা ছিলেন। বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। সিংহাসন এবার যাঁর অধীনে এল তিনি জয়মাণিক্য। পূর্বনাম রুদ্রমণি ঠাকুর। গোবিন্দমাণিক্যের ভাই জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র ছিলেন রুদ্রমণি। মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র 'ইন্দ্রমাণিক্য' নাম নিয়ে সিংহাসন দখল করেছিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য মারা গেলে জয়মাণিক্য দ্বিতীয়বার রাজা হয়েছিলেন। জয়মাণিক্যের পর রাজা হলেন হরিমণি ঠাকুর। নাম নিয়েছিলেন বিজয়মাণিক্য। ইন্দ্রমাণিক্যের ছোট ভাই যুবরাজ কৃষ্ণমণিও বছর পাঁচ রাজত্ব করতে পেরেছিলেন।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস আলোচনায় একজন মানুষকে স্মরণ না করে পারা যায় না। জন্মসূত্রে তাঁর অবস্থান ছিল রাজবাড়ি থেকে বহুযোজন দূরে। অথচ ইতিহাসের অপরিহার্য চরিত্র। নাম তাঁর সমশের গাজী। এক দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন সমশের। বাবা পীর মহম্মদ একজন ফকির ছিলেন। ছোটবেলা থেকে সমশের এক জমিদার বাড়িতে বড় হচ্ছিলেন। পরিণত বয়সে জমিদার কন্যার পাণিগ্রহণ করতে চাইলে জমিদার তাঁর প্রাণনাশ করতে চান। পালিয়ে বাঁচেন সমশের। সামাজিক সংঘাত ভেতর থেকে নাড়া দেয় তাঁকে। নিরন্ন কৃষকদের সংগঠিত করেন। জমিদার ও তাঁর সন্তানেরা কৃষক বিদ্রোহের ফলে প্রাণ হারান। জমিদার কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হন সমশের। রাজা ইন্দ্রমাণিক্য সমশেরকে দমন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। একটা সময়ে সমশের চাকলা রোশনাবাদের শাসক হন। একাধিক রাজাকে পরাজিত করে একসময় ত্রিপুরার সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। রাজার উপাধি তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। শাসক হিসেবে তিনি প্রজাদের কাছে প্রিয় ছিলেন। গরীব মানুষের বন্ধু ছিলেন। জমিদারের ঘর থেকে অর্থ হরণ করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। জমিদারেরা একে একে ক্ষেপে ওঠেন। নবাবের কাছে নালিশ জানান। নবাব

দিলীপ কুমার রায়

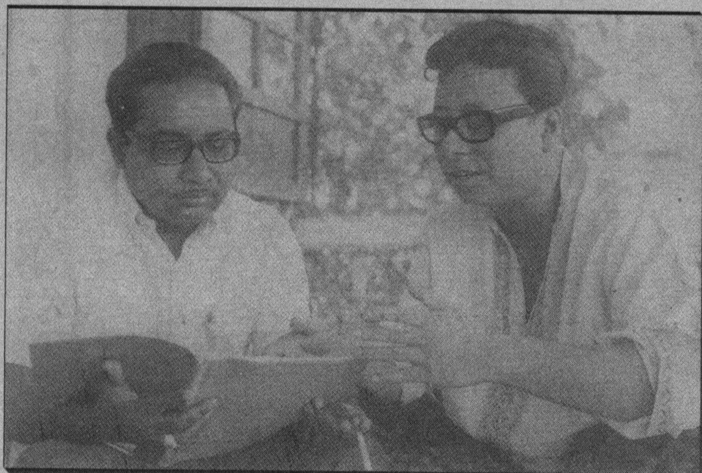


কৃষ্ণমাণিক্যকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। কামানের মুখে রেখে গোলা চালিয়ে সমশেরকে হত্যা করা হয়। নথিপত্রের বিচারে এই ঘটনা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ঘটেছিল।

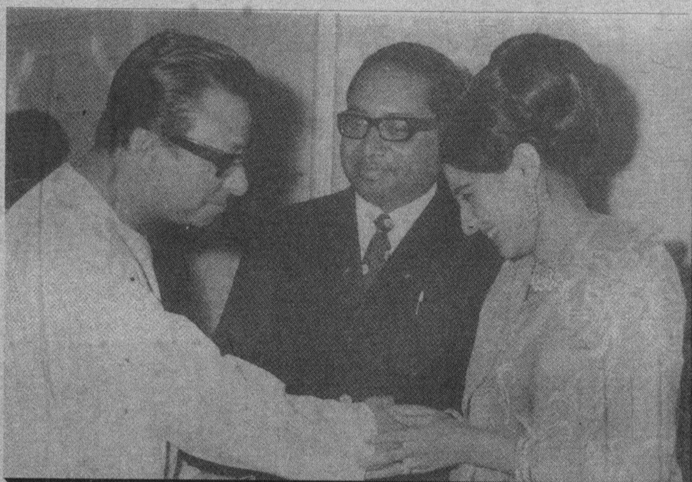
১৭৬০। বছর তিন আগে পলাশীর আম্রকুঞ্জে পরাজিত হয়েছেন বাংলার শেষ নবাব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবার বিনা বাধায় শোষণের সুযোগ পেয়ে যায়। ইংরেজ তার সেনাদলকে ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠায়। শেষ রক্ষা হয়নি। ১৭৬১ সালেই ত্রিপুরার প্রশাসনিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলে যায়। রাজার সাথে পয়সা দেবার চুক্তি হয়। চাকলা রোশনাবাদ জমিদারি থেকে ইংরেজ বণিকদের টাকা দিতে হবে। জঙ্গলঘেরা পাহাড়ী ত্রিপুরার দিকে ইংরেজের বিন্দুমাত্রও নজর নেই। পাহাড়ী ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমাণিক্য। ইংরেজের অধীন সমতল ত্রিপুরার শেষ কথা বলার মানুষ রাজা নন। রাজা সেখানে শুধুই একজন জমিদার। চাকলা রোশনাবাদের রেসিডেন্ট হয়ে এলেন একজন ইংরেজ। ওখানে তাঁর কথাই শেষকথা বলে গণ্য হত। কৃষ্ণমাণিক্য ইংরেজ রেসিডেন্টের খবরদারিতে খুশি ছিলেন না। নানা ঘাটে জল গড়ায়। তেইশ বছর রাজত্বে থেকে ১৭৮৩ সালে কৃষ্ণমাণিক্য চিরবিদায় নিলেন। সমতল ত্রিপুরার বন্দোবস্ত নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি বাড়তেই থাকল। ১৭৯২ সালে ইংরেজ রেসিডেন্ট 'চাকলা রোশনাবাদ' এলাকা রাজপরিবারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

কৃষ্ণমাণিক্য নেই। রাজা হবেন কে? বলে দেবে ইংরেজ। এরকম আগে কখনও হয়নি। ত্রিপুরার রাজ অভিষেকে মুঘল বা ইংরেজদের কোন ভূমিকাই ছিল না। ইংরেজকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর কাছে রাণী জাহ্নবীদেবী কৃষ্ণমাণিক্যের ভাইপো রাজধরের নাম পাঠালেন। দু'বছর কেটে গেল। রাণী শাসন চালিয়েছেন। রাজধরের নাম অনুমোদন পেল। ১৭৮৫ সালে তিনি দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য নামে ত্রিপুরার রাজা হলেন। মণিপুররাজের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন রাজধরমাণিক্য। ১৮০৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ইংরেজ কর্তাদের চোখে রাজধর মদ্যপ, অবিশ্বাসী ও নিরক্ষর ছিলেন। এমন অভিমতকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সংলাপ বলে মেনে নেয়ার কোন কারণ নেই।

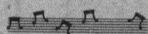
দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের দরবারে যুবরাজ ছিলেন দুর্গামণি। অথচ রাজা হলেন রাজধরপুত্র রামগঙ্গা। রামগঙ্গামাণিক্যকে রাজা হিসেবে মেনে নিতে সবাই রাজি নন। ইংরেজ কর্তারাও দু'ভাগ হয়ে যান। আদালতে গেলেন দুর্গামণি ঠাকুর। আদালত দুর্গামণির পক্ষে রায় দিলেন। কারণ পরিষ্কার। যিনি যুবরাজ, তিনিই রাজা হবার অধিকারী। আদালতের রায় মেনে ইংরেজ চাকলা রোশনাবাদের অধিকার দুর্গামণিকে হস্তান্তর করেন। ১৮০৯ সালে দুর্গামাণিক্য রাজসিংহাসনে বসেন। ১৮১৩ সালে পাটনা শহরের কাছাকাছি এক দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনহানি ঘটে। রামগঙ্গামাণিক্য আবার রাজা হলেন। আবার মামলা হল। ১৮২১ সালে অভিষেক হল তাঁর। নিজের ভাই কাশীচন্দ্রকে যুবরাজ পদে ও পুত্র কৃষ্ণকিশোরকে বড়ঠাকুর পদে নির্বাচিত করেন। ১৮২৬ সালে রামগঙ্গামাণিক্যের মৃত্যু হয়। যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজা হলেন।



রাহুল দেববর্মণ বন্ধু শচীন ভৌমিকের সঙ্গে



আনন্দানুষ্ঠানে রাহুল দেববর্মণ

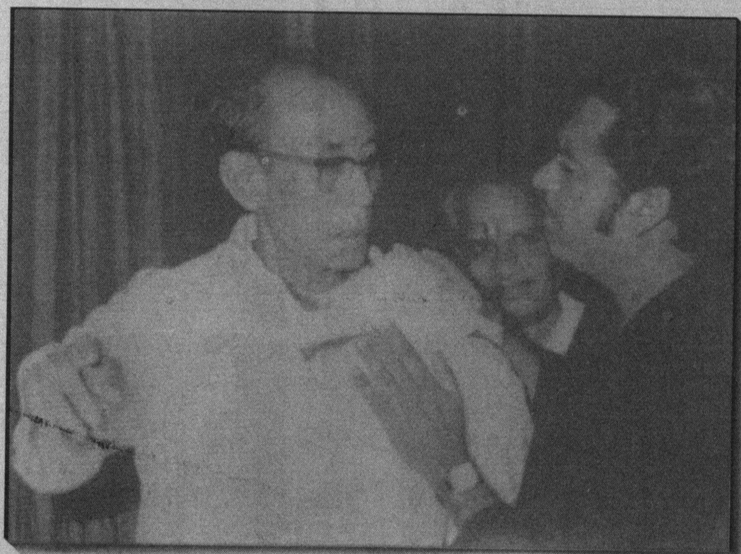


তাঁর আমলে চতুর ইংরেজ সীমান্ত নির্ধারণ করার কথা বলে 'বানরের পিঠে ভাগ' করে। ত্রিপুরার অনেকটাই সমতল এলাকা দখল করে নেয়। চাষের জমি দখল করে নেয়। কাশীচন্দ্রমাণিক্য মণিপুর রাজকন্যা কুটিলাক্ষীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরকে বড়ঠাকুর ও রামগঙ্গামাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যকে যুবরাজ পদে মনোনীত করেন। পিতা বেঁচে থাকতেই কৃষ্ণচন্দ্র মারা যান। ১৮২৯ সালে কাশীচন্দ্রমাণিক্যের প্রয়াণ ঘটে। রাজা হলেন কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য। আড়াই বছরের পুত্র ঈশানচন্দ্র যুবরাজের মর্যাদা পেলেন। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের রাজত্বকালে রাজধানী পুরাতন আগরতলা থেকে এখন যেখানে আগরতলা শহর, সেখানে স্থানান্তরিত হয়। তিনি আসাম ও মণিপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। বিলাসপ্রিয় ও অমিতাচারী রাজা আমোদ প্রমোদ নিয়েই বেশি সময় কাটাতেন। ১৮৪৯ সালে বজ্রাঘাতে তাঁর জীবন নাশ হয়। এরপর রাজা হলেন ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। ১৮৫০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর রাজত্বকালের শুরু। যুবরাজ পদে ছোটভাই উপেন্দ্রচন্দ্রকে মনোনীত করেছিলেন। বড়ঠাকুর পদে নিজের বড় ছেলে ব্রজেন্দ্রচন্দ্রকে মনোনীত করেন। সিংহাসন আরোহন তাঁর পক্ষে সুখের ছিল না। পিতার প্রায় এগার লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। রাজস্ব সংগ্রহের নানা উপায় উদ্ভাবন করেন ঈশানচন্দ্র। সাধারণ প্রজারা ক্ষেপে যান। 'চাকলা রোশনাবাদ' বেচে দেবার কথাও ঈশানচন্দ্র ভাবেন একসময়। পরিত্রাতা হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাজপুরোহিত বিপিনচন্দ্র গোস্বামী। ঈশানচন্দ্রের সময়েই ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। রাজা বিদ্রোহীদের সমর্থনে কখনও কোন অবস্থান ঘোষণা করেননি। তবু ইংরেজের রোষে পড়তে হয়েছিল। বিচারক ম্যাটকাফ রাজা আর ইংরেজের ভুল বোঝাবুঝি অনেকটাই দূর করেছিলেন। ১৮৬২ সালে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

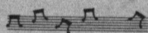
যুবরাজ রাজা হবেন, এটাই সাধারণ প্রথা। উপেন্দ্রচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই প্রয়াত হন। তখন ঈশানচন্দ্র নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্রকে যুবরাজ ও দ্বিতীয় পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রকে বড়ঠাকুর করতে চাইলেন। সেই ভাবনা ফলপ্রসূ হয়নি। বীরচন্দ্র রাজা হলেন। নাম বীরচন্দ্রমাণিক্য। বৈমাত্রেয় ভাই নীলকৃষ্ণ ঠাকুর মানতে পারছেন না। বীরচন্দ্রের যুক্তি, পূর্বতন মহারাজ তাঁকে যুবরাজ ঘোষণা করেছিলেন। নীলকৃষ্ণ এই ঘোষণাকে অসত্য বলেন। বয়েসে বড় নীলকৃষ্ণ। তিনি কেন রাজা হবেন না? ইংরেজের দরবারে বিচার গেল। আদালতে মামলা হল। ফলাফল নীলকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যায়। ১৮৭০ সালে বীরচন্দ্র রাজা হন। ১৮৭৭ সালে ইংরেজ সরকার বীরচন্দ্রমাণিক্যকে 'মহারাজা' উপাধি দান করে। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পরবর্তী প্রজন্ম ব্রজেন্দ্রচন্দ্র বা নবদ্বীপচন্দ্র কেউই সিংহাসনে আসীন হতে পারেননি। হয়তো বা ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের সম্ভাবনা ছিল। বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালেই ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের চতুর্থ পত্নী জাতিশ্বরী দেবীর সন্তান ছিলেন নবদ্বীপচন্দ্র। খুব অল্প বয়েসে বাবাকে হারিয়েছিলেন। রাজা হওয়ার যাবতীয়



শচীন কর্তা ও লতা মঙ্গেশকর



শচীন কর্তা ও কিশোরকুমার



অধিকার নবদ্বীপচন্দ্রেরও ছিল। তবু তিনি রাজা হননি। কেউ কেউ বলেন, বৈরাগ্যবোধ একবার তাঁকে ঘরছাড়া করে। ফলে ফিরে এলেন যখন, সিংহাসনের সপক্ষে জোর অভিমত স্থাপন করতে পারেননি। অনেকে এই মত মানেন না। রাজপরিবারের কলহের পরিণতি হিসেবেই নবদ্বীপচন্দ্রের বঞ্চনাকে দেখে থাকেন।

১৮৫০ সালে ত্রিপুরার রাজবাড়িতে নবদ্বীপচন্দ্রের জন্ম। ১৯৩১ সালে পরিণত বয়েসে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁকে জীবনের দীর্ঘসময় কুমিল্লা শহরে অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর উদ্যোগে কুমিল্লায় 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তার সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার সভাপতি হয়েছিলেন নবদ্বীপচন্দ্র। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। বিখ্যাত 'রবি' পত্রিকায় 'বাংলা সাহিত্যের চারি যুগ' তাঁরই রচনা। 'ত্রিবেণী' পত্রিকায় 'আবর্জনার ঝুরি' শিরোনামে স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ লিখেছিলেন। শচীনকর্তার পিতা নবদ্বীপচন্দ্রের কথা আমাদের আলোচনায় আমরা মাঝেমাঝেই টেনে আনব। রাজবাড়ির কথায় আবার চলে আসি।

বীরচন্দ্রমাণিক্যকে রাজা হিসেবে মানতে নীলকৃষ্ণ ঠাকুর রাজি ছিলেন না। যুক্তি তাঁর এরকম। ঈশানচন্দ্রের রাজত্বকালে বীরচন্দ্র যদি 'যুবরাজ' মনোনয়ন না চেয়ে থাকেন, তবে কোন অধিকারবলে তিনি রাজা হবেন? নিরপেক্ষ বিচারে অগ্রজ নীলকৃষ্ণই রাজা হবার প্রথম দাবিদার। রাজার বাড়ির অন্দরমহলে কি আর 'কাজির বিচার' চলে না! অগ্রজ অনুজ অনেকেরই খেয়াল থাকেনা তখন। আদালতে গিয়েছিলেন নীলকৃষ্ণ। আদালত বীরচন্দ্রের মনোনয়ন বহাল রেখেছে। ইংরেজ সরকারও বীরচন্দ্রের পক্ষেই সওয়াল করেছে।

রাজা হিসেবে বীরচন্দ্রমাণিক্য কেমন ছিলেন? আধুনিকতার প্রতিষ্ঠাতা। আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার সকল দিকেই তাঁর সুনজর ছিল। তাঁর আমলে ত্রিপুরায় লিখিত আইন তৈরি হয়। বিচারালয় স্থাপিত হয়। জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে স্ট্যাম্প ও দলিল প্রথা প্রচলন করেন। ১৮৭১ সালে আগরতলা পৌরসভা তৈরি করেন। ১৮৭৫ সালে ডাকঘর চালু হয়। চিকিৎসালয় ও শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। বাংলাভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে কাজে লাগান বীরচন্দ্রমাণিক্য। তিনি ত্রিপুরায় দাস ও সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেছিলেন। এ বিষয়ে আইন আগে থেকেই ছিল। কার্যকরী করেছিলেন বীরচন্দ্রমাণিক্য। তিনি ছিলেন সুগায়ক ও সুকবি। একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। যদুভট্ট, নিসার হোসেন, কাশেম আলী প্রমুখ দিকপাল গাইয়েরা রাজার দরবারে পরম সমাদরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নিজে তিনি খেয়াল ও টপ্পা রচনা করেছেন। ছবি আঁকতেন চমৎকার। ছবির বার্ষিক প্রদর্শনী করতেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকে দিয়ে বিবিধ টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থ অনুবাদ করান। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছয়। 'হোরি' ও 'ঝুলন' খুবই বিখ্যাত। বিজ্ঞান বিষয়ে নানা বই নিয়মিত পড়তেন তিনি। বাংলা, উর্দু, মণিপুরী ও ত্রিপুরী ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারতেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও দখল ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

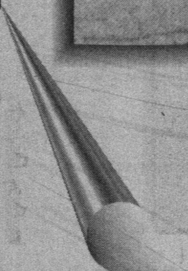


শচীন কর্তা ও মহম্মদ রফি



শচীন কর্তা ও আশা ভোঁসলে



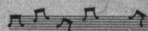


যখন অর্থাভাবে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশ করতে পারছিলেন না, বীরচন্দ্রমাণিক্য এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা 'ভগ্নহৃদয়' পাঠ করে অভিভূত বীরচন্দ্র প্রতিনিধি পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পরিণত বয়েসে 'বিশ্বকবি' হবেন, ভবিষৎবাণী করেন। বীরচন্দ্রের সময় থেকে রাজপরিবার ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ১৮৩৯ সালে তাঁর জন্ম। ১৮৯৬ সালে মাত্র সাতান্ন বছর বয়েসে তিনি চিরবিদায় নেন। রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্যগগণে স্বমহিমায় ভাস্বর। পৃথিবী জয় করার পথে পা বাড়িয়েছেন। বীরচন্দ্রমাণিক্যের পর রাজা হলেন রাধাকিশোরমাণিক্য। ১৮৯৭ সালে আগরতলায় রাজার রাজ্যাভিষেক হয়। ১৮৯৯ সালে নিজপুত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরকে যুবরাজ ঘোষণা করেন। রাজা হিসেবে রাধাকিশোরমাণিক্য যোগ্য ছিলেন। কৃষি, আইন ও রাজস্ব বিষয়ে তাঁর ভাবনা স্বচ্ছ ছিল। প্রশাসনিক কাজেও দ্রুততা ছিল। ১৯০১ সালে অনাবৃষ্টির কারণে ফসল হলনা একদম। রাজা গরীব মানুষদের খাবার জুগিয়েছিলেন। আগরতলায় একটি কলেজ শুরু করেছিলেন তিনিই। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দেয়নি বলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালের ভিত্তিও তাঁর হাতেই গড়া। তাঁর সভায় দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন উমাকান্ত দাস। অবদান স্মরণীয় করে রাখতে 'আগরতলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম হল 'উমাকান্ত একাডেমী।' ১৯০৪ সাল থেকে এই নাম চালু হয়েছে। আগরতলার রাজবাড়ি যা 'উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ' নামে পরিচিত ও যেখানে বর্তমানে বিধানসভার কাজ চলে, সেই বাড়িটিও রাধাকিশোরমাণিক্যেরই অবদান। আগের বাড়িটি ভূমিকম্পে ভেঙ্গে পড়েছিল। আরও অনেক কাজ করেছেন রাধাকিশোরমাণিক্য। 'ত্রিপুরা স্টেট গেজেট' প্রকাশ করেছেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, চিত্রকর শশীকুমার হেস নিয়মিত রাজার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতেন। কলকাতার 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল' তৈরিতে তাঁর অবদান অসামান্য। রাধাকিশোরমাণিক্যের সময়েই রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ সালে ত্রিপুরায় প্রথম এলেন। পরের বছর আবার এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৫ সালেও এসেছিলেন। কবির শান্তিনিকেতন ও বিদ্যালয় গঠনে রাধাকিশোরমাণিক্য শুভার্থী ও অর্থসহায়কের ভূমিকা পালন করেন। কবি তাঁর 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ রাজার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে কবির পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন রাধাকিশোর, ইংরেজের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে দেখাটা জরুরি মনে করেননি।

১৯০৯ সালে এমন দক্ষ ও বিদ্যোৎসাহী মানুষটিকে সারনাথ ভ্রমণের সময় মোটর দুর্ঘটনায় জীবন দিতে হয়।

রাধাকিশোরমাণিক্য যখন রাজা, যুবরাজ ছিলেন তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর। তিনি এবার রাজা হলেন। বাবার অধিকাংশ সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন বীরেন্দ্রকিশোর। কৃষি, রেশমচাষ ও চা বাগান প্রতিষ্ঠায় তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল। অসামান্য ছবি আঁকতেন রাধাকিশোরমাণিক্য। কুঞ্জবন প্রাসাদ, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের স্নিগ্ধ ভাস্কর্য তাঁর নান্দনিক

বিদেশ যাবার আগে শচীন কর্তা। বাঁদিকে মুকেশ, ডানে মহম্মদ রফি



ভাবনার পরিচায়ক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার আর ত্রিপুরা রাজপরিবার কাছাকাছি আসছি ল পরস্পর। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পেতেই আগরতলায় রাজবাড়ির উদ্যোগে অভিনন্দন সভা আয়োজিত হয়। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের আমন্ত্রণে চতুর্থবার আগরতলা এসেছিলেন। বীরেন্দ্রকিশোরকেও আমরা অল্প বয়েসেই হারিয়েছি। ১৯২৩ সালে চল্লিশ বছরে মারা যান তিনি। রাজা হয়ে এলেন যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য। কিন্তু তিনি তখন নাবালক। ফলে শাসনকাজের জন্যে শাসন পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে পুরোপুরি রাজা হয়েছিলেন বীরবিক্রম।

বহু দেশ বেড়িয়েছেন তিনি। ইতালিতে মুসোলিনি, জার্মানিতে হিটলার ও আমেরিকায় রুজভেল্টের সাথে দেখা হয়েছে। ফিরে এসে নগর তৈরির কাজে আগ্রহ দেখান। পথঘাট তৈরির দিকে নজর পড়ে। বিমানবন্দর স্থাপিত হয়। আগরতলায় 'ত্রিপুরা স্টেট ব্যাঙ্ক' কাজ শুরু করে। ভাবনা ছিল একটা বড় মাপের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বব তৈরি করবেন। সেখানে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি ও চারুকলা কলেজ থাকবে। ভাবনা অনুযায়ী কাজ শেষ হয়নি। শুধু ১৯৪৭ সালে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ তৈরি হয়েছে। বীরবিক্রম কিশোর সঙ্গীতজ্ঞ ও নাট্যকার ছিলেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়েসে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়। ত্রিপুরার রাজপরিবারের কাহিনী যাঁকে দিয়ে শেষ হয়েছে তিনি কিরীটবিক্রম কিশোর। কিরীট ত্রিপুরার শেষ রাজা ছিলেন। বাবা বীরবিক্রম কিশোরের মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন। সাথে চাকলা-রোশনাবাদের জমিদারিও পেয়েছিলেন। নাবালক ছিলেন বলে রাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ঝড়ঝাপটা সামলাতেন। এদিকে দেশ দু'ভাগ হবার কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হয়েছে। পাকিস্তান ফন্দি আঁটছিল কেমন করে ত্রিপুরাকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়া যায়। ত্রিপুরার মানুষ সেই জিনিস চাননি কখনও। রাজপরিবারের সদস্যেরাও চাননি। ফলে নেহরুর সাথে রাণী কথা বলেন। ভারত সরকার সেনা সহায়তা দিয়ে পাকিস্তানের কবল থেকে রক্ষা করে ত্রিপুরাকে। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর দিল্লীতে রাণী চুক্তি করেন। যার ফলে ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অন্যতম অংশ হিসেবে ঘোষিত হয়। চাকলা-রোশনাবাদের কথা আলোচনায় এল না। ফলে ঐ জমিটুকু ভারতের হাতের বাইরেই রইল। কে জানে, রাণী সচেতন থাকলে হয়তো এতো উদ্বাস্তু মানুষের চাপ ছোট্টখাট্ট চেহারার ত্রিপুরাকে বইতে হতো না।

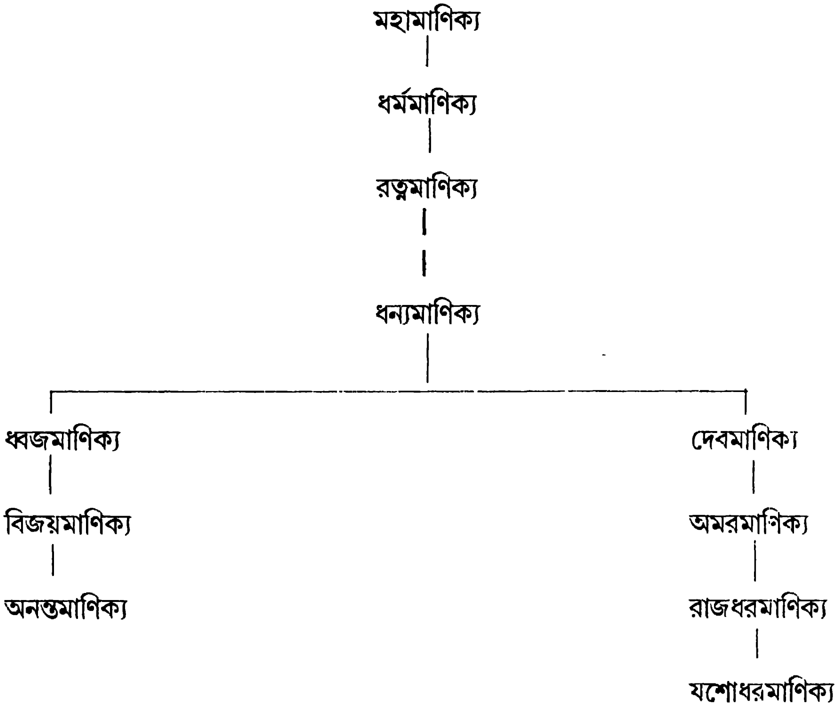
সদাশয় পাঠক উপলব্ধি করবেন। সাড়ে পাঁচশো বছর রাজত্বকাল যেই পরিবারের, তার কাহিনী এইটুকু পরিসরে উপবেশনের চেষ্টা বাতুলতামাত্র। আর আমরাও সেই বিবরণকে আলোচনার মূলসুরে বাঁধতে চাইনা। যে কোন জীবনের উৎস অনুসন্ধান না করে তার পরিচিতি স্পষ্ট করা যায় না। রাজা হবার কথা ছিল নবদ্বীপ মহারাজ কুমারের। রাজা তিনি হননি। সুরসমুদ্রের কিংবদন্তী শচীনকর্তার পিতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। রাজার চেয়ে সে কিছু কম সম্মানের ছিল না। কেমন বংশ ইতিহাসের উত্তরাধিকারী নবদ্বীপচন্দ্র ও তাঁর পুত্র শচীনকর্তা, সেই আভাসটুকু দিতে চেয়েছি।



রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হুসেনের হাত থেকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি গ্রহণ করছেন

শচীনকর্তার পূর্বপুরুষেরা

মাণিক্য রাজবংশের সাড়ে পাঁচশো বছর রাজত্বকালে অনেকেই রাজা হয়েছেন। সবার নাম তালিকায় যোগ করিনি আমরা। সরাসরি বংশধরদের কথা উল্লেখ করেছি। শচীনকর্তার বংশগত অবস্থান চিহ্নিত করাই আমাদের প্রধান অভিপ্রায়।



যশোধরমাণিক্য ছিলেন নিঃসন্তান। প্রথম রাজা মহামাণিক্যের দূর বংশধর কল্যাণমাণিক্য নামে রাজত্ব অব্যাহত রাখেন।

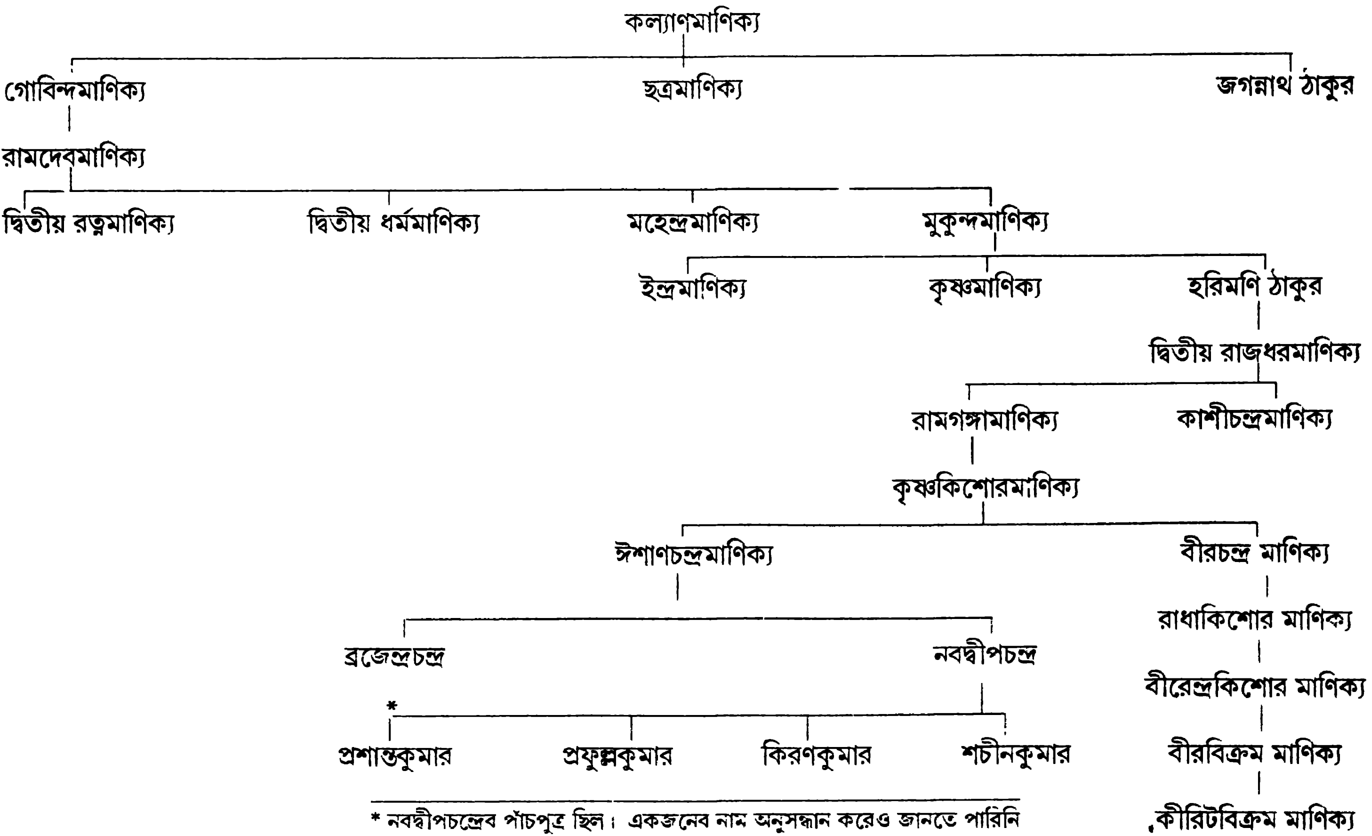


ব্রজতরঙ্গ'-র স্রষ্টা শিল্পী ব্রজেন বিশ্বাস



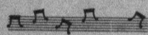
তারসানাইয়ের শিল্পী দক্ষিণামোহন ঠাকুর, সঙ্গে
শচীন ভৌমিক





* নবদ্বীপচন্দ্রের পাঁচপুত্র ছিল। একজনের নাম অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি

সম্ভবত এটিই শচীন কর্তার সবশেষ আলোকচিত্র



শৈশব কৈশোর কাহিনী

ত্রিপুরা রাজপরিবারের একটা ইতিহাস খুবই ছোট আকারে প্রারম্ভিক অধ্যায় হিসেবে ব্যবহার করেছি। সংঘাত ও সংহতির ইতিহাস একটা সময়ে এসে যেন অন্যতর মাত্রা পেল। নবদ্বীপ কর্তা নানা যথাযথ কারণ থাকলেও রাজা হতে পারেননি। কেন রাজা হননি, কথা বলে দেখেছি, নানা কথা প্রচলিত রয়েছে। প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরী মশাই একটা কারণ হিসেবে তো নবদ্বীপ কর্তার বিবাগী চরিত্রের কথাও উল্লেখ করেছিলেন।

সে যাই হোক, রাজবাড়ির বাইরে অন্য এক বাড়িতে জীবন কাটিয়েছেন নবদ্বীপ কর্তা। সে বাড়ি ছিল কুমিল্লায়।

নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনে আর্থিক অনটন দেখা দেয়নি কখনও। রাজা না হলেও রাজসম্পদের একটা অংশ পেয়েছিলেন। কুমিল্লা তখন ত্রিপুরাতেই ছিল। কুমিল্লার নবাববাড়ির সাথে ছিল খুব ভাব। ফলে নানুয়া দিঘীর পাড়ে বাড়ি করেই নবদ্বীপচন্দ্র থাকতে শুরু করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কুমিল্লা বাড়িতেই কাটিয়ে গিয়েছেন। নানুয়া দিঘীর কথা বলছিলাম। কুমিল্লা শহর দিঘীর শহর হিসেবেই মনুষ বেশি চেনে। অনেক বড় বড় দিঘী। রাজা উজিরেরাই খনন করিয়েছিলেন। ধর্মসাগর, রানীর দিঘী, উজিরের দিঘী। নানুয়ার দিঘীতো রয়েছেই।

নানুয়ার দিঘীর কাছাকাছি একটা ছোট এলাকা ছিল। নাম 'চরথা।' এই চরথাতেই শচীন কর্তাদের বাড়ি। বড় বাড়ি বেশ। ষাট বিঘা জমির উপর বাড়ি ছিল। এখন তার পলেস্তারা

খসেছে। এখানে ওখানে রিফিউজির লতাপাতা জড়িয়ে উঠতে দেখেছি। বাংলাদেশ সরকার সেখানে হাসমুরগি পালন কেন্দ্র চালু করেছেন। শচীন কর্তা ত্রিপুরার মানুষ। আরও বড় কথা, তিনি সুরজগতের মানুষ। ভাটিয়ালির মানুষ। শাস্ত্রসঙ্গীতের মানুষ। কোন বিকল্প ভাবনা কি নবদ্বীপ কর্তা ও শচীন কর্তার ওই বাড়ি নিয়ে ভাবা যেতো না? এখনও কি যায় না? খুব বড়ো বাড়ি। বড়ো গেইট ছিল এককালে। বিশাল উঠোন। নবদ্বীপ কর্তা কুমিল্লার জনজীবনে নিজেকে খুব বেশি মেলাননি। ঘরে বসে জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ আহরণ করতেন। পড়তেন প্রচুর। লিখেছেনও কিছু কিছু। সজ্জন ও সংস্কৃতজ্ঞ মানুষ ছিলেন। শচীন কর্তা বাবার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি আমার পিতৃদেবের ধাঁচে গড়া, তাঁর শিক্ষাই আমার মেরুদণ্ড। আমার কাছে বাবা ছিলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর দীক্ষাতেই আমার এই সামান্য কলাবিদ্যার স্ফুরণ ঘটেছিল।... বাবা আমাকে অঢেল ভালোবাসতেন। সত্যিকারের কলাকার ও গুণী শিল্পী ছিলেন তিনি। বাবা খুবই নিপুণ হস্তে সেতার বাজাতেন আর তা ছাড়া চমৎকার গলা ছিল তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ গানের। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়াতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আমাদের বাড়ির দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, কালীপূজা এই সব উৎসবে কুমোরকে সরিয়ে দিয়ে আমার বাবা স্বর্গত মহারাজকুমার শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ বাহাদুরকে দেখেছি দেবীর মূর্তি গড়তে।'

ইংরেজি ১৯০৬ সাল, ১লা অক্টোবর, শচীন কর্তা কুমিল্লার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মা নিরুপমা দেবী মণিপুর রাজপরিবারের মেয়ে ছিলেন। পাঁচ ভাই, চার বোন। ন'ভাইবোনের মধ্যে শচীন কর্তা সবার ছোট ছিলেন বলেই বাবা দূরে পাঠাতে চাননি। কাছাকাছি রেখে বড়ো করতে চেয়েছেন। নবদ্বীপ কর্তা প্রশান্ত আর প্রফুল্লকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের পাঠ সেরে ওঁরা পরে দার্জিলিং-এ সেন্ট পলস্ স্কুলেও পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নিবিড় বন্ধু ছিলেন নবদ্বীপ কর্তা। রবীন্দ্রনাথ নবদ্বীপ কর্তার বাড়িতেও একবার এসে ক'দিন ছিলেন। শচীন কর্তার ছোড়দা ছিলেন কিরণকুমার। লেফটেনেন্ট কর্নেল। ছ'বছরের বড়ো। ললিতকলারই মানুষ ছিলেন। নবদ্বীপ কর্তার ইচ্ছেয় মিলিটারিতে যেতে হয়েছিল। অথচ 'তাঁর গলা ছিল অতি মধুর, তিনি খটকী, মুড়কী তান ও লয়ের সঙ্গে গান গাইতেন ; ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাইফেল বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। শচীন কর্তা বলছেন, 'ভাইবোনদের ভিতর তিনি আমার সবচাইতে প্রিয় ছিলেন এবং তাঁর প্রভাব আমার সঙ্গীত জীবনে প্রচুর। ১৯৪৩ সালে ছোড়দার মৃত্যু আমাকে খুবই আঘাত দেয়।'

কুমিল্লা শহরের একটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বহু মানুষ তাঁদের স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারেও একই মানের চেতনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। তবে শুরুতেই একটা অন্য কথা বলতে চাইছি। রাজপরিবারের এই সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের ভেতর অন্য একটা অনুভূতির সন্ধান পেয়েছিলেন শচীন কর্তা। কোন রাজকুমার যখন

সঙ্গীতজগতের শীর্ষে আরোহণ করেছেন, তখন তার আত্মকথায় এমন মনোভঙ্গী শুরুতেই উল্লিখিত হয়—অসামান্য এক শচীন কর্তার মন আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। পাঠক খেয়াল করুন। শৈশবে এই উপলব্ধিতে বড়ো হয়ে না উঠলে তিনি কিছুতেই লোকগানের শচীন কর্তা হয়ে উঠতে পারতেন না। তাঁর নিজের জবানীতেই শুনি, 'ত্রিপুরার রাজবাড়ির রাজকুমার হয়ে জন্মেছি প্রাচুর্যের যুগে। বিলাস-ব্যসন, ঐশ্বর্য-বৈভব, শৌখিনতা, আদবকায়দা দেখেছি অফুরন্ত আমাদের বাড়িতে। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গুরুজনেরা আমাদের শৈশব থেকেই সচেতন করে দিতেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে আমরা তাঁদের যারা সাধারণ লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করি। আমি তাঁদের এ আদেশ কোনদিনও মেনে চলতে পারিনি। কেন জানিনা জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালোবাসতাম। আর বড়ো আপন লাগত সেই সহজ সরল মাটির মানুষগুলোকে যাদের গুরুজনেরা বলতেন 'সাধারণ' লোক। যাই হোক, অসাধারণের দিকে না ঝুঁকে আমি ওই সাধারণ লোকেদের মাঝেই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম শৈশব থেকেই। আমার এই আচরণ ও স্বভাব রাজপরিবারের কেউ পছন্দ করতেন না। আমার বাবারও কিন্তু কোনপ্রকার 'Pride' বা'Prejudice' ছিল না।'

বাবার যে 'Pride' বা'Prejudice' ছিল না, তার এক উজ্জ্বল উদাহরণও আমাদের সামনে রয়েছে। আগরতলা শহরে তখন 'কুমার বর্ডিং' ছিল। ছেলেরা থেকে লেখাপড়া করত। রাজবাড়ির ছেলেরাও থাকত সেখানে। শচীন কর্তা কিছুকাল ছিলেন। একদিন নবদ্বীপ বাহার দূর থেকে দেখলেন, একই অপরাধে মাষ্টারমশাই সাধারণ ছেলেদের যা শাস্তি দিচ্ছেন, রাজার ছেলেদের কম শাস্তি দিচ্ছেন। প্রমাদ গুণলেন নবদ্বীপ কর্তা। ছেলে তাহলে এখানে থেকে মানুষ হবেনা। মাষ্টারমশাইয়েরা যদি 'ছাত্র' ভাবনা বাদ দিয়ে 'রাজ ভাবনা'য় সংক্রমিত হন, ছেলের মানুষ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর দেরি করেননি নবদ্বীপ কর্তা। ছেলেকে 'বর্ডিং' থেকে তুলে নিয়ে এলেন। নিজের কাছে রেখেই মানুষ করবেন ঠিক করলেন। ফলে কুমিল্লা শহরেই শচীনের ছোটবেলাটা কেটেছিল। প্রথমে কিছুদিন ইউসুফ স্কুলে পড়েছিলেন। পরে একটু উঁচু ক্লাসে উঠে কুমিল্লা জিলা স্কুলে ভর্তি হন। ক্লাস ফাইভ থেকে জিলা স্কুলে পড়েছেন। 'পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রজীবনে বাবার শেখান গান আমি সরস্বতী পূজায় আমাদের স্কুলের অনুষ্ঠানে গেয়েছি।' মনে রেখেছেন সময়টা শচীন কর্তা। ১৯১৬ সাল! স্কুলে সবাই খুব খুশি। আদর আর প্রশংসায় বড়ো হচ্ছিলেন শচীন কর্তা। হেডমাষ্টারমশাই নিজে এতো খুশি হয়েছিলেন যে নবদ্বীপ কর্তার কাছে শচীন কর্তার খুব তারিফ করে চিঠি দিয়েছিলেন। কোথায় শিখেছিলেন শচীন কর্তা এই গান? বাবার শেখানো গান গেয়েছেন।

নিয়মিত তালিম নিতে চাইলে অন্য কথা ভাবতে হয়। শুধু শুনে শুনে গান হয় না।

কুমিল্লায় তখন শ্যামাচরণ দত্ত নামের একজন ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক ছিলেন। খ্যাতি ছিল তাঁর। বাবা চাইছিলেন, শচীন তাঁর কাছে গান চর্চা করুক। রাজি হলেন না শচীন কর্তা। বাবার কাছেই শিখতে থাকলেন।

ধ্রুপদ ও খেয়াল শচীনের ভালো লাগত না এমন নয়। বড়ো হয়ে এই জগতে অনেকটা সময় দিয়েছেন তিনি। ছোটবেলায় তাঁর মন পড়ে থাকত অন্য জগতে। গ্রামের গানে মন্ন ভরে যেত। শচীন কর্তার কথাতেই শুনুন।

'মাধব নামে আমাদের এক বৃদ্ধ চাকর ছিল। রবিবারে স্কুল ছুটির দিনে খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে এই মাধব আমাদের সুর করে রামায়ণ পড়ে শোনাত। সে যখন সুরে রামায়ণ পড়ত, তখন তার তান খট্‌কী ছাড়া, সরল সোজা গানের ধরন আমাকে পাগল করে দিত। কোন ওস্তাদী নেই, কিন্তু কত অনায়াসে সে গেয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে বাউল, ভাটিয়ালি গাইয়ে, গাজন-গান ও কালীনাচের গাইয়ে, ফকির, বোষ্টম দূরের গ্রাম থেকে সর্বদাই আসত। তাদের গানে আমি অভিভূত হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে আনোয়ার নামে আরেক ভৃত্য ছিল। এই আনোয়ার ছিল আমার মাছ্ ধরা শেখানর গুরু। আমাদের বাগানের বাঁশ গাছের বাঁশ কেটে তাই দিয়ে নিজের হাতে ছিপ তৈরি করে, নিজে সূতো কেটে, তা ছিপে জুড়ে দিত। তার নিজস্ব সম্পত্তির এক বাক্স খুলে তা থেকে ওর নিজের মরচেপড়া বড়শী ছিপে লাগিয়ে আনোয়ার আমাকে মাছ্ ধরা শেখানতে হাতে খড়ি দিল। কুমিল্লায় আমাদের ষাট বিঘা জমির উপর বাড়ি। তাতে ফলের, তরকারির, ফুলের বাগান। বড় বড় পুরানো গাছ্ আর তিনটে বড় পুকুরে ভর্তি মাছ্ ছিল। এসব বাবার সখের জিনিস। বাবা নিজের হাতে গাছ লাগাতেন। মালীর সঙ্গে বাবা নিজের হাতে মাটি কোপাতেন। গোমতী নদী থেকে নিজে মাছের পোনা সংগ্রহ করে প্রতি বছর পুকুরে ছাড়তেন। আনোয়ার আর আমি সুযোগ বুঝে ছিপ নিয়ে বসে যেতাম—আর দু'জনে মাছ্ ধরতাম। তারপর গান গাইতে গাইতে পুকুরের ধারে ধারে ও বাগানে দু'জনে বেড়িয়ে মনের কথা বলতাম। সেই দিনগুলি যে কি মধুর ছিল তা এখন বলে বোঝাতে পারব না।

আনোয়ার রাত্রে তার দোতারা বাজিয়ে যখন ভাটিয়ালি গান করত, তখন আমার ব্যাকরণ মুখস্থ করার দফারফা হয়ে যেত। এবং পরদিন স্কুলে মাষ্টারমশাই-এর কাছে বকুনিও খেতাম। কিন্তু রাত্রে আবার ব্যাকরণ মুখস্থ, অঙ্ক কষা ছেড়ে আনোয়ারের কোল ঘেঁষে বসে তার ভাটিয়ালির সুরে ও কথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। এরাই হল, লোকসঙ্গীতের আমার প্রথম দুই গুরু—মাধব ও আনোয়ার।'

মার্গ সঙ্গীতে কি কোনই আগ্রহ ছিল না শচীন কর্তার? ছিল বৈ কি। তবে বলতেন তিনি, 'ওস্তাদী গানেতে গলা সাধতে হয় দস্তুরমত, তাতে সরগম, তাল, লয়, মীড়, গমকের দরকার। কিন্তু আনোয়ারের গানে এসবের কোন বালাই ছিল না—সহজ সুরে, মিষ্টি করে গেয়ে সে প্রাণ মাতিয়ে দিত। আমি মার্গসঙ্গীত যত পছন্দ করতাম, ঠিক ততখানি মাধব

আনোয়ারের গানেও মুগ্ধ হতাম।

স্কুলের সঙ্গেই লাগোয়া খেলার মাঠ ও তার পাশে বুড়ো বটগাছ্। সেই গাছের নীচে আমাদের গানের নিয়মিত আসর জমত টিফিনের ছুটিতে। আমি আনোয়ারের গানগুলি গাইতাম—খোলা মাঠে—পাশে ধর্মসাগর দীঘি। বড় বড় গাছের তলায়, রোদে, বৃষ্টিতে, ঝড়ে, বাদলে, শীতে, কী আনন্দই না পেয়েছি প্রকৃতির কোলে মাটির গান গেয়ে দিন কাটিয়ে। সে আনন্দের আস্বাদন আজ আর পাওয়া যাবে না।'

শহরে ইট কাঠ কংক্রিটের আড়ালে যারা বেড়ে উঠে, তারা এই গানের মূল্য দিতে পারবেন কি ? মুম্বাইবাসী এক শীর্ষস্থানীয় শিল্পী ও সুরকার শচীন কর্তা ১৩৭৬ সালে এই প্রশ্ন তুলেছেন। অতীতের শিক্ষাকে অটুট করে ধরে রেখেছেন যিনি, তিনিতো বলতেই পারেন, 'শহরবাসীরা তার মূল্য বুঝবে না, সন্ধানও বুঝবে না। আনোয়ারের গানে সোজা সরল সুরে ও কথায় দেহতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের বর্ণনা কি যে অপূর্ব আমেজ এনে দিত, তা বুঝিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

এমন সুরেলা গান দিয়ে মাতোয়ারা করে শচীন কর্তা তাঁর জীবনে বেশ ক'বার শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। একবার পূজোর মেলায় গিয়ে কি কাণ্ড ঘটেছিল। তাঁর নিজের জবানিতেই শুনুন।

'আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি, কুমিল্লা থেকে দশ মইল দূরে কমলাসাগরে পূজার মেলা দেখতে যাচ্ছি—বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের সঙ্গে। সেখানে কালীমন্দিরের চারিপাশ ঘিরে মেলা বসত। বহু দূর থেকে গ্রামবাসীরা মেলা দেখতে আসত। মেলা দেখা শেষ করে কমলাসাগর স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা টিকিট না কেটেই দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়ি। পরে টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়ে যাই, বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে। কুমিল্লার স্টেশন মাস্টার আমাদের সবাইকে স্টেশনের পাশে একটি গুদামঘরে বন্ধ করে দেন। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বাবার অনুমতি নিইনি, ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে যাব। কোন জবাবদিহি করতে হবে না। তখন স্টেশনে গুদামজাত হয়ে আমি ত কেঁদেই ফেলি। আমার সহপাঠী মোহিত এক বুদ্ধি যোগাল। সে বলল 'স্টেশনমাস্টারের মা খুব গান ভালবাসেন। কিছু আগে আমাদের বাড়িতে ঢপ কীর্তন শুনতে এসে আবেগে কাঁদছিলেন। শচীন, তুই তোর ভাটিয়ালি ও বাউল গানগুলি শুরু কর দেখি। এই গানগুলো গাইলে আমাদের মুক্তি পাবার একটা সুরাহা হবে।' আমি অবসন্ন মনে গান শুরু করে দিলাম। গানে কোন প্রাণ ছিলনা কারণ আমি তখন বাড়ি পৌঁছাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু গানের কি মহিমা আর মোহিতের বুদ্ধির কি বাহাদুরী—আমার গান পৌঁছাল স্টেশন মাস্টারের মার কানে। দশ মিনিটের মধ্যে তাজ্জব ব্যাপার। গুদামঘরের দরজা খুলে গেল। দেখি সশরীরে স্টেশন মাস্টারের মা উপস্থিত। গান শোনার পর ছেলের নিকট আমাদের কথা শুনে মুক্তি দিলেন আমাদের। এমনকি বাড়ি যাবার আগে সকলকে মিষ্টিমুখও করিয়ে

দিয়েছিলেন।'

কুমিল্লায় কাত্যায়নী কালীবাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা ক্লাব ছিল। ইয়ংমেনস ক্লাব। সেখানে রোজ আড্ডা দিতেন শচীন কর্তা। 'পূর্বাশা' খ্যাত সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ; নারায়ণ চৌধুরী—এঁরা সব আসতেন। মাঝে মাঝে নজরুল ইসলাম হাজির হতেন।

পড়াশুনোয় শচীন কর্তা কেমন ছিলেন? যারা দেখেছেন তাঁকে ছোটবেলায়, বলেছেন, পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন। নিজে কি বলতেন? 'ব্যাকরণ ও অঙ্কের নামে আমার গায়ে জ্বর এসে যেত।'

নবদ্বীপ কর্তা তাঁর ভাবনার ভুবন বাড়ির অন্দরমহলে তৈরি করে নিলেও ছেলেরা সব উল্টো হয়েছিল। খুব মিশুকে। শহরের সব কাজে সবার আগে পা বাড়িয়ে থাকতেন। খেলাধূলা, গানবাজনা সব কিছুতেই।

১৯২০ সাল। ১৪ বছর বয়েসে শচীন কর্তা কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরের ধাপ কলেজ। কোথায় পড়বেন? ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। সাহিত্যে ঝোঁক বেশি। আর্টস নিয়ে পড়বেন। আই-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। বাইরের সবাই বলছেন, পড়াশুনোয় শচীন কর্তা ভালো। শচীন কর্তা নিজে বলতে চান অন্যকথা। অকপটে অন্যকথা। 'পড়ায় তেমন মন ছিল না। পাশের নবাব বাড়িতে প্রতি বছর বড় বড় গাইয়ে, বাজিয়ে ও বাঈজীরা এসে গান বাজনা করতেন। পড়া ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে সেই সব মজলিসে সময়মত উপস্থিত হতাম আর রাতের পর রাত তাঁদের গান বাজনা উপভোগ করতাম।'

ভাটিয়ালী আর বাউল প্রেমিক শচীনকর্তার কথা খানিকটা আগে আমরা বলেছি। কলেজে পড়ছেন যখন, এই নেশা তাঁকে ছাড়েনি। কলেজের ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে গ্রামে গ্রামে ভাটিয়ালী ও বাউল গায়কদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন।

যাঁরা পরে শচীন কর্তার জীবন নিয়ে কথা বলেছেন, তাঁরা শচীন কর্তার 'তিন প্রিয়' জিনিসের কথা বলেছেন। 'গান', 'মাছধরা' আর 'খেলা'। ছোটবেলায় শচীন কর্তা ভালোই খেলতেন। '...টাউন হলের মাঠে টেনিস খেলায় একজন পয়লা নম্বরের খেলোয়াড়।' পরে গানের জগতে পুরোপুরি চলে যাবার পর নিজে খেলতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক শচীন কর্তা মুম্বাইয়ে পুরো দলটাকে এনে থাকা খাওয়ার আয়োজন করে খেলা দেখতে যেতেন। মুম্বাইতে ইস্টবেঙ্গল খেলতে গিয়েছে, শচীন কর্তা মাঠে নেই এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আরও একটা গুণ তাঁর ছিল। খুব ভাল তীর ছুঁড়তে পারতেন। দক্ষ তীরন্দাজ। তীর দিয়ে তিনি কি আর আমাদের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্ধ করেননি? এমন তীর, সুরসপ্তকে গড়া, আমাদের আহত হতে ভালোই লাগত। আজও লাগে, যখন তাঁর গান শুনতে পাই।

যাই হোক, শচীন কর্তার মাছ ধরার এক গল্প বলা যাক। একটু সময় পেলেই আনোয়ারের

সাথে মাছ ধরতে বসে যেতেন শচীন কর্তা। এই নেশা তাঁর বরাবরের ছিল। কলকাতাতে ছিল। মুম্বাইতেও ছিল। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কলকাতায় তিনি নিয়মিত বড়শি ফেলতেন। কলকাতার আশেপাশে কোথাও চলে যেতেন সকালবেলা। বিকেলে ফিরে আসতেন। মুম্বাইতে পাওয়াই লেকে মাছ ধরতেন। মাছ ধরার ক্লাবের মেম্বার হয়ে গিয়েছিলেন। কারা থাকতেন সাথে? অনেকেই, কেউ পরিচিত, কেউ অতো পরিচিত নন। দু'জনের কথা শচীন কর্তা নিজেই লিখেছেন। মুকুল বসু। নীতীন বসুর ছোট ভাই। সিনেমার গুরু দত্ত। আরও অনেকে।

কলেজের ছাত্র যখন শচীন কর্তা, কেমন শাসন করতেন বাবা তাঁকে? উদারমনের মানুষ যেমন হয়, তার বাইরে পা বাড়াননি কখনও নবদ্বীপ কর্তা। ছেলেকে ডেকে বলেছেন, 'সময়মত খাওয়া দাওয়া করবে—আর পাশ করতেই হবে একবারে—কাজেই পড়াশোনার সময়টুকু ঠিক রেখো। তোমার গান শেখার বা শোনার ইচ্ছায় আমি কোন বাধা দেব না। কারণ নিজের ভালমন্দ বোঝার তোমার এখন বয়স হয়েছে।'

নারায়ণ চৌধুরী বলেছিলেন, শচীন কর্তা কুমিল্লা টাউন হলের মাঠে টেনিস খেলায় একজন পয়লা নম্বরের খেলোয়াড়। শচীন কর্তা নিজে কি বলেছেন?

'...ছিল টেনিস খেলার নেশা। কুমিল্লায় আমাদের বাড়িতে টেনিস লন ছিল, সেখানে সর্বদাই খেলতাম। সেখানে চ্যাম্পিয়ন আখ্যাও পেয়ে গিয়েছিলাম।' ব্যাডমিন্টনও ভালো খেলতে পারতেন। ফুটবলে ফরোয়ার্ড ও লেফট আউট খেলতেন। উমাকান্ত মাঠে একবার IFA-এর রেফারিও হয়েছিলেন।

কেমন একটা নরম মন ছিল শচীন কর্তার, আজ আমরা অনেকে ভাবতেও পারিনা। মাধব আর আনোয়ারের কথা বলেছেন শচীন কর্তা। আর প্রবীণা ধাই মায়ের কথা বলেছেন। শচীন কর্তার পরিবারে সব ভাইবোনের জন্য আলাদা আলাদা ধাই-মা ছিলেন। তাঁর 'ধাই-মা'-এর নাম ছিল 'রবির মা'। মন খারাপ করত শচীন কর্তার। তাঁকে মায়ের মতো যত্ন দিয়ে মানুষ করেছেন। তাঁর নাম 'রবির মা' হবে কেন? শচীনও কি তাঁর ছেলে নন? বিস্ময় লাগে বড় ভাবতে এমন। শৈশবের ভাবনা পরিণত বয়েসের আত্মকথায় উচ্চারণ করতে শচীন কর্তা দ্বিধান্বিত হননি। শচীন কর্তার একটা চমৎকার নাম ঐ ধাই-মা দিয়েছিলেন। পাঠক জানলে পুলকিত হবেন। ডালিমকুমার। রূপকথার গল্পে অনেক রাজকুমারের এমন নাম দেখা যায়। ডালিমকুমার নাম কেন দিয়েছিলেন ধাই-মা? টুকটুকে ফর্সা ছিলেন শচীন কর্তা। কখনও তাঁর কথা ভুলতে পারেননি শচীন কর্তা। নিজের জীবনকথায় লিখেছেন, '২৪ ঘন্টা তিনি আমাকে স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখতেন—জ্ঞান অবধি তাঁর হাতেই স্নান খাওয়া শোওয়া সব কিছু। কলেজ জীবনেও বাড়ি থেকে যখন বাইরে যেতাম, আমার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। দেরী হলে তাঁর বকুনি শুনতে হত। পরে যখন কলকাতাতে স্থায়ীভাবে এসে বাস করছি, ধাই-মাও আমার সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন, কারণ আমাকে না দেখে

তিনি থাকতে পারতেন না। দু'বছর আমার সঙ্গে থেকে ১৯২৭ সালে দেশে ফিরে গেলেন। বৃদ্ধা ধাই-মা দেশে ফিরেই রোগে আক্রান্ত হন এবং অল্প কয়েকদিন ভুগে ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষ সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। আমি তখন কলকাতায়।' এই হলেন শচীন কর্তা।

১৯২২ সাল। শচীন কর্তা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ভালোভাবেই আই এ পাশ করলেন। শচীন কর্তা আর একই কলেজে থাকতে চাইলেন না। বাইরে কোথাও যেতে চান। দাদারা সব বাইরে বাইরে রয়েছেন, সবার ছোট শচীন কর্তাও এবার বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করতে চান। কোথায় যাবেন? কলকাতায়। বাবা কি ছাড়বেন? ছোটবেলা থেকেই তো শচীনকে বাবা আগলে আগলে নিজের কাছে রেখেছেন। স্বাধীনতা যেই বয়েসে যা দেবার দিয়েছেন, তবু বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও যেতে দেননি।

ভয়ে ভয়ে বাবাকে বললেন শচীন কর্তা। বাবা চুপচাপ রইলেন কিছুক্ষণ। খারাপ লাগল শচীন কর্তার। বাবা বললেন তারপর, 'তুমি আমার ছোট ছেলে, অন্য সবাই বিদেশে, অন্তত আরও দুটি বছর তুমি আমার কাছেই থাকবে। এটাই আমি চাই।'

বাবাকে অমান্য করতে চাইবেন কেন? সত্যিইতো। বাবা একা হয়ে যাবেন। একা একা বাবা মা থাকবেন কেমন করে? রাজি হয়ে গেলেন শচীনকর্তা এককথায়। ১৯২৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজেই বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হলেন। বাংলার জল, বাংলার মাটি শচীনকে কিছুতেই বোধহয় ছাড়তে চাইল না। পড়া চলত একদিকে। অন্যদিকে বাংলার গানের সন্ধানে মাতোয়ারা শচীন কর্তা গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নিজের কথাতেই শুনুন। 'নতুন উদ্দীপনায় ঘুরে বেড়াতাম গ্রামে মাঠে ঘাটে। ভাসাতাম নদীর জলে নৌকা, চাষী জেলেদের সঙ্গ—বাউল বোষ্টম ভাটিয়ালী গায়ক ও গাজন দলের সঙ্গে ছুটির ফাঁকে কলেজ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতাম গান গেয়ে। আমরা সবাই যে এক হুঁকোয় তামাক খেতাম, বাবা তা জানতেন না।' স্নিগ্ধ অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে উচ্চারণ করছেন শচীন কর্তা, 'পূর্ববঙ্গের ওই অঞ্চলের এমন কোন গ্রাম নেই বা এমন কোন নদী নেই, যেখানে আমি না ঘুরেছি। ছুটি ও পড়াশোনার ফাঁকে আমি গান সংগ্রহ করতাম। আমার এখনকার যা কিছু সংগ্রহ যা কিছু পুঁজি সে সবই ওই সময়কার সংগ্রহেরই সম্পদ। আজ আমি শুধু ওই একটি সম্পদেই সমৃদ্ধ, সে সম্পদের আস্বাদন করে আমার মনপ্রাণ আজও ভরে ওঠে। যে সম্পদের জোরে আমি সুরের সেবা করে চলেছি—তার আদি হল আমার ওইসব দিনের সংগ্রহ ও স্মৃতি।'

প্রতি পংক্তিতে বিস্ময়ের কথা উচ্চারণ করলেও শচীন কর্তার হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। কতোটা আত্মবিশ্বাস আর দাপট থাকলে মুম্বাই জগতের প্রিয় মানুষটি লিখতে পারেন এইসব কথা, মাঝে মাঝে আমরা হয়তো শুধু অনুভবের কসরৎ করতে পারব।

কারও কারও লেখায় দেখতে পাই, শচীন কর্তার শৈশব ও কৈশোরের কথা বলতে

গিয়ে বলেছেন, জীবনের প্রথমে তিনি গান করতেন না। বাঁশি বাজাতেন। আমরা যেমন বাঁশি দেখতে পাই তেমন নয়। 'টিপরাই বাঁশি।' একথা ঠিক, বাঁশি বাজানোতে খুবই দক্ষ ছিলেন শচীন কর্তা। যেমন তবলা বাজানোতেও তাঁর খুব ভালো হাত ছিল। কুমিল্লা শহরে তিনি ও নজরুল একসাথে গানের চর্চা করেছেন। নজরুল দিঘীর পাড়ে বসে গান লিখেছেন। শচীন কর্তা সুর করে গাইতেন সে গান। আবার একথাও ঠিক, নজরুল যখন গীতরচনায় মগ্ন, শচীন কর্তা একমনে বাঁশি বাজাতেন। তবে একথা ঠিক, ঐ কৈশোর পর্ব ছিল শচীন কর্তার নির্মাণ পর্ব। নিজেকে তৈরি করার পর্ব। বড়ো জগতে আসন লাভের প্রস্তুতি পর্ব। ফলে আলাদা করে গানবাজনা খেলাধূলা-এককভাবে কেউই মাথা ছাড়িয়ে যায়নি।

কলেজে যখন নাটক হত, শচীন কর্তার ভূমিকা থাকত প্রতি বছর। একজন ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। নিজে নাটক লিখে ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। আবার অন্য নাটকও পরিচালনা করতেন। নিজের হোক বা অন্যের নাটক হোক, গান লিখতেন নিজেই, সুর দেবার ভার ছিল শচীন কর্তার উপর। একজন কলেজ পড়ুয়ার হাতে দক্ষতা যাচাই না করে নিশ্চয়ই কেউ সুর সংযোজনার দায়িত্ব অর্পণ করতেন না।

১৯২৪ সাল। শচীন কর্তা বি. এ. পাশ করেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে তিনিই ছিলেন প্রথম স্নাতক। নিছকই এ এক তথ্য, এর উপর বেশি কিছু নির্ভর করেনা। যাই হোক, এবার কুমিল্লার মাটি ছেড়ে বাইরে যেতেই হবে। খুব কাছাকাছি বলতে কলকাতা। বাবা নিজে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. (ইংরেজি) ক্লাসে ভর্তি হলেন। শচীন কর্তার জীবনে নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হল।

কলকাতার উপাখ্যান

মহানগর কলকাতা। লোকেরা যেমন চোখেই দেখুক। বলতে হয় সংস্কৃতির পুণ্যভূমি। প্রতিভার যোগ্য সমাদর যেমন দিতে শিখেছে এই কলকাতা, প্রতিভা নির্মাণের আবহও তার ডালপালা ছড়িয়ে রেখেছে এই কলকাতায়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে তখন 'ত্রিপুরা প্যালেস' ছিল। শচীনকর্তা এখানে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে যার জীবনের বড়ো একটা সময় কেটেছে, তিনি কোন বড় নগরে এসে কখনও চট করে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেননা। রাজবাড়ির ছেলে হলে কি হবে! শচীনকর্তার বেলাতেও ঘটল তাই। অস্বস্তি লাগছে বড়। চারপাশের জীবনের সাথে মানিয়ে নিতে পারছেন না। শহরের গোলক ধাঁধায় নিজেকে বোকা বলে মনে হতে থাকল। তাঁর অনুভূতির কথা শচীনকর্তা নিজেই লিখে গিয়েছেন, 'মানুষের হাতের তৈরী সব কিছু আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগল। সিমেন্ট ও পাথরে তৈরী কলকাতা পিচ ঢালাই প্রশস্ত তার রাস্তাঘাট বিজলী বাতির রোশনাই—প্রথমটা এইসব দেখে কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়েছিল সবকিছু, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, আরও অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে কলকাতায় মাটি বিক্রী হয়। আমি যে মাটির মানুষ-সেই মাটি কলকাতা শহরে বিক্রী করা হয়—এবং তা লোকেও কেনে-এসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।'

সকাল থেকে সন্ধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ আর লাইব্রেরিতে পড়াশুনো—এসবেই কেটে যেত। রাতে ফিরে মনটা হাহাকার করে উঠত তাঁর। একটু হাওয়া চাই। একটু খোলা

আকাশ চাই। চারপাশে এতো আলো, আকাশ দেখা যায় কই? 'অমাবস্যা' বলে যে একটা দিন আছে কলকাতা শহরে বসে বোঝা যায়না। রোজদিন পূর্ণিমার দিন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গ্রামবাংলার কথা মনে হত। বিশাল বাড়ির চারপাশে তিন দিঘী। দিঘীর পাড়ে পাড়ে ঘুরে গান গাওয়া আর বাঁশি বাজানো। হ্যাঁ, সেই টিপরাই বাঁশি। আলাদা কোন গরিমা নেই তাঁর। বলছেন, ত্রিপুরায়, সবাই বাঁশি বাজাতে পারে এমন একটা প্রবাদতো রয়েছেই। শুধু বাঁশি কেন। 'সরগমের নিখাদ' লিখতে শুরু করলেন যখন শচীনকর্তা, শুরুই করলেন এমন বলে, 'ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানী, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষীরা গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে জানে না, জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবান প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ— তাই বোধহয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।' লক্ষ কোটি মানুষের চেয়ে আলাদা শচীনকর্তা। তবু কেমন সব মানুষের মত!

কলকাতার জীবনে ফিরে আসি আবার। পড়াশুনো শচীনকর্তার ভালো লাগছিল না। গান করতে চান। গান শিখতে চান। যাঁর গান শুনলে মন তাঁর হু হু করে উঠত, তিনি কৃষ্ণ চন্দ্র দে। হিন্দুস্থানী ঘরানায় বাঁধা সুর কথা আর আর্তির মূর্ছনায় লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে আবিষ্ট করে দিতে পারতেন কৃষ্ণচন্দ্র। ১৯২৫ সালেই তাঁর কাছে ছাত্র হিসেবে নাম লেখালেন শচীনকর্তা। কৃষ্ণচন্দ্র দে কলকাতায় শচীনকর্তার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে নিয়ে কুমিল্লা ও আগবতলায় অনুষ্ঠানও করিয়েছেন শচীনকর্তা।

১৮৯৩ সালে জন্মাষ্টমী তিথিতে কলকাতায় তাঁর জন্ম। বাবা শিবচন্দ্র তাই 'কৃষ্ণচন্দ্র' নাম রাখেন। বউবাজার স্কুলে যখন তিনি তেরো বছরের ছাত্র, গ্লুকোমায় চোখ হারান। আঠারো বছর বয়েস থেকে শশীভূষণ দে'র কাছে সঙ্গীতের তালিম নেন। এছাড়া তিনি করামতুল্লার খাঁ, বাদল খাঁ, জমিরুদ্দিন খাঁ, শিবসেবক মিশ্র, দর্শন সিং, মোহাম্মদ দবীরুদ্দীন খাঁ ও সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখেছিলেন। কলকাতার গোয়াবাগানে রাধারমণ দাসের কাছে কীর্তন শেখেন। প্রচুর কীর্তনও গেয়েছেন। 'ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে'। (চন্ডীদাস) ও 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাক' (চন্ডীদাস) লোকের মুখে মুখে ফিরত। পোষাকে পারিপাট্য ছিল। স্টেজ দাপিয়ে গান করতেন। এইচ. এম. ভি. তে যাঁব রেকর্ড আঠারো বছরে বেরোয়। তিনি যে ভবিষ্যতে অসামান্য হয়ে উঠবেন, একথা বলাই স্বাভাবিক। শিশির ভাদুড়ির সাথে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ভিক্ষুকের চরিত্রে বিখ্যাত গান 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' পরিবেশন করেন। 'রঙমহল' প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। 'শর্মিষ্ঠা' (১৯৩৯) 'চাণক্য' (১৯৩৯) ইত্যাদি ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

বাংলা ছবি 'পূরবী' প্রযোজনা করেছেন। বাংলা হিন্দু, উর্দু ও গুজরাটি মিলিয়ে মোট রেকর্ডের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। ১৯৬২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাবা যখন জানলেন, শচীনকর্তা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গান শিখতে যাচ্ছেন, আপত্তি করেননি। বরং বলা ভালো মৃদু সমর্থনও ছিল। মাছ্ ধরার কথা ভাবতে পারছিলেন না। খেলা শুরু করতে চাইলেন আবার। তখন ওয়াই. এম. সি. এ. তে নাম লেখালেন। ওখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অনেকে ছিলেন। মেম্বার হতে শচীনকর্তার কোন অসুবিধে হয়নি। নিয়মিত টেনিস খেলতে লাগলেন। গান শেখা আর টেনিস খেলা। কোথাকার কোন গেঁয়ো ছেলে, তাঁর সাথে টেনিস খেলবে কে? জেদ চাপল শচীনকর্তার। প্রতিদিন ঠিক দুপুর দুটোয় এসে মাঠে চর্চা শুরু করেন। যিনি থাকতেন উল্টোদিকে তিনি একজন নামকরা দক্ষিণ ভারতীয় খেলোয়াড়। তাঁর তালিমে খেলায় দিন দিন ভালো করতে থাকেন শচীনকর্তা। ঐ খেলোয়াড়কে প্রতিদিন পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে তবে খেলতে হত। খেলার তালিম আর গানের তালিম একসাথে চালাতে পারলেন না, কেন? বেশি খেলতে গিয়ে ঘাম হচ্ছে। গরম ঠান্ডা লেগে গলা ভেঙ্গে যাচ্ছে। এমন গলায় গান তালিম হয় না। কৃষ্ণচন্দ্রের কারণ বুঝতে সময় লাগল না। শচীনকর্তাকে বলেও দিলেন, গান চর্চা করতে চাইলে টেনিস ছাড়তে হবে। কৃষ্ণচন্দ্রকে 'কেষ্টবাবু' বলতেন শচীনকর্তা। কলকাতা শহরে কেষ্টবাবু শচীনকর্তার প্রথম সঙ্গীত গুরু। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললেন। গলার স্বর ঠিক আগের মত ফিরে পেয়েছিলেন শচীনকর্তা। কেষ্টবাবুর কয়েকটি প্রসিদ্ধ গানের কথা আগে বলেছি। এইচ. এম. ভি. রেকর্ডে তাঁর অনেক গান ছিল। সম্প্রতি দু'খানা ক্যাসেটও বেরিয়েছে। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে (এস. টি. এইচ. ভি. ৮৪২২২৪) ও শতেক বরষ পরে (এস. টি. এইচ. ভি. ৮৪২৪৬৭)। প্রথমটিতে চোদ্দটি গান ও পরেরটিতে বারোটি গান রয়েছে। আশ্চর্য এক উপায়ে কেষ্টবাবু শচীনকর্তাকে গান শেখাতেন। সহজ সরল করে রেওয়াজ করতে বলতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে বলতেন না। চাপাচাপি করে আর যাই হোক, ভালো গান হয় না।

কেষ্টবাবুর ছাত্র হয়েছেন জেনে নবদ্বীপকর্তা অখুশি ছিলেন না। পড়া ছেড়ে দেবার কথা জানতে পেরে দুঃখ পেলেন। তবে একটা বয়েসের পর জোর খাটাতে চাইতেন না। কলকাতায় এসে বাবা শচীনকর্তাকে আইন কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেলেন। কে পড়বেন আইন? শচীনকর্তা? তাহলেই হল! 'আইনের মারপ্যাঁচ আমি কি পড়ব। ওইসব বই দেখলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করত। মাথায় আইনের কিছুই ঢুকত না।' ফলে মাস কয়েক খেয়ালখুশি মত যাতায়াত করে আইন পড়া ছেড়েই দিলেন। বাবা ছাড়বার পাত্র নন। ছেলের ভবিষ্যৎ এবার তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিল। কি করবেন শচীনকর্তা? রাজার বাড়ির যা জায়গা জমি ভাগে পেয়েছেন, সামলে সুমলে রাখতে হলেও তো একটা ঠিকঠাক ট্রেনিং চাই। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় নবদ্বীপচন্দ্র ত্রিপুরার মন্ত্রীর ছিলেন। ইচ্ছে, শচীনকর্তা বিলেত থেকে জমি জায়গা সামলানোর উপায় শিখে আসুক। একটা বড়ো পদে তাঁকে চাকুরি দিয়ে দেবেন। এমন মসৃণ অভিযাত্রায় শচীনকর্তা সামিল হতে চাইলেন না। একটুও কাঠখড়

পোড়াতে হবে না, তবু শচীনকর্তা নারাজ। মনে অবশ্য ঝড় বয়ে গিয়েছে খুব। বাবাকে অমান্য করার কথা কখনও ভাবেননি। বাবা নিজে থেকেই তো স্বাধীনতা দিয়েছেন। আবার অমান্য করবেন কেন? কিন্তু এবার করতে হল। পড়া করতে বিলেত যাবেন না—জানিয়ে দিলেন। ত্রিপুরার রাজদরবারে বড় চাকুরি নেবেননা—সে কথাও জানিয়ে দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে নানা জায়গায় গান ও অভিনয় করতে নিয়ে যেতেন শচীনকর্তা। ১৯২৫/২৬ সাল নাগাদ ছাত্র হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যোগ দিয়েই, তাঁকে কুমিল্লা নিয়ে যান। ঐতিহাসিক টাউন হল। ওখানে 'সীতা' নাটকের অভিনয় হবে। ব্রহ্মানন্দ নাগ, সুশীল মজুমদার, অজয় ভট্টাচার্য এঁরা সব অভিনয় করবেন। বৈতালিক হবেন কে? শচীনকর্তা দায়িত্ব নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রকে কুমিল্লায় নিয়ে এসেছিলেন। দরাজ গলায় মঞ্চ কাঁপিয়ে একের পর এক গাইতে থাকলেন, কথা কও কথা কও, অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে, জয় সীতাপতি সুন্দর তনু। সারা শহরের এমাথা ওমাথা জুড়ে শুধু মানুষের ঢেউ। সবাই কৃষ্ণচন্দ্রকে শুনবেন। নাটক হল। মানুষের মন জয় করে নিল। এই 'সীতা' নাটকের বন-বালারা বন-বালকে নিজেদের পাল্টে নেয়। ফলে ছোট ছোট ছেলেদের অভিনয় করতে আর কোন বাধা থাকে না। এমন আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই রয়েছেন যাঁরা শচীনকর্তার নগরজীবনের প্রথম সঙ্গীতগুরুর কণ্ঠস্বর আজও শুনতে চান। আমরা সেই ভাবনা থেকে তাঁর অধুনালভ্য ক্যাসেট দুটোর পরিচয় দিলাম।

মহাসিন্ধুর ওপার থেকে

(STHV ৮৪২২২৪)

মেঘ হেরি নীল গগনে ; আজ অবেলায় কলসী নিয়ে ; ভালবেসে কেঁদে মরি ; নয়ন থাকিতে নয়নে এলো না ; ঘন ডম্বরু বাজে ; কত সবে প্রাণে ; সখি লোকে বলে কালো ; জয় সীতাপতি ; নেচেছে প্রলয় নাচে ; জাগিও না আমায় জাগিও না ; আঁধারের ডম্বরু তালে ; বাজলো আমার শ্যামের বাঁশি ; ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী ; ওই মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে।

শতেক বরষ পরে

(STHV ৮৪২৪৬৭)

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ; স্বপন দেখিছে রাধারাণী ; নবদ্বীপের শোভনচন্দ্র , কুঞ্জ সাজায়ে দে লো ; সকালে চলিলি যমুনা সিনানে ; বলি শুন হে মথুরারাজ ; শতেক বরষ পরে ; হিয়ায় রাখিতে সে পরশমণি; ওদিকে নিমাই চলে ; যামিনী তুমি দীঘল হয়ো ; বুঝাও আমারে কেন ; কুরূপা কুব্জা রাণী হল।

কৃষ্ণচন্দ্র দে আগরতলাতেও একাধিকবার গিয়েছিলেন। রাজদরবারে গান শুনিয়েছেন। মালকোষ রাগের উপর 'দীন তারিণী তারা' গানটি ঐসময়ে আগরতলা শহরের অনেকেই মুখে মুখে গাইতেন। পরের বার যখন আগরতলায় এসেছেন, কে নিয়ে এসেছিলেন, নিশ্চিত বলা যায় না। রাজ্যেশ্বর মিত্র লিখছেন, '....তাঁকে এনেছিলেন বোধ করি কুমার শচীন দেববর্মণ'। 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনো না ঘরে চোখের টানে' বা 'মনকুসুমের রঙ ভরা

এই পিচকারিটি রাধে' বেরোবার পর বোঝা গেল, সঙ্গীত সমারোহে একজন হিমালয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। শচীনকর্তার কথা নিয়ে আমাদের এই বই। যাঁর শিক্ষণে শচীনকর্তা তৈরি হয়েছেন তাঁর পরিচয় না রাখলে শচীনকর্তার অভিযাত্রা কখনো আমাদের কাছে স্বচ্ছ হবে না। আগরতলা রাজপরিবারে সে আমলের খ্যাতিমান সব শিল্পীরাই প্রায় গান ও বাজনা শুনিয়ে গিয়েছেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে বিস্ময়কর চরিত্র ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। পন্ডিত রবিশঙ্কর যাঁর অনন্য শিষ্য। যাঁর পুত্রসন্তান আলি আকবর খাঁ, যুগন্ধর সরোদিয়া। আগরতলা রাজসভা সম্পর্কে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করতেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। কিংবদন্তী শিল্পী ওস্তাদ বাদল খাঁকেও শচীনকর্তা আগরতলার রাজদরবারে নিয়ে এসেছিলেন। দুর্গা পূজার পর প্রতি বছর রাজবাড়িতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর হত। সেতারি এনায়েৎ খাঁ, বিখ্যাত সানাই বাদক মুন্না খাঁ প্রমুখ বড় বড় গুণী শিল্পীরা ঐ জলসায় আসতেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গুরু ছিলেন ওস্তাদ বাদল খাঁ। কেষ্টবাবুর অনুমতি নিয়ে শচীনকর্তা বাদল খাঁ-এর কাছে গেলেন। বয়স বাদল খাঁ-এর তখন নব্বই। হলে হবে কি। শিরদাঁড়া ঋজু। দূর দূর ছাত্রদের বাড়িতে পায়ে হেঁটে চলে যেতেন। একগুচ্ছ খ্যাতিমান শিল্পী বাদল খাঁর শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে, জামীরুদ্দীন খাঁ, অমিয়নাথ সান্যাল, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী। বাদল খাঁকেই কেউ কেউ বদল খাঁ নামে ডাকেন। মুসলমান সমাজে এমন নাম কেন? 'আমার কাছে নামটা একটু অসাধারণ মনে হয়েছিল, কারণ ওরকম নাম তো সাধারণত মুসলমান সমাজে হয়না' (সুধাসাগর তীরে-সুরেশ চক্রবর্তী)। অমিয়নাথ সান্যাল মশাই এই রহস্যের জট ছাড়াতে চেয়েছিলেন। সুযোগ পেয়ে ওস্তাদজীকে জিজ্ঞেস করতেই জানালেন, 'আমি ঠিক জানিনা, মা ও গুরুজনেরা যা বলে গিয়েছেন, তাই জেনেছি।' কি সেই ঘটনা? বাস্তবতা আর বাস্তবহীনতার স্পর্শে অপরূপ আখ্যান তৈরি হয়েছে। বদল খাঁ তাঁর বাবার খুব বেশি বয়েসের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বাবা ছিলেন ফকির। নমাজ, জপ আর্চা এসব করতেন। বংশরক্ষা হচ্ছিল না বলে চাপে পড়ে বিয়ে করেছিলেন। শর্ত দিয়েছিলেন। স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলে ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। ছেলে হলে বংশরক্ষা হবে। মেয়ে হলে হবে কি? হেসে নাকি বলতেন ফকির বাবা, 'লেড়কা-ই হোগা—আপলোগ তো লেড়কাই মাঙ্গ তে থে'। খবর পেলেন একসময়, স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। ঘরের বাইরে আশ্রয় তৈরি করে দিন কাটাচ্ছিলেন বাবা। খবর এল একসময়। মেয়ে হয়েছে। বাবা দরজা জানলা বন্ধ করে ধ্যানে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর হাসি মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, 'অব জাও, বহ্ বদল হো গিয়া!' এ আবার হয় নাকি! দেখা গেল, মেয়ে নয়, ছেলেই হয়েছে। নাম হয়ে গেল তখন বদল খাঁ। গল্প গল্পই। কেঁচো খুড়ে লাভ কি? বলা ভাল, 'আগে রাম জানে'।

বদল খাঁর কথা জানতে চাইলে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র অমিয়নাথ সান্যালের বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্মৃতির অতলে' পড়লে ভালো হয়। ১৯৩৭ সালে বদল খাঁ প্রয়াত হন। অমিয় নাথ সান্যাল শেষদিন পর্যন্ত তাঁর দীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সেই বিচারে শচীনকর্তা বদল খাঁকে বেশিদিন পাননি। বদল খাঁর শিষ্য হবার আগে অমিয়নাথ যাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন

তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রী। দীর্ঘ ষোল বছর শিক্ষালাভ করেছেন। ১৯১২ থেকে ১৯২৮। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৭ বদল খাঁর কাছে ছিলেন অমিয়নাথ। শচীনকর্তাও একসময়ে কিছুদিন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছে ছিলেন। বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক ও ঠুমরী বিশেষজ্ঞ শ্যামলাল ক্ষেত্রী। বেনারসী ঠুমরী আর ঠুমরীর বোল বানাবার উপায় শিখেছিলেন শচীনকর্তা। শিল্পীমহলে ক্ষেত্রীজীর খুবই সম্ভ্রম ছিল। একজন শিল্পী যতো বড়ো মাপেরই হোন না কেন, তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারতেন না। শ্যামলাল ক্ষেত্রীর একজন প্রিয়পাত্র যেমন ছিলেন অমিয়নাথ, আর একজন ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অর্থনীতির প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। সাহিত্যিক ও অসামান্য সাহিত্য সমালোচক। সঙ্গীতবেত্তা তাঁর ছিল সর্বজনমান্য। ১৮৯৪ সালে জন্ম তাঁর। বারাসতে ছোটবেলা কাটে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়েন। পরে আইন নিয়েও পড়েন। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। পরে নানা বিশিষ্ট পদে যোগদান করেছিলেন। ১৯৬১ সালে কলকাতায় ক্যান্সারে মারা যান। 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' পত্রিকার সাথে তাঁর দীর্ঘকাল নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ধূর্জটি প্রসাদকে প্রথম আলাপেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন শচীনকর্তা। শচীনকর্তার কাছেই শুনি, '....কোন এক গানের আসরে সঙ্গীত-জ্ঞানী শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। ব্যস, ধূর্জটিবাবু সেই যে আমাকে ভালবেসে ফেললেন, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সেই ভালবাসা আমাকে ধন্য করেছে। তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌতে অধ্যাপক। ভারতীয় সঙ্গীতের বিদগ্ধ রসিক ও সমঝদার। তিনি যখনই কলকাতায় আসতেন, আমাদের দেখা হতো, আমাকে সঙ্গীত সাধনায় উৎসাহ দিতেন। ধূর্জটিদা ছিলেন আমার জীবনে সঙ্গীত সাধনার উৎসাহদাতাদের অন্যতম। ১৯৩৭ সালে কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গান শুনেছেন তবুও জানিনা কেন আমার মত এই ক্ষুদ্র শিল্পীর গান শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। আমিও তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম।' এমন কিছু পংক্তি পাঠের পর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে ধূর্জটিপ্রসাদ আর শচীনকর্তার সম্পর্ক কেমন গভীর বুননে সন্নিবদ্ধ ছিল। সঙ্গীতের একজন ছাত্র যতো প্রতিভাবানই হোন, নিবিড় চর্চার পাশাপাশি নানা আসরে প্রাজ্ঞদের পরিবেশনা শুনতে যেতে হয়। শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত বা রাগসঙ্গীতের বেলায় এই কথাটি বেশি করে দরকারি। শচীনকর্তা যখন বদল খাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করেছেন, তখন কলকাতার এমন কোন অভিজাত সঙ্গীত আসর ছিল না যেখানে শচীনকর্তা শ্রোতা হিসেবে যাননি। নইলে শচীনকর্তার মতো বিনয়ী চরিত্র বলতেই পারতেন না, 'ভারতের সেরা সেরা সব সঙ্গীত শিল্পীদেরই কলানৈপুণ্য আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে। .... সে এক বিরাট শিক্ষা'।

মোহিনী চৌধুরী 'রেডিও অ্যাপ্রুভড' গীতিকার ছিলেন না জেনে শচীনকর্তা তার সমাধান করেছিলেন। নিজে শচীনকর্তা রেডিওতে প্রথম কবে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন? কেউ কেউ ১৯২৩ সালের কথা বলেছেন। তখন শচীনকর্তার বয়েস সতেরো বছর। যে সময়ের কথা

বলছি, তখন আকাশবাণী তার এখনকার চেহারা পায়নি। গাসটিন প্লেসে ছিল। নৃপেন মজুমদার ছিলেন প্রধান। প্রাণ ঢেলে কাজ করেছেন। গানের ভুবন সামলেছেন রাইচাঁদ বড়াল। তাঁর পরিচয়ও আমরা এই বইয়ে রেখেছি। গাসটিন প্লেসের প্রথম দিককার নথিপত্র এখন আকাশবাণীর লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়না। বাড়ি বদলের কারণে ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের স্মৃতিভ্রংশ সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে আমাদের। তবে মনে হয় ১৯২৩ সালের তথ্য সঠিক নয়। শচীনকর্তার 'সরগমের নিখাদ' পড়লে কথাটা বেশি করে মনে হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজে বি.এ. পাশ করে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন শচীনকর্তা। ১৯২৫ সালে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলেন। ঐসময়ে কলকাতা নগরের প্রকৃতি তাঁর যে ভালো লাগছে না, কথায় কথায় বলেছেন। সেই ভালো না লাগার কথা আগে আমরা বলেছি। যতদূর মনে হয়, ঐ সময়েই তিনি কলকাতায় প্রথম এলেন। ফলে বেতারের প্রথম গান ১৯২৫ সালের পরেই গীত হয়েছে। পয়লা অক্টোবর ২০০০ সালে এফ. এম. অনুষ্ঠানে শচীন কর্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে পরিচালক নিজেও এমন একটা সম্ভাবনার কথা পেড়েছিলেন। কথাটা সত্যি বলেই মনে হয়। কোন স্পষ্ট উত্তরের অপেক্ষায় আমরা নিশ্চয়ই থাকব। প্রথম গানের কথা নিয়ে শচীনকর্তা নিজে কি বলেছেন আমরা দেখি, 'কলকাতায় Indian State Broadcasting Company তখন নতুন। তারপর All India Radio-র সৃষ্টি। এই ব্রড্‌কাস্‌টিং কোং ডেকে পাঠাল আমাকে গান গাইতে। আমার গান বেতারে প্রচারিত হবে সেকি কম কথা। খুব উত্তেজনা মনে। প্রথম যেদিন গান করলাম সেদিনের সে যে কি আনন্দ তা আজও ভুলিনি। শ্রীনৃপেন মজুমদার, শ্রীরাইচাঁদ বড়াল, এঁরা সব তখন বেতার কোং-এর কর্তা। আমাকে ১৫ মিনিট গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের সুর সংযোজনায় দু'খানা গান গাইলাম। পারিশ্রমিক পেলাম দশ টাকা। এই টাকা আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই দশ টাকা পারিশ্রমিক পাবার তখনকার সেই আনন্দও জীবনে ভোলার নয়। এ আমার কাছে লক্ষ টাকার থেকেও বেশি মনে হয়েছিল। ...নৃপেনবাবু আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন খুব।'

কলকাতাতে এলেও দেশের বাড়ির টানে শচীনকর্তা বছরে কম করেও তিনবার কুমিল্লা ও আগরতলা যেতেন। বলছেন তিনি, 'বাবা মা ভাইবোনদের, প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটিয়ে আসতাম'। তখনও তিনি গ্রামে গিয়ে নতুন নতুন গান গলায় তুলে আনতেন। মাঝে মাঝে আগরতলায় এলেই নবদ্বীপকর্তার বাড়ির বৈঠকখানায় গানের আসর বসত। ফকির বৈষ্ণবদের ডেকে আনতেন শচীনকর্তা। গান শুনতেন। যার গান ভালো লাগতো, সুর তুলে নিতেন, কথা লিখে নিতেন। ওখানেই সায়েব আলি বলে একজন আসতেন। ঘর ছাওয়ার কাজ করতেন এই মানুষটি। লোকগানের ভান্ডারি ছিলেন। তাঁর থেকে গান লিখে নিয়ে শচীনকর্তা পরে রেকর্ডও করেছিলেন।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে কুমিল্লার অবদান অবিস্মরণীয়। উজ্জ্বলতম চরিত্র আলাউদ্দিন খাঁ-র কথা আগেই বলেছি। ছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। সুরকার শৈলেশ

দত্তগুপ্ত। এইচ. এম. ভি-র শিক্ষক খসু মিঞা। গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য। বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর), নৃত্যশিল্পী মণি বর্ধন ও শান্তি বর্ধন, নীহারবিন্দু চৌধুরী, নারায়ণ চৌধুরী। হিমাংশুকুমার (১৯০৮-১৯৪৪) ছোটবেলা থেকেই গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। ঢাকার সারস্বত সমাজ তাঁকে 'সুরসাগর' উপাধি দান করে। রাগ সঙ্গীতে ভিত্তি করে তিনি সঙ্গীত রচনা করতেন। সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য ও বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বহু কথার সুর বসিয়েছেন। শৈলেশ দত্তগুপ্ত কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি. কম. পাশ করে কলকাতা পড়তে যান। ওস্তাদ বাদল খাঁ-র কাছে গানের তালিম নেন। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ-র কাছে কুমিল্লায় কিছুদিন গান শিখেছেন। গায়ক হননি। সুরকার হিসেবে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। নজরুলের বেশ কিছু গানে তিনি সুর করেছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২৪শে মে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থের চরিত্রটি বিস্ময়কর। ১৯০৫ সালে কুমিল্লায় তাঁর জন্ম। কুমিল্লা জেলা স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গান লিখতে শুরু করেন। কুমিল্লার প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সবুজসংঘ'-এর সাথে নিবিড় যোগ ছিল। নজরুলেরও ভালোবাসার জন ছিলেন। হিমাংশু দত্ত তাঁর বন্ধু। বন্ধু সুর দেবেন বলে তিনি গান লিখে দিতেন। আজও বোধহয় তুলনায় গীতিকারেরা একটু বেশি উপেক্ষিত। তাঁদের সময়ে আরও খারাপ চেহারা ছিল। কোন রেকর্ডেই গীতিকারের নাম থাকত না। অথচ পৃথিবীর নানা দেশে কত যুগোত্তীর্ণ গান কথার উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে সময় এইচ. এম. ভি. প্রতি গীতিকারকে মাত্র দশ টাকা করে ফি দিতেন। অসম্মান বোধ করেন সুবোধ। নেননি সেই ফি। আন্দোলন গড়ে তুলেন। পুরোভাগে রইলেন তিনি। জয়লাভ করেন। এইচ. এম. ভি. নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাইনে বাড়াবে জানাল। খেসারত দিতে হল নিজেকে। ঐ কোম্পানি আপনি থেকেই তাঁর গান রেকর্ড বন্ধ করে দিল। ১৯৫০/৫১ সালে ক্ষোভে গান লেখা চিরকালের মত ছেড়ে দেন। কেরানির চাকুরি করেন বাকি জীবন। ১৯৮৪ সালে তার মৃত্যু ঘটে। শচীনকর্তার প্রিয়বন্ধুর নাম অজয় ভট্টাচার্য। ঘরানাই তাঁর আলাদা ছিল। ১৯০৬ সালে জন্ম। ১৯৪৩ সালে ত্রিপুরায় মারা যান। মাত্র ৩৭/৩৮ বছরের জীবন। মসৃণ গানের জগতে ছাপ ফেলেন অজয়। শচীনকর্তা যে পরিমাণ বাংলা গান সুর করে নিজে গেয়েছেন, তার সবচেয়ে বেশির ভাগ কথা অজয় ভট্টাচার্যের ছিল। কবিতা লিখতেন উঁচুমানের। নাটক লিখেছেন। ছবিও পরিচালনা করেছেন। লেখা গানের পরিমাণ প্রায় দু'হাজার। অধিকার, শাপমুক্তি, নিমাই সন্ন্যাস, মহাকবি কালিদাস-এসব ছবির মন মাতানো গান সবই অজয় ভট্টাচার্যের রচনা।

১৯২৫ থেকে ১৯৩০। এই ক'বছর শচীনকর্তা কলকাতায় গানের তালিম নিয়েছেন। শিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র দে। ওস্তাদ বদল খাঁ। আর কলকাতার আশপাশে সকল শাস্ত্রীয় মহ্ফিল শুনে বেড়িয়েছেন। 'ত্রিপুরা প্যালেস'ই থাকতেন। বাবা প্রতিমাসে যা টাকা দিতেন, স্বচ্ছন্দে চলে যেত। ১৯৩০ সালে শচীনকর্তার জীবনে প্রথম বড়ো মাপের দুঃখ আসে। বাবা নবদ্বীপকর্তা মারা যান ঐবছর। 'অত্যন্ত নিঃসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। এই নিদারুণ

বাস্তবকে সহ্য করে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে গেল।'

কখনও তাঁর কলকাতায় একাকী মনে হয়নি। নিয়মিত চিঠি লিখেছেন বাবা। নানা উপদেশ দিয়েছেন। এখন কেমন অগাধ জলে পড়ে গিয়েছেন শচীনকর্তা। নিজের ভেতর লড়াই চলতেই থাকে। কি করবেন তিনি? আগরতলা বা কুমিল্লায় ফিরে যাবেন? যেতেই পারেন। যা সম্পদ রয়েছে খাওয়া পরা এমনকি অল্পবিস্তর বিলাসিতারও অভাব হবেনা। রাজ পরিবারে উঁচু পদের চাকুরি গেলেই হয়ে যেত। শচীনকর্তা বড়ো ভাইদের কাছে করণীয় জানতে চাইলেন। সবাই সংসারের স্বাভাবিক নিয়মমত পরামর্শ দিলেন। ফিরে যাও নিজের জায়গায়। নিশ্চিত জীবন-যাপন কর। না, শচীনকর্তা অনেক ভেবে ঠিক করলেন, গানের ভুবনে হাতে খড়ি হয়েছে যখন, আর বাড়ির দিকে ফিরে যাবেন না।

ত্রিপুরা প্যালেসের খরচ প্রচুর। শচীনকর্তা ঐ বাড়ি ছেড়ে দিলেন। একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিলেন। বাড়ি বলতে একখানা ঘর। এ আবার উল্টোরকমের বিপদ। রাজবাড়ির ছেলে এমন করে থাকলে রাজপরিবারের মান সম্মান যায়। শচীনকর্তা এসব কথায় আমল দিলেন না। লিখলেনও তিনি, '...কোন কিছুর পরোয়া না করে, বাড়ি থেকে কোন অর্থ সাহায্য না নিয়ে কলকাতার সেই একখানা ঘরে সঙ্গীত সাধনা বজায় রাখলাম। খুব রেওয়াজ করতাম তখন, বড় বড় ওস্তাদদের সঙ্গ করতাম, গানবাজনা শুনতাম। শুধু এই সঙ্গীতের পরিবেশেই দিন কাটাতাম। এসময় আমি গান শেখানোর কয়েকটি টিউশনি নিলাম এবং এই উপার্জন থেকেই আমার কলকাতার খরচ বহন করতাম।'

সুরকার শচীনকর্তার দেখা আমরা কখন থেকে পেয়েছিলাম? ঐ সময় থেকেই। চারের দশক সবে শুরু হয়েছে। গান লিখতেন সবথেকে বেশি হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্রকুমার শচীনকর্তার চেয়ে আঠারো বছরের বড় ছিলেন। ১৮৮৮ সালে জন্ম। ১৯৬৩ সালে মারা যান। 'ভারতী' গোষ্ঠির সদস্য ছিলেন। 'নাচঘর' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ছোটদের বই অনেক লিখেছেন। প্রায় আশিটি বই লিখেছেন তিনি। 'রঙমশাল'-এরও সম্পাদক ছিলেন বেশ কিছুকাল। সার্থক গীতিকার। বাংলা গান যা থিয়েটার ও রেকর্ডে প্রচলিত ছিল সেকালে, তার মূল ধরে নাড়া দিয়ে নতুন রুচির হাওয়া বইয়ে এনেছিলেন। শিশির কুমার ভাদুড়ির বিখ্যাত 'সীতা' নাটকের নৃত্য নির্দেশক ছিলেন। ছবিও আঁকতেন ভালো। বাংলা ১৩৩৮ সালে 'সুরলেখা' নামে একটি গানের বই প্রকাশ করেন হেমেন্দ্রকুমার। ভূমিকায় বলেছিলেন, 'গান লিখেছি প্রায় চারশোর কাছাকাছি। এও দেখছি আমার অনেক গান বাজারে চলছে এবং লোকে তার কোন কোনটির রচয়িতা বলে অন্যের নাম করে এবং কোন কোনটির রচয়িতা যে কে, তা কেউ জানে না। আবার আমার অনেক গানের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরে ছন্দভাঙ্গ তো করে বটেই, সেই সঙ্গে রূপ বদলে উল্টো অর্থকেও প্রকাশ করে। এইসব নানা কারণে এই গানের বইখানা প্রকাশ করলুম। যদি আমার এই প্রথম গানের বইখানিকে পোকায় না কাটে তবে ক্রমে ক্রমে অন্য গানগুলিও প্রকাশ করব।' না, আর কোন বই বেরোয়নি। আজ তাঁর সব গানের কথা জানা যায়না। গোড়ায় রেকর্ড কোম্পানিগুলি

সহায়তা করেনি। গীতিকারের নাম রেকর্ডে থাকলে এমন অন্ধের মত হাতড়াতে হতনা। উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে যাবারও কারণ থাকত না। কমল দাশগুপ্ত আর নজরুলের গান নিয়ে এমন একটা উতোর চাপান আজও চলেছে। হেমেন্দ্রকুমারের কথা আরও একটু বেশি বলতে চাই। কেন? ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শচীনকর্তার গানের যে প্রথম রেকর্ড বেরোয় তার একটি গান হেমেন্দ্রকুমারের রচনা। এছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র দে তখন খ্যাতির উচ্চতম শীর্ষে রয়েছেন। তাঁর বহুজনপ্রিয় গান 'অন্ধকারের অন্তরেতে', 'চোখের জলের মন ভিজিয়ে', 'ধরার মেয়ে ধরার মেয়ে', 'নয়ন যেদিন রইবে বেঁচে', 'বঁধু চরণ ধরে বারণ করি', 'মনকুসুমের রঙ ভরা এই পিচকারিটি রাধে'—সবই হেমেন্দ্রকুমারের রচনা।

শচীনকর্তার প্রথম রেকর্ড বেরোবার কাহিনী খুব মসৃণ নয়। এইচ. এম. ভি. তখন সবচেয়ে পরিচিত। শচীনকর্তা রিহার্সাল দিতে গেলে জানানো হল, এমন গান চলবে না। কেন? গলা তাঁর অনুনাসিক। শ্রোতারা নেবে না। এইচ. এম. ভি-র যেমন জয়ের ইতিহাস রয়েছে প্রচুর, অল্প হলেও আত্মকলঙ্কের ইতিহাসও রয়েছে। শুধু শচীনকর্তা কেন, আমরা ভাবি, কুন্দনলাল সায়গলের মত কিংবদন্তী শিল্পীকেও একসময় এইচ. এম. ভি. রেকর্ড করতে দেয়নি। ত্রিপুরার ঠাকুর নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ তখন কলকাতায় ছিলেন। শচীনের সমসাময়িক। অনেক দিনেরই পরিচয় দু'জনার। দু'জন দু'জনকে নাম ধরে ডাকেন। এইচ. এম. ভি. রাজি না হওয়ায় নরেন ঠাকুর চন্ডীবাবুর কাছে গেলেন। চন্ডীচরণ সাহা। জার্মানি থেকে নতুন মেশিন এনেছেন। কোম্পানি খুলেছেন নতুন। হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস। চন্ডীবাবুর সাথে নরেন ঠাকুরের একটু আধটু পরিচয় ছিল। কথা বলতেই শচীনকর্তার গান রেকর্ড করতে রাজি হলেন। সেই গান ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম রেকর্ড হল। একদিকে 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে'। গীতিকার হেমেন্দ্রকুমার রায়। উল্টোপিঠে 'এ পথে আজ এসো প্রিয়'। গীতিকার শৈলেন রায়। পাবনা জেলার মানুষ ছিলেন শৈলেন রায়। (১৯১০-১৯৬৩)। কুচবিহারে থাকতেন। ১৯২৭ সালে তাঁর লেখা গান রেকর্ড হয়েছিল। প্রথম রচনাটিই ঐতিহাসিক। কেন? লোকগানের রাজা আব্বাসউদ্দীন সেই গান দিয়ে নিজের পরিচয় প্রথম রেখেছিলেন, 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়, তোমার মাঝে আপনহারা'। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ রাগপ্রধান বাংলাগানের কথাকার তিনিই। গানের সংখ্যা আঠারোশোর কাছাকাছি।

একজন বিশুদ্ধ লোকগীতি গায়ক যেমন লোকগানের বাইরে পা ফেলেন না, শচীন তার ব্যতিক্রম ছিলেন। লোকগান সংগ্রহ করেছেন যেমন দিনের পর দিন, রাগসঙ্গীতেও বছরের পর বছর সেরা শিল্পীদের অধীনে তালিম নিয়েছেন। ফলে লোকগান আর ধ্রুপদী গানের এক সার্থক যুগলবন্দী ঘটেছিল শচীনকর্তার বেলায়। সেই পরিচয় নিয়েই শ্রোতাদের কাছে পৌঁছুতে চান তিনি। নইলে একপিঠে হেমেন্দ্র কুমারের লেখা লোকগান আর উল্টোপিঠে শৈলেন রায়ের লেখা রাগপ্রধান গান থাকত না। দুটো গানেরই সুরকার শচীনকর্তা। নিজের সঙ্গীতবেত্তার দ্বিমুখী চরিত্র একই রেকর্ডে যোগ করতে চেয়েছেন। প্রথম রেকর্ড।

আনন্দ আর ধরে না। রেকর্ড নিয়ে শচীনকর্তা কুমিল্লা গেলেন প্রথম। তারপর আগরতলা এলেন। মহারাজা বীরবিক্রম রাজত্ব করছেন। একটু দূরে 'ঠাকুর বর্ডিং'-এ রয়েছেন অসামান্য কণ্ঠ ও বুদ্ধির অধিকারী জ্যোতিষচন্দ্র দেববর্মণ। রাজার বাড়ির আরও কর্তাদের সব ভীড় জমেছে। জ্যোতিষকর্তা সেই রেকর্ড বগলে চেপে ছুট লাগালেন। শচীনকর্তা চেঁচিয়েই চলেছেন, 'আরে এইডা একটা মাত্র কপি, ভাইঙ্গা গেলে আর পাইমু না'। পাঠকের ভালো লাগতে পারে ভেবে আমরা এখানে শচীনকর্তার প্রথম রেকর্ডের লোক গানটি পুরো তুলে ধরছি।

ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে
মাঠের বাটে যাই
আকাশ তথা উষার শিখায়
সিঁদুর মাখায় ভাই।
শ্যামলা মেয়ে চুল এলিয়ে
কানে ফুলের দুল দুলিয়ে
তালপুকুরে শালুক তোলে
তাকিয়ে দেখি তাই।
রূপ যেন তার চোখ ধাঁধাঁনো
রোদ মাখানো চুড়ি
আওলি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
ধরে বটের ঝুড়ি।
যায় চলে সে ভিন গেরামে
আমার চোখে বাদল নামে
মুখ ফুটে হায় বলতে নারি
তার কাছে কি চাই।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সালের একটা ফিরিস্তি শচীন কর্তা নিজেই দিয়েছেন। কষ্টকল্পনা পরিহার করে আমরা এখানে শচীনকর্তার কথাগুলোই তুলে ধরছি।

'১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ/ছ বছরে লোকসঙ্গীত ও ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের সংমিশ্রণে নিজস্ব ধরণে সুর রচনা করলাম—যা অন্য কারো সাথে মিললনা। এইভাবে আমি আমার নিজস্ব গায়কী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এতে আমাকে অনেকেই অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন এবং এঁদের মধ্যে আমি একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। তিনি হলেন সঙ্গীতরসিক ও পন্ডিত নাটোরের মহারাজা। এছাড়া শ্রী অমিয়নাথ সান্যাল, শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ, শ্রী খগেন মিত্র, শ্রী হেমেন রায় এঁরা তো আছেনই। এঁদের উৎসাহে ও আশীর্বাদে আমি আমার এক নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং জনসাধারণের নিকট থেকে সমর্থনও পেয়েছিলাম আমার এই প্রচেষ্টায়, তাঁদের নিকট জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করে।' ১৯৩৫ সালের এক জলসায় গাইতে গিয়ে

শচীনকর্তার সাথে নাটোরের মহারাজার পরিচয় হয়। ঐ মহারাজের বাড়িতে শচীনকর্তা অনেকবার গিয়েছেন। অনেক বড় বড় শিল্পী আসতেন। মজলিসের আসর বসত। রাগ-সঙ্গীতের নানা দিক নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হত।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সাথে নাটকের দলের যোগাযোগ ছিল। রঙ্গমঞ্চেরও সম্পর্ক ছিল। শচীনকর্তারও যোগাযোগ হল। নাট্যমন্দিরের দুই প্রযোজনা 'সতীতীর্থ' ও 'জননী'তে সঙ্গীত রচনা করেন শচীন কর্তা। শ্রোতারা এই আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শিল্পী নীহারবালা শচীনকর্তার গান দুটো গেয়েছেন। ১৮৯৮ সালে নীহারবালার জন্ম। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। সুদক্ষা অভিনেত্রী ছিলেন। স্টার রঙ্গালয়ে তখন সবাই দু'জনের অভিনয় দেখতে চাইতেন। হয় তারাসুন্দরী অভিনয় করবেন, নয়তো নীহারবালা করবেন অভিনয়। 'কর্ণার্জুন' ও 'চিরকুমার সভা' নাটকে অভিনয় করে নীহারবালার খ্যাতি ছড়িয়ে. গিয়েছিল। নৃত্যনির্দেশিকা হিসেবেও পরিচিতি ছিল তাঁর। অভিনয় ছেড়ে একসময় অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যান। ওখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

পরের নাটক 'সতীতীর্থ'। ন'খানা গান ছিল। ন'খানা গানেই শচীনকর্তা সুর দিয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের জগত শচীনকর্তার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকল। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গাঙ্গুলী, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিশির ভাদুড়ি—সবাই কর্তার গুণগ্রাহী ছিলেন। কর্তাকে ভালোবাসতেন খুব। নিজেদের ভেতর পরিচয় হল। জানাজানি হল। ফল যা হল, শচীনকর্তা সেই সময় শুধু গানের আসরে গিয়েই খুশি থাকতে পারতেন না। যত রঙ্গমঞ্চের প্রযোজনা হত, প্রতিটি দেখতেন। ছবি বিশ্বাস ও জহর গাঙ্গুলী একসময় শচীনকর্তার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। জহর গাঙ্গুলীর বাড়তি গুণ ছিল। শচীনকর্তার মতই। খেলা পাগল। শচীনকর্তা ইস্টবেঙ্গল। জহর গাঙ্গুলী মোহনবাগান। মোহনবাগান হেরে গেলে শচীনকর্তা তাঁর সাথে কথা বলতেন না। আবার কচিৎ কদাচিৎ (!) ইস্টবেঙ্গল হারলে শচীনকর্তার সাথে মন কষাকষিও বেড়ে যেত। ঝগড়া কখনও গভীরে দাগ কাটত না। নইলে শচীনকর্তা আক্ষেপ করে বলতেন নাকি—'আবার যদি সেসব দিনগুলি ফিরে পেতাম'।

এই সময়কার একজন মানুষের কথা বলতেই হয়। তিনি মধু বসু (১৯০০ - ১৯৬৯)। বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু তাঁর পিতা ছিলেন। মধু বসু ছিল ছদ্মনাম। আসল নাম সুকুমার। শান্তিনিকেতনে পড়েন। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়েন। বি.এস.সি. করে চলচ্চিত্র পৃথিবীতে যোগ দেন। 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স' তৈরি করেছিলেন। শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের দিয়ে এই প্রথম কলকাতায় একাধিক নাটক প্রযোজনা করেন। 'দালিয়া', 'আলিবাবা', 'ঘরে বাইরে'—এইসব। বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আলফ্রেড হিচককের কাছে কাজ শিখেছেন কিছুদিন। 'আলিবাবা' ছবি করে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেন। ত্রিশটি ছবির পরিচালক

ছিলেন মধু বসু। 'আমার জীবনী'-তে নিজের কথা অকপটে লিখে গিয়েছেন। মধু বসুর স্ত্রী বিখ্যাত নর্তকী সাধনা বসু। 'আলিবাবা' ছবিতে যিনি মর্জিনা সেজেছিলেন। সাধনাদেবীকে গান শেখাতেন শচীনকর্তা। এছাড়া মধু বসুর 'সেলিমা' চলচ্চিত্রে ভিখারি চরিত্রে শচীনকর্তা অভিনয় করেছিলেন। মধু বসু তাঁর বইয়ে এই আখ্যান সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

'চৌরঙ্গী প্লেসে বর্তমান রকসী সিনেমার পাশেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। নতুন করে আবার সংসার পাতলাম সেখানে, ১৯৩৩ সালের গোড়ায়। ....সাধনা ঐ সঙ্গে আবার নতুন করে গান শিখতেও লাগল। সে সময়ে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই গান বাজনার আসর বসত ; এই আসরে প্রায় নিয়মিতভাবে যারা আসত তাদের মধ্যে মিহিরবাবু (তিমিরবরণের দাদা মিহিরকুমার ভট্টাচার্য), শচীন (দেববর্মণ) ও হিমুর (হিমাংশু দত্ত সুরসাগর) নাম বেশি করে মনে পড়ছে। আমি শচীনকে সাধনার গান শেখার আগ্রহের কথা বলতে সে অত্যন্ত খুশী মনে তাকে শেখাতে চাইল এবং বলা বাহুল্য, এর জন্য কোনরকম পারিশ্রমিক নিতে সে রাজি হল না। .....সেলিমার একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, আজকের দিনের বিখ্যাত এক সঙ্গীত পরিচালক। এই ভূমিকাটি ছিল এক ভিখারীর। এই সঙ্গীত পরিচালক তখন গাইয়ে হিসেবে সবে নাম করেছে এবং সাধনাকে গান শেখাত। তাকে একদিন কথায় কথায় বললাম একটি ছোট্ট ভিখারীর ভূমিকা আছে—কাজ বিশেষ কিছুই নেই—শুধু বসে বসে একটি গান করতে হবে আর কিছুই নয় শুনে প্রথমে সে চমকে উঠল, বলল—বলেন কি মি. বোস? আমি ফিল্মে নামব কি? জানেন তো আমার পরিবারকে। আমি যদি ফিল্মে নামি, তাহলে তাঁরা নির্ঘাত আমায় একঘরে করবেন। আমি গান করি, রেকর্ড করি, তাইতেই কত লোক কত কথা বলে। আমি বললাম, তোমায় এমন করে মেকআপ করে দেব, দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে, যে কেউ চিনতেই পারবেনা। তারপর অনেক করে বোঝাতে শেষটায় রাজি হল। গানটি সে খুবই ভালো গেয়েছিল। এই ব্যক্তিটি হলো আজকের বিখ্যাত পরিচালক কুমার শচীনদেব বর্মণ (আমার জীবন—মধু বসু)।

জীবনের বেশ ক'বছর সৃষ্টিশীল সময় নজরুল কুমিল্লাতে কাটিয়েছিলেন। শচীনকর্তাও তখন কুমিল্লায়। দু'জনে সখ্যতা জন্মে। বলছেন শচীনকর্তা, '...আমি তাঁর স্নেহধন্য শিল্পী। তাঁর রচনা, গান, কবিতা, আবৃত্তি আমি বহু শুনেছি। তিনিও আমার গান ও সুর খুবই পছন্দ করতেন। আমার বাড়িতে আসতেন। মুগ্ধ করতেন কবিতা ও গানে। আমার নিজস্ব ধরণে গানে সুর দিয়ে তাঁকে যখনই শুনিয়েছি, উৎসাহিত করেছেন আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করতে আমাকে আদেশও দিয়েছিলেন। আমার জন্যই বিশেষভাবে সেগুলি রচনা করেছিলেন তিনি। আমি তা রেকর্ডও করেছিলাম এবং সব কটি গানই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কাজীদার রচনার গুণে। অনেকেই আমার গাওয়া 'চোখ গেল, চোখ গেল কেন ডাকিস রে—চোখ গেল পাখিরে' গানটি শুনেছেন। এটি কাজীদার রচিত। প্রায় চার

পাঁচ মিনিটের মধ্যে লিখেছিলেন আমার জন্য, সুর দিয়ে। আমি কাজীদাকে বলেছিলাম— "ঝুমুরের ধরনে একটু 'টিকলিশ' সুরে গান দিন আমাকে"। কাজীদা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন এই গানটি উপহার। কাজীদার সঙ্গ লাভ আমার জীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

১৯৩২ সালের পর হিন্দুস্থান কোম্পানিতে শচীনকর্তার একটার পর একটা গান রেকর্ড হয়েছে। গীতিকার ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীরেন্দ্র সান্যাল, শৈলেন রায়। এইচ. এম. ভি. একসময়ে বুঝতে পেরেছে, শচীনকর্তাকে শুরুর দিনে ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাঁকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানানো হল। মনে রাগ পুষে রাখতেন না শচীনকর্তা। রাজি হলেন গাইতে, কবে থেকে শুরু এইচ. এম. ভি.-র গান? শচীনকর্তা নিজেই বলছেন, 'খুব সম্ভব ১৯৪৭ সাল'। পাঠক খেয়াল রাখবেন, শচীনকর্তা তখন কলকাতায় নেই। তল্পি-তল্পা গুটিয়েই ১৯৪৪ সালে মুম্বাইতে চলে গিয়েছেন। মাঝে মাঝেই আসতেন কলকাতায়, একথায় কোন ভুল নেই।

বন্ধু অজয় ভট্টাচার্যের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁকে ডেকে পাঠান। নিয়ে আসেন নিজের কাছে। এরপর অজয় ভট্টাচার্যের বহুগান সুর দিয়ে শচীনকর্তা গেয়েছেন। রইলনা পৃথিবীতে বেশিদিন। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়েসে সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। এরপর শচীনকর্তার বেশির ভাগ গানই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার লিখে দিয়েছেন। ১৩৮৫ বাংলার 'দেশ' বিনোদন সংখ্যায় কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'শচীনকণ্ঠ'। সেখানে কল্যাণবন্ধুবাবু শচীনকর্তার গীতিকারদের একটা তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন। তালিকাটি এরকম।

শচীনকর্তা একা ১২৭টি বাংলা গান গেয়েছেন। স্ত্রী মীরাদেবীর সাথে গেয়েছেন আরও চারটি গান। মোট গান দাঁড়াল তাহলে ১৩১। কোন গীতিকার ক'টি গান লিখেছিলেন? সবচেয়ে বেশি অজয় ভট্টাচার্য। ৪১টি। পরপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ঃ	১৮	জসীমউদ্দীন	ঃ	২
মীরা দেববর্মণ	ঃ	১৬	জসীমউদ্দীন/দুখাই খন্দকর	ঃ	১
মোহিনী চৌধুরী	ঃ	১২	কানাইলাল শীল	ঃ	১
রবি গুহমজুমদার	ঃ	১০	কমল ঘোষ	ঃ	১
শৈলেন রায়	ঃ	৭	বিনয় মুখোপাধ্যায়	ঃ	১
কাজী নজরুল	ঃ	৪	প্রণব রায়	ঃ	১
হেমেন্দ্র কুমার রায়	ঃ	৩	রবীন মজুমদার	ঃ	১
যতীন্দ্রমোহন বাগচী	ঃ	২	শঙ্কর গুপ্ত	ঃ	১
প্রেমেন্দ্র মিত্র	ঃ	২	শিশির সেন	ঃ	১
অজ্ঞাত	ঃ	৬			

যে সব গানের কথায় নিজে সুর দেননি শচীনকর্তা কিন্তু গেয়েছেন, তার একটি তালিকাও

আমরা এখানে দিলাম।

সুরসাগর হিমাংশু দত্ত	ঃ	৮	সুবল দাশগুপ্ত	ঃ	১
কাজী নজরুল	ঃ	৪	রাইচাঁদ বড়াল	ঃ	১
শৈলেশ দত্তগুপ্ত	ঃ	২	মুকুন্দলাল দে	ঃ	১

মাত্র ১৭টি গানে শচীনকর্তা শুধুই শিল্পী। বাকি ১১৪টি গানে সুরকার ও শিল্পী। কতগুলো জেদ ছিল শচীনকর্তার। প্রতিভারই জেদ বলব। অন্যের সুরে খুব বেশি গান গাইতে চাইতেন না। অপারগ হলে রাজি হতেন। হিমাংশু দত্তকে ছাড়পত্রই দেয়া ছিল প্রায়। কাজী নজরুল। শৈলেশ দত্তগুপ্ত বা রাইচাঁদ বড়ালে তাঁর আপত্তি ছিল না। এমন জেদ হিন্দি ছবির বেলাতেও আমরা দেখেছি। যে ক'টা গান গেয়েছেন, কোন অভিনেতাকে 'লিপ' করতে দেননি। নেপথ্যে সেই সব গান বেজেছে।

১৯৪৪ সালে মুম্বাইয়ে পাড়ি দেবার আগে আরও কিছু তথ্য, আরও কিছু ভাবনার কথা বলতে হবে। ১৯৩৪ সাল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হবে। শচীনকর্তা আমন্ত্রিত হলেন। এই প্রথম কলকাতার বাইরে যাবেন শচীনকর্তা। গেলেন। নিজের মত করে ঠুমরি গাইলেন। বাংলা গান গাইলেন। সকল শ্রোতারা আনন্দে ফেটে পড়েছিল। ঐ ১৯৩৪ সালের সম্মেলন করতে এসেই শচীনকর্তার সাথে আবদুল করিম খাঁর প্রথম দেখা হয়। ওস্তাদজী মাথায় হাত রেখে শচীনকর্তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এরপর শচীনকর্তা বহু বহুবার করিম খাঁর গান কলকাতায় শুনেছেন। এলাহাবাদের এই সম্মেলনে কারা না ছিলেন! স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, ড. কৈলাসনাথ কার্জু, বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত—আরও সব। ১৯৩৪-এ যাত্রা শুরু। এরপর তিনবার পরপর ডাক পেয়েছিলেন।

এবার আমরা শচীনকর্তার জীবনের একটা উল্লেখ্য অধ্যায় আলোচনা করব। শচীনকর্তা ভীষ্মদেবকেও সঙ্গীতগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন। স্মরণ অধ্যায়ে ভীষ্মদেবের একটা ছোট পরিচয় রেখেছি আমরা। কিছু বাড়তি কথা যোগ করাই যায়।

১৯৩২/৩৩ সালের কথা। সঙ্গীত পিপাসু সুরেশ চক্রবর্তী লিখছেন, ৫৪/১ বলরাম দে স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়েছেন, ভীষ্মদেবের সাথে দেখা করবেন। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাকে জিজ্ঞেস করবেন ভাবছেন, এমন সময় পরিচ্ছন্ন বেশ পরিহিত এক যুবক বেড়িয়ে এলেন। ভীষ্মদেবের কথা বলতেই তিনি বললেন, 'আমিই ভীষ্মদেব, কি চাই?'

'আপনার কাছে গানবাজনা শিখতে চাই'। ভীষ্মদেব রাজি। শেখাবেন। মন প্রাণ উজার করেই শেখাবেন। বদল খাঁর যোগ্য ছাত্র ভীষ্মদেব। নিজে আরও পল্লবিত হয়েছেন। ছাত্রদের সব দিয়ে যেতে চান। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ মাঝে মাঝে শচীনকর্তা আর ভীষ্মদেবের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। সম্পর্ক একসময়ে নাকি তিক্ততায় পৌঁছেছিল। সত্যি? কিছু ঘটনার দিকে চোখ রেখে দেখে নিই আমরা। রাজ্যেশ্বর মিত্র বলছেন, কৃষ্ণচন্দ্র দে'র শিক্ষা শচীনকর্তা

তাঁর কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন। ভীষ্মদেবের কাছে তালিম নিলেও কোন কিছু চোখে পড়ার মত গ্রহণ করেননি। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের বাড়িতে ভীষ্মদেব শচীনকর্তা নিয়ে যা যা বলেছেন, শ্রোতা রাজ্যেশ্বর মিত্রের ভালো লাগেনি। উপসংহারে বলছেন রাজ্যেশ্বর—'...শচীনকর্তা চিরকাল তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করলেও তিনি মনে মনে শিষ্যের প্রতি সমান উপেক্ষার ভাবই পোষণ করে এসেছিলেন। এই ব্যাপারটা প্রকাশ করে বলতে হল এই কারণে যে অনেকেই ভীষ্মদেবের সঙ্গে শচীনকর্তার গুরুশিষ্যের সম্পর্কটিকে খুব 'হাইলাইট'-এ এনে থাকেন আজকাল।' শচীনকর্তার মৃত্যুর পর 'গানের কাগজ' শচীন দেববর্মণ স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। সেই স্মরণ-বাণী আমরা এই বইয়েও তুলে এনেছি। ভীষ্মদেব শচীনকর্তার চেয়ে তিন বছর ছোট ছিলেন। ভীষ্মদেবের প্রয়াণের দু'বছর আগে ১৯৭৫ সালে শচীনকর্তা প্রয়াত হয়েছেন। অল্প কয়েকটি কথা বলেছেন ভীষ্মদেব। কোন পংক্তিতেই যদিও শচীনকর্তার প্রতি বিদ্বেষ অনুভূত হয়নি। এমনও যদি হত যে এই স্মরণ শচীনকর্তা সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকেছে তাহলেও শ্রীমিত্রের কথায় পক্ষপাতিত্ব করা যেত। অথচ ভীষ্মদেব স্পষ্ট অক্ষরে কিছুকথা বলেছেন। দু' একটা কথা বলব এখানে। আগ্রহী পাঠক স্মরণ অধ্যায়ে পুরো লেখাটা দেখে নেবেন। বলছেন ভীষ্মদেব, 'আমাকে সে চিরদিনই গুরু হিসেবে সম্মান করেছে। আমি অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে আর গুরুকে মনে রাখে না। কিন্তু শচীনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখেছি। জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত সে আমাকে গুরু বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে।'

যদি কিছু ভুল বোঝাবুঝি দু'জনের থেকেও থাকে, সঙ্গীত নিয়ে ছিল না। মীরা ধরকে গান শেখাতেন শচীনকর্তা। এই মীরা অল্প কিছুদিন ভীষ্মদেবের কাছেও গান শিখেছিলেন। যাঁকে গানের তালিম দিতেন কর্তা, তাঁকে সংসারে ঘরণী করে আনায় ভীষ্মদেব খুশি হতে পারেননি। এই কথা অন্তরঙ্গ দু'একজনের কাছে ভীষ্মদেব বলে গিয়েছেন বলে সুরেশ চক্রবর্তী দাবি করেছেন। যাইহোক, আমরা ভীষ্মদেবের পন্ডিচেরী অধ্যায়টুকুকেও অভিমানের চোখেই দেখি। সৃজনে শূন্যতা সৃষ্টি করে কি আনন্দ পান শিল্পী—আমরা বুঝিনা।

যাই হোক, আনন্দ ভাবনায় মনোযোগ দিই। ১৯৩৫ সাল। কলকাতায় মিউজিক কনফারেন্স হয়েছিল। ওখানে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র সাথে শচীনকর্তার পরিচয় হয়। এই প্রথম মুখোমুখি পরিচয়। ফৈয়াজ খাঁর গান পছন্দ করতেন শচীনকর্তা। ভয়ও পেতেন না তেমন। শিক্ষক শিখিয়ে দেন। ভয় থাকবে কেন? বিনা সংকোচে ফৈয়াজ খাঁর সামনেই গান গেয়ে উঠতেন। উল্লিখিত কনফারেন্সে ফৈয়াজ খাঁর সামনেই ঠুংরি পেশ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে শচীনকর্তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। রেডিওতে নিয়মিত গান করেন। টাকা পান। ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখান। টাকা পান। কলেজের ছেলেমেয়েরা শচীনকর্তাকে কলেজে আজকাল নিয়ে যেতে চাইছে। ফলে অর্থের অনটন বেশ খানিকটা কেটে যায়।

একটা ছোট্ট ঘরে কাজ চলে না আর। বাড়ি পাল্টে একটা দু'রুমের বাড়ি ভাড়া নিলেন। একটা ঘরে থাকবেন। একটা ঘরে গান শেখাবার স্কুল হল। নামও ঠিক হয়ে গেল একটা। 'সুরমন্দির'। ঠিকানা-১এ বসন্ত রায় রোড। খুব অল্প মাইনে নিয়ে গান শেখাতেন। গরীব হলে তা-ও নিতেন না। এই 'সুরমন্দির'-এ সরস্বতী পূজোর দিনে অনেকেই আসতেন। সারারাত গান বাজনা চলত। হোলির সময়েও 'সুরমন্দির' লোকসমাগমে ভরে উঠেছে।

মাঝে ১৯৩৯ সালে (১৩৪৫ বাংলা) 'সুরের লিখন' নামে শচীনকর্তার একটি বই বেরোয়। স্বরলিপিসহ পঁচিশটি গান ছিল। ডি.এম. লাইব্রেরি এই বই বের করেছিল। বাবাকে উৎসর্গ করেছিলেন শচীনকর্তা।

সাধারণ বাঙালি যুবক যে বয়েসে ঘর সংসার করেন শচীনকর্তা সেই বয়েস পেরোবেন। তেত্রিশ হয়ে গিয়েছে। সংসার পাততে চাইলে আর দেরি করা চলে না। মীরাদেবীর সাথে ঘর বাঁধলেন শচীনকর্তা। দিনটা ছিল ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮। মীরাদেবী ঢাকার মেয়ে। তাঁর দাদু হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ ছিলেন। মীরাদেবীর মা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। মজা করে কথা বলতে পারতেন মীরা দেববর্মণ। কথায় কথায় বলেছিলেন, সারা ক্লাসে মাত্র দু'টি মেয়ে পড়ে। সব ছেলেরা, মায় অধ্যাপকেরা পর্যন্ত যে কেমন চেয়ে থাকত, কে জানে! বাংলাদেশের সংসার জীবনে অনেক মেয়েরাই আর তাদের প্রতিভার ছবি ধরে রাখতে পারেননা। মুছে যায়। মীরা দেবী পেরেছিলেন। যদিও মনে হয় আমাদের, যখন মীরাদেবীর কথায় সুর দিয়ে শচীনকর্তা গাইছেন তখন যেন সময়টা সূর্যাস্তের। ১৯৭৫ সালে শচীনকর্তাকে হারিয়েছি। কতদিন আগে আর মীরাদেবীর কথা নিয়েছি আমরা? শচীনকর্তা সব মিলিয়ে মীরাদেবীর ১৬টি গান গেয়েছেন। মীরাদেবী শচীনকর্তার সঙ্গে চারটি গানে একসাথে কণ্ঠ দিয়েছেন। এর বেশি কিছু আর আমরা পাইনি।

শচীনকর্তার জবানবন্দীতেই আমরা তাঁর বিবাহপর্ব আর মীরাদেবীর কথা শুনব। '১৯৩৮ সালে ১০ই ফেব্রুযারী স্বর্গত জজ রায়বাহাদুর শ্রীকমলানাথ দাশগুপ্তের দৌহিত্রি শ্রীমতি মীরার সঙ্গে কলকাতায় আমার বিবাহ হয়। আমার বিবাহ উপলক্ষে আগরতলা থেকে আমার মা, বড় ভাই, বউদিরা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কলকাতায় এসেছিলেন। মীরা ১৯৩৭ সাল থেকে আমার কাছে গান শিখত। আমার ট্রেনিং-এ কয়েকটি গান রেকর্ডও করেছিল। ১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে মীরাও গান করার সুযোগ পেয়েছিল, আমারই মত। সে সময় মীরা ভীষ্মদেবের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী অমিতা সেনের (পন্ডিত ক্ষিতি মোহন সেনের কন্যা) কাছে নাচ শিখত। পরে মীরা শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের কাছে ঠুমরী ও কীর্তন এবং শ্রীঅনাদি দস্তিদারের কাছে রবীন্দ্র-সংগীতও শিখেছিল। আমার সঙ্গে ১৯৪৪ সালে বম্বে আসার পর, মীরা বম্বেতে কিরাণা ঘরাণার ওস্তাদ ফৈয়াজ মহম্মদ খানের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখে। মীরা রেডিওতে গান

গাওয়া ছাড়াও, আমার তত্ত্বাবধানে এইচ-এম.ভি-তে কয়েকটি হিন্দী গান ও রেকর্ড করে।

মীরা নিজে শুধু যে গান লেখে তা নয়, সুর সংযোজনাতেও পারদর্শিনী। ওর সাহায্যে ও সাহচর্যে আমি আমার অনেক সফল ও জনপ্রিয় গানের সুর দিয়েছি। আমার সুর রচনায় অনেকগুলি জনপ্রিয় গানের মুখড়ার সুর মীরার। বহু সময় এ-রকমও হয়েছে আমি সুর রচনা করেছি, তার উত্তর ভিত্তি করে মীরা বাংলাতে গান লিখেছে সুরের মিটার ও ছন্দ অনুযায়ী, হিন্দী গান রচয়িতাকে তা বোঝাবার জন্য। পরে সেই সুরে হিন্দী গান রচনা হয়েছে। মীরার লেখা ছয়খানা গান আমি এই এম.ভি-তে রেকর্ড করেছি, নিজের গলায়। কেবল সহধর্মিনী রূপে নয়, আমার সঙ্গীত জীবনের সাফল্যের পিছনে মীরার সহযোগিতা, সাহায্য, প্রেরণা, উৎসাহ ও আত্মত্যাগ প্রচ্ছন্নভাবে সর্বদাই বর্তমান রয়েছে ও থাকবে। আমি মীরার মত সহধর্মিনী লাভ করে নিজেকে সর্বদাই অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করেছি।'

যাঁরা শচীনকর্তার সমসাময়িক ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেন, তিনি নাকি খুবই কৃপণ ছিলেন। হিসেবে মেলেনা এমন কার্পণ্য ছিল। পুরো একটা ফুটবল টিমকে হয়তো ম্যানেজার শুদ্ধু দিন কয় রেখে নিজের পয়সায় খাওয়াতেন। যে জিনিসে অল্প পয়সা দরকার হয়, দিতে চাইতেন না। দু'একটা তেমন মজার কাহিনী বলছি আমরা।

এই ঘটনা শচীনকর্তার জীবনেই মুম্বাইয়ে ঘটেছে। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত কবি ও গীতিকার শৈলেন্দ্র। তিনি এসে শচীনকর্তাকে বলছেন, 'শচীনদা, বিহারে প্রচন্ড ফ্লাড হয়ে গেছে। কবিতা লিখেছি সেজন্য। নাম—পানি। কবিতার সারাংশ হল, 'জল তুমি প্রাণদাতা আবার ক্রুদ্ধ হলে তুমি প্রাণ হরণও করো। একাধারে তুমি সৃষ্টি ও ধ্বংস দুইই করছো।' একটু থেমে শৈলেন্দ্র জানতে চাইলেন, কেমন লাগছে।

উত্তর দিলেন শচীনকর্তা, 'বিউটিফুল'।

এবার আসল অস্ত্রে শচীনদা কুপোকাৎ। শৈলেন্দ্র শচীনকর্তার কাছে বন্যা ত্রাণে কিছু টাকা চাইলেন! মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে গেল। শচীনদা একটা জবাব দিলেন, 'বুঝলে শৈলেন্দ্র, গানের 'মুখড়াটা' ভালো ছিল। অন্তরাটা খারাপ'। শৈলেন্দ্র আর কি করেন। শচীনকর্তাকে চেনেন; হেসে বললেন। "টাকার কথা বলতেই 'অন্তরা' খারাপ হয়ে গেল, শচীনদা?"

মাছ ধরতে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তেন শচীনকর্তা। পাওয়াই লেকে যেতেন, আগে বলেছি। ওখানে ড্রামের উপর ভাসমান ঘরের মতো মাছ ধরার কেবিন-ভেলা ভাড়া পাওয়া যায়। সুরকার নৌশাদ, কৌতুকাভিনেতা জনি ওয়াকার, শচীনকর্তা আর পরিচালক গুরু দত্তের ভেলা আলাদা থাকত। একদিনের কথা। দুটো প্রাণীতে মিলে মাছ ধরা হচ্ছে। সূর্য মধ্য আকাশ গড়িয়ে পশ্চিমে চলে গেল। হলনা কিছুই। প্রাণী দুটোর একজন শচীনকর্তা। একজন শচীন ভৌমিক। রেগে মেগে শচীনদা বললেন, 'কাল এখানে এসোনা তুমি, মাছ

ধরতে পারছিনা। তুমি অপয়া'।

বেশ, কি আর করা যায়। পরদিন মীরা দেবীকে নিয়ে বেরোলেন। একই চেহারা। মাছ আর ধরা দেয়না।

শচীনকর্তার কাছে দু'জনই অপয়া সেজে গেলেন। অপয়া থেকে পয়া সাজতেও সময় লাগেনা তাঁর কাছে। মুম্বাইয়ের মাঠে ফুটবল হবে। ইস্টবেঙ্গল জেতা চাই। নইলে মোহনবাগান। নইলে কলকাতার কোন দল। এর বাইরে কেউ জিতলে দিন কয় রেকর্ডিং বন্ধ করে দিতেন শচীনকর্তা। একবার খেলা হল। শচীন ভৌমিককে সাথে নিয়ে মাঠে গেলেন। ইস্টবেঙ্গল হেরে গেছে। মোহনবাগান হেরে গেছে। রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং। মহামেডান জিতল দু'গোলে। তাঁর আনন্দ আর থামেনা। সব খেলোয়াড়দের ডেকে পাঠালেন। চা জলখাবার খাওয়ালেন। একসাথে ছবি তুললেন। শচীনকর্তা বললেন, 'শচীন তুমি খুব লাকি। ভেরি লাকি।'

এই হলেন শচীনকর্তা। শিশুসুলভ বলেই হয়তো মাঝে মাঝে মনে হয়।

এই শচীনকর্তা কখনও কখনও কেমন শচীনকর্তা হতে পারেন একটা ঘটনার কথা শুনুন। বলেছেন আমায় বিমানদা। শ্রদ্ধেয় বিমান মুখোপাধ্যায়। বিমান মুখোপাধ্যায়ের বাবা সুবল মুখোপাধ্যায় গানের জগতেরই লোক ছিলেন। শচীনকর্তার খুব বন্ধু। একদিন ফোন এল শচীনকর্তার — 'সুবল, রেডি থাকবি। গড়িয়াহাটায় মার্কেটিং করতে যামু'। বাবা প্রস্তুত। শচীনকর্তা তাঁর গাড়ি নিয়ে এলেন। বাবা আর শচীনকর্তা একসাথেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। গড়িয়াহাটে গাড়ি থেকে নেমে শচীনকর্তা ফুটপাত ধরে হাঁটছেন আর এপাশ ওপাশ তাকাচ্ছেন। বলছেনও কি যেন। সুবল মুখোপাধ্যায় জানতে চাইলেন, শচীনকর্তা কি বলছেন। কথার মানে এরকম। একটা অল্প বয়সের ছেলে বিস্কুট বেচতে ফুটপাতে বসেছিল। একদিন যাবার পথে শচীনকর্তা দেখেছেন। আজ সময় আছে। তাই সেই বিস্কুট কিনতে এসেছেন। গড়িয়াহাটায় মার্কেটিং মানে এইটুকুই। বলছেন শচীনকর্তা, 'ছ্যামড়াডা গেল কই? ছ্যামড়াডা গেল কই?'

বিস্মিত সুবল মুখোপাধ্যায়। শচীনকর্তাকে বললেন, 'আচ্ছা শচীনদা, গাড়ির তেল পুড়িয়ে আপনি এখানে ফুটপাতের বিস্কুট কিনতে এসেছেন। কলকাতার হাইয়েস্ট পেড আর্টিস্ট আপনি।' একটা দশাসই ধমক দিয়ে শচীনকর্তা সুবলবাবুকে থামিয়ে দিলেন। অবশেষে ছেলেটাকে দেখা গেল। মুখে আনন্দ আর ধরেনা। ছুটে গেলেন শচীনকর্তা। ভাঙ্গা আর আস্ত বিস্কুটে মেশানো। দাম একটু তাই কম হবে। শচীনকর্তা গিয়েই আবার দরদাম শুরু করলেন। আরও খানিকটা কমালেন। তারপর ছেলেটার কাছে এক সের বিস্কুট চাইলেন। একটা কথাও বললেন এই সাথে। 'জানত ছ্যামড়া। আমি কিন্তু আবার বৈষ্ণবের পোলা। আমারে গরু দিয় না। গরু খাইতাম না।'

মানে কি? আগে নানা পশুপাখির আকারে বিস্কুট বিক্রি হত। গরুর মত দেখতে বিস্কুট শচীনকর্তা নেবেন না। পাঠক হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারছেন কি?

আরও একদিনের ঘটনা। শচীনকর্তা রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছেন। মন্দিরে ঢোকার আগে জুতো জোড়া খুলে একটা কাছে রাখলেন। অন্য পাটিটা বেশ দূরে অনেক জুতোর পিছনে রাখলেন। এ আবার কেমন ধারা কর্তার! সাথে একজন ছিলেন। কর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন কান্ড করলেন কেন? গম্ভীর শচীনকর্তা। নিশ্চিত হয়ে উত্তর দিলেন। 'ওরে বাবা! আজকাল যেই হারে জুতোচোর বাড়ছে সাবধানতা না নিলে চলেনা'।

সঙ্গীটি অবাক। বলেই ফেললেন, 'তো একটু চোখ খুলে দেখলেই তো চোর দু'পাটি জুতো নিয়ে যেতে পারবে।'

বিরক্ত শচীনকর্তা জবাব দিলেন। 'তা নিক। অতোটা কষ্ট করতে যদি রাজি থাকে। নিয়ে যাক। দরকার না থাকলে কে আর অতোটা কষ্ট করবে?'

মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিলেন কেন শচীনকর্তা? 'বাংলা চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করার আকাঙক্ষা ছিল খুব। কিন্তু সুযোগই পাচ্ছিলাম না। আমি নিউ থিয়েটার্স-এ ঘোরাফেরা করেছিলাম অনেক, আশাও পেয়েছিলাম...শেষ পর্যন্ত সেই আশা সফল হল না।' শচীনকর্তাকে তখন বাংলা গানের জগতে সবাই চেনেন, সবাই জানেন। তবু অনেককালের বেড়ে উঠা প্রতিষ্ঠাগুলোর তাঁকে নিতে কেমন যেন অনীহা কাজ করেছে। কে না চেনেন তাঁকে? নীতিন বসু চেনেন। দেবকী বসু চেনেন। প্রমথেশ বরুয়া আর শচীনকর্তাতো একসাথে টেনিস খেলেন। শুধু তাই নয়। সবাই ওঁরা শচীনকর্তার সুরের প্রশংসা করেন। তবু বাংলা ছবির জগতে আশ্রয় পাচ্ছেন না। বুকের ভেতর অভিমান তৈরি হয়। সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, নিউ থিয়েটার্স-এর কর্ণধার বি.এন. সরকার সবাইতো কর্তার গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ কি একবার একটা সুযোগ দিয়ে দেখতে পারে না? মুখ খুলে বলবেন না কাউকে। বলবেন কেন? মর্যাদা থাকবে তো এমন শিল্পীদেরই। যেচে বলতে যাবেন কেন? অভিমানের কথা তাঁর আত্মজীবনীতেও ফুটে উঠেছে, 'কোন চলচ্চিত্র সংস্থা আমাকে সঙ্গীত পরিচালনা করার সুযোগ না দেওয়াতে মনে খুবই দুঃখ হয়েছিল। অথচ বাংলা ছবিতে আমি যে সুর একেবারেই দিইনি, তা নয়—দুটো ছবির কথা মনে পড়ছে—'রাজগী' ও 'রাজকুমারের নির্বাসন'।

১৯৩৯ সালের ২৭শে জুন শচীনকর্তা ও মীরাদেবীর একমাত্র সন্তান রাহুলের জন্ম হয়। মীরা দেবী তখনও গান ছেড়ে দেননি। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের কাছে বিয়ের পর গান শিখতে আসতেন। সৈয়দ আমির আলি এভিনিউতে। ছোট্ট রাহুলকে নিয়েও মাঝে মাঝে গান শিখতে এসেছেন। ১৯৩৯ ও ১৯৪০ এই দুই বছর শচীনকর্তা ভারতীয় গণনাট্য সংঘে নিজেকে যুক্ত করেন। লোকসংগীত শাখার সভাপতি ছিলেন শচীনকর্তা। ঐ সময়টার কথা

পাঠক একবার ভাবুন। আমাদের সকল দুর্লভ শিল্পীরা গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। বলরাজ সাহানী, পন্ডিত রবিশঙ্কর, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, বিনয় রায়, দেবব্রত বিশ্বাস—কত নাম বলব!

১৯৪২ সাল। মুম্বাইয়ের রঞ্জিত স্টুডিও থেকে সংগীত পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হলেন শচীনকর্তা। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্টুডিওর মালিক স্বয়ং চন্ডুলাল শা। না, বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। বারণ করে দিলেন। এখনও আশায় দিন গুনছেন। বাংলাদেশে কেউ তাঁকে ডেকে নিয়ে যাবেন। চন্ডুলাল শা জেনে দুঃখ পেয়েছিলেন। মুম্বাইতে পাকাপাকি চলে যাবার পর শচীনকর্তাকে তিনি একবার বলেছেন।

১৯৪৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতায় বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য সভাপতি ছিলেন। গাইতে এসেছিলেন কারা? গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও শচীনকর্তা।

১৯৪৪ সালে মুম্বাই থেকে আবার আহ্বান এল। ফিল্মিস্তানের দুই কর্তা চন্ডুলাল শা আর শশধর মুখার্জী। শচীনকর্তাকে আবার যেতে বলছেন। এবার আর অপেক্ষা করেননি। নিছক অভিমানে কোন সৃষ্টি হয়না। কাজ করেই এগিয়ে যেতে হয়।

মুম্বাইয়ের উপাখ্যান

ফিল্মিস্তানে যখন ডাক পেয়েছেন শচীন কর্তা, তখন সেখানে বন্ধু সুশীল মজুমদারও কাজ করছিলেন। কুমিল্লারই বন্ধু সুশীল মজুমদার (১৯০৬-১৯৮৮)। প্রথম জীবনে স্বাধীনতার লড়াই করেছেন। যুগান্তর দলের সভ্য ছিলেন। মা হেমপ্রভা দেবী ও বাবা বসন্তকুমার দু'জনেই রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। পরে সুশীল মজুমদার চলচ্চিত্রে শিল্পে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। চল্লিশটিরও বেশি ছবি তৈরি করেন। এমন পরিবারের একটা সর্বজনমান্যতা কুমিল্লা শহরে ছিলই। কুমিল্লা থেকে সুশীল আর শচীন বন্ধু ছিলেন।

ফলে আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেননি শচীন কর্তা। রাহুলের বয়েস পাঁচ বছর। রাহুল আর স্ত্রী মীরাদেবীকে সাথে নিয়ে 'ফিল্মিস্তান' এর সঙ্গীত পরিচালক হয়ে ১৯৪৪ সালে মুম্বাইতে চলে এলেন।

প্রথম কলকাতায় এসে শচীন কর্তার একরকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অবশ্য বয়েসটা আরও কম ছিল। ছাত্র ছিলেন। আজ মুম্বাইতে এসে কি মনে হচ্ছে তাঁর? ছোট্ট দু'চার কথায় বলেছেন, '...বম্বে বেশ মাজাঘষা শহর। সেখানে সব সময় কর্মব্যস্ততা এবং কলকাতার চাইতে অনেক বেশি কসমোপলিটান।' গিয়েই একদল বন্ধুদের দেখা পেলেন। পাহাড়ী সান্যাল, অনিল বিশ্বাস, রবীন চ্যাটার্জী, বিশিষ্ট বাঁশিবাদক পান্নালাল ঘোষ। ভালো লাগল ওঁদের দেখে। একা মনে হল না। যদিও ছোট্ট রাহুলকে নিয়ে কর্তা আর মীরাদেবীর অনেকটা

সময়ই কেটে যায়। দিন কয় পর একটা কেমন নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হলেন। এ মানুষজনের নিঃসঙ্গতা নয়। প্রকৃতিতে কোথাও এক শূন্যতা। গঙ্গা নেই এই মাটির বুকের ভেতর। মাটি মায়ের মনের মত নরম নয়। একথা ঠিক। মুম্বাই শুরুতে শচীন কর্তাকে 'মনমরা'ই তৈরি করে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে সামলে উঠেছেন। সৃষ্টির বৃক্ষরাজি পর পর নির্মাণ করেছেন।

মুম্বাইয়ের কোন ছবিতে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন শচীন কর্তা? 'শিকারী'। হিন্দি ছবি। নায়ক সবার দাদামণি 'অশোককুমার।' প্রদীপ সেসময় খুব বিখ্যাত গীতিক্যর। ওঁর কথাকে সুরে বেঁধেছেন শচীন কর্তা। সেই গান গেয়েছেন অশোককুমার। বাংলা ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার পাকাপাকি আসন পাননি বলে শচীনকর্তার একটা দুঃখ ছিল। মুম্বাইয়ে চলে যাবার আগে কলকাতায় ক'খানা ছবিতে সুর দিয়েছিলেন শচীন কর্তা? দশটি ছবি। ১৯৩৭ সালে 'রাজগী'। ১৯৪০ সালে 'রাজকুমারের নির্বাসন'। ১৯৪২ সালে 'জীবনসঙ্গিনী'। ১৯৪৩ সালে 'ছদ্মবেশী' আর 'মাটির ঘর'-এ সুর দিলেন। ১৯৪৪ সালে পাঁচটি ছবিতে সুর দিয়েছেন। 'অভয়ের বিয়ে', 'মাটির ঘর', 'অশোক', 'স্বামী-স্ত্রী' ও 'জজ সাহেবের নাতনি'। কেন জানিনা বাংলা আধুনিক গানের এক একটা রেকর্ড বেরোলেই শচীন কর্তার জনপ্রিয়তা যে হারে বেড়ে যেত, বাংলা ছায়াছবিতে সুর দিয়ে সেই জিনিস তিনি অর্জন করতে পারেননি। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরিই বলেছেন, '...বাংলা 'ছদ্মবেশী', 'জজ সাহেবের নাতনি' এমন দু-একটি ছবি ছাড়া কোন ছবির গানই তেমন হিট করেনি।'

যাই হোক, 'শিকারী' ছবির সুর, আর গান কাগজপত্রে ভালো লেখা হল। সাহস পেলেন শচীন কর্তা। পর পর ফিল্মিস্তানের আরও পাঁচটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় হাত দেন। 'এইট ডেজ', 'দো ভাই', 'শবনম', 'পেয়িংগেস্ট' আর 'মুনীমজী'। 'শবনম' এর সব ক'টি গান হিট হয়ে গেল। বাহবার আবহে শচীন কর্তা কি ভাবছেন? খুশি হতে পারছেন না তিনি। স্টুডিওর বোদ্ধা লোকেরা ভালো বলে বাহবা দিলে চলবে কি? বাইরের সাধারণ মানুষেরা গুণগুণ করে না গাইলে বোঝাই গেল, সেই গান মানুষ নেয়নি। নিজের জীবনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে তাঁর। রাসবিহারী মোড়ের বিখ্যাত 'মেলোডি' দোকানে বসে গল্পটা তিনি পরিচিতদের বলেছিলেন। মাঝিদের নৌকোয় করে শচীন কর্তা গান তুলতে যাচ্ছেন। কথায় কথায় এক মাঝি বললেন, 'একজন রাজার পোলা খুব ভাল গান গাইছে। গলাটা কি মিষ্টি, যেন হালায় কোকিল বাইট্যা খাইছে।' মুগ্ধ শচীন কর্তা জানতে চাইলেন, তুমি কি দেখেছ তারে?

উত্তর এল, 'না কর্তা দেখি নাই, তবে দেখা পাইলে পায়ের ধূলা মাথায় মাখতাম।'

মুম্বাইয়ে যদি চায়ের দোকানের ছেলে, রিক্সার ড্রাইভার গাড়ির ক্লিনার এরা সব গুণগুণ করে গান না করে, তবে কর্তার সুর দেবার কোন মানেই রইল না। তখন যামিনী দেওয়ানের 'রতন' ছবিটা বাজারে বেরোয়। বেরোতেই হই চই। সব ক'টা গান লোকের মুখে মুখে

ঘুরছে। শচীন কর্তা নিজেই বলছেন, 'ফিল্মিস্তানে আমার ঘরে বসে আমি একদিন হারমোনিয়াম নিয়ে সুর রচনায় ব্যস্ত। হঠাৎ কানে এল আমার বেয়ারা ছোকরাটির গলায় গান, চা তৈরি করতে করতে সে গাইছিল,—'যব তুমহি চলে পরদেশ, লাগাকর ঠেস্ ও পীতম পেয়ার।' আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলেন শচীন কর্তা। যা চাইছেন, তা হয় দেখা গেল। দিন কয় পর একটা নতুন ছবির সুর করছিলেন। ছবির নাম 'দো-ভাই।' একটা গানের কথায় সুর লাগিয়েছেন। মেরা সুন্দর স্বপ্না বীত গায়া। কি আশ্চর্য! বলছেন শচীন কর্তা নিজেই, 'পাশের ঘর থেকে আমার সেই রুম বয়কে এই গানখানা মশগুল হয়ে গাইতে শুনলাম। ...তখনই বুঝতে পারলাম, ফিল্মের হিট গান মানে হল অতি সোজা সুর, যত কম অলঙ্কার থাকে ততই ভাল। কারণ তাহলে সাধারণ লোকেও সে গানের সুর নিজের গলায় তুলতে পারে।'

১৯৪৬ সাল শচীন কর্তার জীবনে আবার এক দুঃখের বার্তা বয়ে আনে। তাঁর দাদা প্রফুল্ল কর্তা মারা গিয়েছেন। প্রফুল্ল কর্তার শেষ কাজে আগরতলায় এসেছেন শচীন কর্তা। সঙ্গে স্ত্রী মীরা দেববর্মণ ও সাতবছরের রাহুল রয়েছে। কাজ শেষ হতেই আবার মুম্বাই ফিরে যান। আগরতলার জায়গাজমি যা ছিল সব বেচে দেন। সেই বছরই হয়তো ভেবেছিলেন, আর এখানে ফিরবেন না। নবদ্বীপচন্দ্রের উপর যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তারপর তাঁর কোন ছেলে যদি এমন এক ভাবনায় রাজ্য ত্যাগের বাসনা গ্রহণ করেন, খারাপ লাগলেও আমাদের, খুব নিন্দেমন্দ করা যায় না। যাই হোক, শচীন কর্তার শেষ প্রবেশ ও প্রস্থান ঐ ১৯৪৬ সালেই। যদিও পরে আমরা ত্রিপুরার রবি নাগ কিংবা রবীন সেনগুপ্তের লেখালেখিতে দেখেছি, অমনতরো উষ্মা শচীন কর্তা প্রকাশ করেননি। নিজের পাপড়ি ছড়িয়ে দিতে পারতেন না বলেই বড়ো জায়গায় চলে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯—মুম্বাই জীবনের প্রথম দশকটাকে বুঝতে চেয়েছিলেন শচীন কর্তা। 'শবনম' ছবি সফলতা পেল। শচীন কর্তা খুশিই হয়েছেন। তবু যেমন করে গানের সুর মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, আজও পেরে উঠেননি।

১৯৪৮ সালে শচীন কর্তা ও দেব আনন্দের পরিচয় হল। কর্তার গানে বহুদিন থেকেই মাতোয়ারা দেব আনন্দ। তিন ভাই ওঁরা। বড় চেতন আনন্দ, মেজো দেব আনন্দ আর ছোট বিজয় আনন্দ। সন্ধ্যাবেলা ওঁদের বাড়িতে আড্ডা হত। শচীন কর্তা নিয়মিত যেতেন। গুরু দত্ত আসতেন, শচীন কর্তা নিজেই বলেছেন, 'দেব ও গুরুর মত আমার গানের অনুরাগী ভক্ত বম্বেতে আর কেউ ছিল না। নিজেরা আলোচনা করে চাইছিলাম একটা নতুন রকমের ছবি তৈরির প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব।' দেব, গুরু, চেতন, বিজয়—সবাই ওঁরা শচীন কর্তাকে একটুও আপোস না করতে বলতেন। দেব আনন্দের খুব টানটান মন ছিল। যা করবে ভেবেছে, না করে ছাড়বে না। দেব আনন্দ নতুন প্রতিষ্ঠান করল—'নবকেতন।' নতুন পতাকা। প্রথম ছবির নাম ঠিক হল 'অফসর।' পরিচালনা করবেন চেতন আনন্দ। দেব আনন্দ নায়ক। সুরাইয়া নায়িকা হবেন। সুর দেবেন শচীন কর্তা। ১৯৪৯ সালে ছবিটি তৈরি

হল। ভাল চলল না। তবে একটা গান খুব জনপ্রিয় হল। খুবই। 'মনমেরা হুয়া মাতোয়ালা।' সুরাইয়া ছবিতে গেয়েছিলেন।

'নবকেতন' থামবে কেন? ১৯৫০ সালেই দ্বিতীয় ছবি তৈরি হয়। নাম 'বাজী।' পরিচালক গুরু দত্ত। দেব আনন্দ আর গীতবলী প্রধান চরিত্র। গুরু দত্ত আর শচীন কর্তা প্রতিটি পদক্ষেপে কথা বলে সুর দিয়েছেন এই ছবিতে। শাহির লুধিয়ানজী গান লিখেছেন। আজ শাহিরজীর অনেক নামডাক। তখন নতুন এই কাজে যোগ দিয়েছে। শচীন কর্তা প্রতিভা চিনতে ভুল করতেন না কখনও। পরে আমরা দেখাব সেসব। কেমন সুর তৈরি করতে চাইছিলেন শচীন কর্তা মুম্বাইয়ের সিনেমায়? তাঁর নিজের কথাতেই আমরা শুনে নিই। 'প্রথম থেকেই গতানুগতিক ছন্দের আমি বিপক্ষে। যেসব গীতিকাব্যের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয় তাদেরকে আমি আমার সুরের ছন্দ অনুযায়ী লিখিয়ে নিতে চেষ্টা করি। আমি শাহিরকে দিয়েও এইভাবে গান লেখানোর চেষ্টা করলাম। দু'জনকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, বহু সময় ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের এই যুক্ত প্রচেষ্টা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হল। এই ধরনের বহু পরীক্ষা আমি করেছি আমার সঙ্গীত রচনায়। কোন কোন সময় তা খুবই সফল হয়েছে। কোন সময় আমি অকৃতকার্যও হয়েছি।'

'নবকেতন' এর পরের ছবি 'কালাপানি।' এই গানে শচীন কর্তা দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিচ্ছেন, দুঃসাহসই তো বলতে হবে। একটা গানের মুখড়াতে গজলের ছন্দ দিলেন, অন্তরায় গীতের ছন্দ যোগ করলেন। হাম বে খুশি মে তুমকো পুকারে চলে জায়ে। এই গান গাইলেন মহম্মদ রফি। শচীন কর্তার কথাতেই, 'রফি আমার পরিকল্পনায় সুন্দর আমেজ দিয়ে গেয়েছিল গানটি, ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম।'

'বাজী' ছবিতে সুরের যে পরীক্ষা করেছিলেন শচীন কর্তা, 'নবকেতন' এর কেউই আপত্তি করেননি। এই ছবিতে এককভাবে গান গাইলেন গীতা রায় (১৯৩১-১৯৭২)। পরিচালক গুরু দত্তের সাথে বিয়ের পর গীতা দত্ত নামে পরিচিতা হন। নায়িকার সব ক'টি গানই গেয়েছিলেন। 'বাজী' ছবির একটা গানে গজলের সুর আর পশ্চিমী সুর মিশিয়ে অপূর্ব ব্যঞ্জনা তৈরি করেছিলেন শচীন কর্তা। সেই গান আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। তদবীরসে বিগড়ী হুই তগদীর বনা লে। এককভাবে গীতা রায় প্রথম 'দো ভাই' ছবিতে গান গেয়েছিলেন, খুবই জনপ্রিয় গান, 'মেরে সুন্দর স্বপনা বীত গয়া।' এর আগে তিনি কোরাস গেয়েছেন।

'ফিল্মিস্তান' এর পরে 'ফিল্ম আর্টস।' ১৯৫১ সালে 'জাল' ছবি তৈরি হয়। পরিচালক গুরু দত্ত। নায়ক দেব আনন্দ। ভাবছিলেন শচীন কর্তা, একেবারে নতুন রকমের একটা গান কোন শিল্পীকে দিয়ে এই ছবিতে গাওয়াবেন। কে ভালো হয়? মুকেশ। ভাবলেন শচীন কর্তা। রফি বা তালাত হলেও খারাপ গাইবে না। ঐ সময়ে কলকাতা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 'ফিল্মিস্তান' এ চাকুরি নিয়ে এলেন। শচীন কর্তা ঠিক করলেন, 'জাল' ছবির এই গান তিনি

হেমন্তকে গাইতে বলবেন। সংগীত জগতের কিংবদন্তী চরিত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মুম্বাইয়ে যিনি হেমন্ত কুমার।

১৯২০ সালে জয়নগরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়া শেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। পড়া শেষ করেননি। সঙ্গীত-সরস্বতীর টানে বাইরে চলে এসেছেন। ১৯৩৫ সালে রেডিওতে প্রথম গান করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে শৈলেশ দত্তগুপ্তের কথায় প্রথম রেকর্ড বেরোয়। বাংলা ছবি 'নিমাই সন্ন্যাস' এ প্রথম প্লে-ব্যাক করেন। কতো ভালো কাজ যে করেছেন তিনি, তার কোন হিসেব নেই। কতো যুগান্তকারী গান যে নানা সুরকারের সুরে তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, তারও কোন হিসেব চট করে করা যায় না। বিশ্বাস করবেন তো পাঠক? একশোর কাছাকাছি হিন্দি ছবিতে ও চারশোর কাছাকাছি বাংলা ছবিতে সুর দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে গান শুনিয়েছেন। শিল্পীর সজ্জা প্রকরণের দিকে তাকালে আমাদের শ্রদ্ধা একটুও মলিন হয় না। মুম্বাইতে এসেছেন হেমন্ত। তখনও প্লে-ব্যাক করেননি। শচীন কর্তা ঝুঁকি নিলেন। মুকেশ, রফি, তালাত বাদ দিয়ে হেমন্তকে গাইতে বললেন। বলে দিলেন বারবার, হিন্দি উচ্চারণ স্পষ্ট করতে হবে। হেমন্ত পরিশ্রম করেছিলেন। গান যখন রেকর্ড হয়ে বেরোল, লোকেরা খুশি, নতুন এক শিল্পীকে পেয়েছে। কি সেই গান? সবাইতো জানেন। 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনী।' বলছেন শচীনকর্তাই, 'গীতা ও হেমন্তকে যখন মুম্বাইয়ের বাজারে শিল্পী করতে পেরেছি, নিজের ক্ষমতার উপর একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে গেল। শুধু সুর দিলেইতো হয় না। কার গলায় মানাবে সবচেয়ে ভালো-পরিচালককে নজর রাখতে হয়।'

১৯৫৩ সাল। 'নবকেতন' থেকে 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' বেরোল। পরিচালক চেতন আনন্দ। নায়ক দেব আনন্দ। গানের সুরে হালকা হালকা মুড়কী ছিল বলে শচীন কর্তা তালাতের কথা ভাবছিলেন। গাইলেন সব দরদ দিয়ে তালাত মহামুদ, 'যায়ে তো যায়ে কাহা।' নজরের বাইরে আর কতকাল শচীনকর্তা থাকবেন? সবসেরা সঙ্গীত পরিচালনার জন্য 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার পেলেন। মুম্বাইতে যখন 'দাদামণি' অশোককুমার সবার আপনজন হয়ে উঠেছেন তখন তাঁর ছোটভাই 'কিশোর' একেবারেই ছোট্ট। মনে আছে শচীনকর্তার। কিশোরকুমারের আসল নাম ছিল আভাষকুমার। পঙ্কজ মল্লিক আর সায়গলের গান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে (খারাপ অর্থে বলছি না) গেয়ে বেড়াতেন। কারও কাছেই গান শেখেননি। অথচ কেমন গলা ছিল তাঁর? শচীন কর্তাই বলছেন, 'ভগবানদত্ত'। তিনি তাঁর গান শুনেই মুগ্ধ হয়ে যান। দাদামণিকে বলেন, ম্যাট্রিকটাতো দিয়েছে। অনেক হয়েছে। গানটা করতে বলুন এবার। ১৯৪৬ সালে 'এইট ডেজ' ছবি করছিলেন শচীন কর্তা, কিশোরকুমারকে সাথে সাথে নিয়ে একটি গান গাইয়ে দিলেন। তবে কিশোরকুমারের দুর্বলতাও জানতেন শচীন কর্তা। গজল গাইতে দেননি কখনও। 'কারণ গজল ও গলায় মানাবে না।' বোধহয় আরও একবার আমাদের

প্রিয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথাও ওই সাথে বলে নেয়া যায়। হেমন্ত মুম্বাইতে আগেই এসেছিলেন। গানও করেছেন। শচীন কর্তার গান গেয়ে সাড়া ফেলেছিলেন প্রথম। কালীঘাটের বাড়িতে যখন শচীন কর্তা থাকতেন তখন হেমন্ত ও আর দুই বন্ধু সকালবেলা কর্তার রেওয়াজ শুনতে যেতেন। আড়ালে বসে শুনতেন। পরে শচীন কর্তাকে এই গল্প করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। খুব হেসেছিলেন শচীন কর্তা। সেই গলায় বলে উঠেছিলেন, 'তোরা কী যে করস'।

একবার একটা বড় জলসা হচ্ছে কলকাতায়। পঙ্কজকুমার মল্লিক, শচীন কর্তা, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হেমন্ত গাইবেন। হেমন্ত 'তুলসীদাস' ছবির একটা ভজন গাইছিলেন। ব্যায়ঠে বরাসন রাম জানকী। শচীন কর্তা অভিভূত। পরিচিত জন কাছে পেয়ে হাত চেপে বলে উঠেছিলেন, 'দেখ্ দেখ্, গায়ে কাঁটা দেয়—আওয়াজ খান শুনছস্?' সুরকার শচীন কর্তা এমন কথা বলতে কখনও সংকোচ বোধ করতেন না যে একটা গান ভালো বা খারাপ সুর হলেও আসলটা গায়কের উপরই নির্ভর করে। ১৯৪৪ সালে মুম্বাই এসেই সুরদানের কাজে মেতেছিলেন। প্রচুর ছবিতে সুর দিয়েছেন। একটা তালিকাও আমরা দিয়েছি। সকল সফল শিল্পীরাই তাঁর সুরে গান করেছেন। তালিকা তৈরি করে লাভ নেই। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কথা আলাদা করে একটু বলি। আমরা এই শিল্পীর সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওগো মোর গীতিময়' বই থেকে শচীন কর্তার বিষয়ে কিছু অভিমত রেখেছি। খুব ছোটবেলায় মুম্বাইতে গান গাইবার জন্যে শচীন কর্তাই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে মুম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন শচীন কর্তা 'এভারগ্রিন' হোটেলের একটা ঘর নিয়ে থাকতেন। একদিনের কথা আজও শিল্পী ভোলেননি। বলতে গিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। শীত পড়েছে। বসে গাইতে হবে গান। মেঝেতেও ঠাণ্ডা রয়েছে। একজন অতো বড় মাপের মানুষ, নিজের গায়ের শালটা খুলে ভাজ করে বসতে দিলেন, ছোট্ট মেয়েটার ঠাণ্ডা যাতে না লাগে। এই ছিলেন শচীন কর্তা। টাকা জীবনে রোজগার কিছু কম করেননি। কলকাতায় একটা ঘর থেকে, দু'ঘরের ভাড়াবাড়ি। তারপর পালিত স্ট্রিট, বিখ্যাত 'মেলডি'র পাশে বসন্ত রায় রোডের বাড়ি, সাউথ অ্যাণ্ড পার্কের কাছাকাছিও বাড়ি করেছেন। মুম্বাইতে লিংকিন রোডে 'জেট' বাড়ি বললেই লোকেরা শচীন কর্তার বাড়ি বলে চেনে। বড় বড় মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন অফুরাণ। ছোটবেলায় গাঁয়ের সুরেলা মানুষদের কথা ভুলতে পারেননি কখনও।

বাংলাদেশে ছিলেন না শচীন কর্তা। অনেকেরই আক্ষেপ ছিল। পাঠক ভাবুন। সঙ্গীতের কাণ্ডারি ও ভাণ্ডারি উভয় মহলই এই মতটা মানেন যে সঙ্গীতের আসল ধরন দুই। লোক-সঙ্গীত আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। এই দুইয়েরই নানা ধরন ধারণ হয়ে নানা রঙের গান জন্ম নেয়। শচীন কর্তা এই দুই গানেই পারদর্শী ছিলেন। বাংলা ছবির গান অসফল ছিল তাঁর। দুঃখও ছিল। আধুনিক গান অকল্পনীয় ছিল। মুগ্ধতার শীর্ষে পৌঁছে যায় আজও হাজার হাজার মানুষ। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে তিন দশক ধরে রাজত্ব করেছেন শচীন কর্তা।

চলচ্চিত্রে সুর দিতে এসে নানা ধরনের গানের তালিমে নিজেকে তৈরি করেছেন। দিলীপকুমার রায়ের কাছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখতে যেতেন। লোকগানের ভেতর থেকে উঠে আসা শিল্পী আব্বাসউদ্দীনের কাছে গিয়েছেন নতুন বিষয় শিখতে। কি বিষয়? আব্বাসউদ্দীন তাঁর নিজের লেখা 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'য় বলছেন—'গানের কলির মাঝে কিভাবে স্বাভাবিকভাবেই গলার ভাঙা আওয়াজ আসে তা শিখতে আমার কাছে প্রায়ই ঘুরঘুর করতো ত্রিপুরার এক শ্যামলা রঙ্ কিশোর—শচীন দেববর্মণ'।

কখনও তাঁর চাহিদায় ভাটা পড়েনি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে অসামান্য এক ঘটনা বলেছেন তিনি, পাঠক বুঝতে পারবেন। নিজের সুরলোকে দু'জন মানুষকে শচীন কর্তা যোগ্য মর্যাদা দিয়ে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। একজন দক্ষিণামোহন ঠাকুর। তার-সানাইয়ের বিখ্যাত শিল্পী, শচীন কর্তার গানে তিনি থাকতেনই। সঙ্গীত পরিচালকও ছিলেন। আর একজন ব্রজতরঙ্গের স্রষ্টা। আমবা এই বই যে মানুষটিকে উৎসর্গ করেছি। ব্রজেন বিশ্বাস। প্রবীণ শচীনকর্তার ভক্ত মানুষের কাছে শুনেছি। রবীন্দ্র সরোবরের অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসেছেন শচীন কর্তা। লোকে লোকারণ্য। পাশে ব্রজেনবাবু। তাঁকে দেখিয়ে শচীন কর্তা বললেন, 'শুনেন শুনেন, ওঁরেও শুনবেন, হাতে কাজ আছে, হাতে কাজ আছে।' চোখে দেখতে পাননা। একাধিক বাদ্যযন্ত্র নখদর্পণে তাঁর। ব্রজতরঙ্গতো আছেই। তার উপর তবলা। বাংলা ঢোল, খঞ্জরী, দোতারা। তার ছোট্ট অথচ মহিমাময় জীবন আলেখ্য আমরা এখানে দিতে চাইছি।

১৯২৪ সালে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার আখরন্দ গ্রামে এক সংগীত পরিবারে ব্রজেন বিশ্বাসের জন্ম। বাবা কুলক চন্দ্র বিশ্বাস, মা প্রসন্নময়ী দেবী। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর গুরুভাই তবলাবাদক পিতা কুলকচন্দ্রের কাছে তবলায় প্রথম তালিম। গান শেখা শুরু কাকা মেঘনাদ বিশ্বাসের কাছে। উস্তাদ বাহাদুর খাঁর বাবা আয়াত আলি খাঁর কাছে সরোদ শেখা। এ সবই শৈশবের কথা। পিতৃহারা ব্রজেন মাত্র ন'বছর বয়সে গাঁ ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। ঘটনাচক্রে শচীনদেব বর্মণের সংস্পর্শে আসেন। তারপর শচীন কর্তার অনুপ্রেরণায় মার্গ সংগীতের বিস্তৃত জগতে প্রবেশ করেন। একে একে আচার্য মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, হরেন মান্না, ফিরোজ খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, তারাপদ চক্রবর্তী এবং স্বয়ং শচীনদেব বর্মণের কাছে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে শিক্ষালাভ করেন। শচীন কর্তার প্রায় প্রতিটি জনপ্রিয় বাংলা গানে ব্রজেন বিশ্বাস তবলা সঙ্গত করেছেন। রাহুলদেব বর্মণের প্রথম শিক্ষাগুরু ব্রজেন বিশ্বাস আপাদমস্তক গাঁয়ের মানুষ, তাই সহজেই শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের মধ্যে সাঁকো বাঁধতে পেরেছেন। দৃষ্টিহীন সাধকশিল্পীর দোতারায় সরোদের স্বাক্ষর, বাউলের খঞ্জরীতে ছন্দোময় বোল এবং নিজের হাতে তৈরি বাঁশের ব্রজতরঙ্গে একটু ছোঁয়ায় রাগ রাগিণী খেলা করে অনায়াসে আজও। "ব্রজতরঙ্গ" নামটি দিয়েছিলেন স্বয়ং শচীনদেব বর্মণ। 'ছদ্মবেশী' ছবিতে ব্রজেনবাবুর ওই বিশেষ বাজনা দিয়ে 'প্রিলিউড

মিউজিক' বানিয়েই শচীনদা গেয়েছিলেন অজয় ভট্টাচার্যের বিখ্যাত রচনা 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ।' উল্টো পিঠে ছিল 'নূতন ঊষার সৈনিক তুমি গৈরিক তব গায়'।

মান্না দের কথা শচীন কর্তাকে বাদ দিয়ে হতেই পারেনা। একথা যিনি সবচেয়ে বেশি বলেন, তিনি মান্না দে। পুলকবাবুর আখ্যান দেখবেন পাঠক, তখনও অপরিচিত 'মানা'কে সুরের জগতে স্থাপনা করতে খ্যাতিমান শচীন কর্তার কেমন জেদ। দীর্ঘদিন মান্না দে শচীন কর্তার সুর-সহযোগী ছিলেন। শচীন কর্তা সুর দিতেন কেমন করে—মান্না দের চেয়ে কে বেশি জানবেন?

'সুর তৈরি করে সকাল, দুপুর সন্ধ্যে গাইতেন। পাঁচদিন, ছয়দিন, সাতদিন, বেছে বেছে লোকেদের শোনাতেন, কম কাজ নিতেন : বাসু চ্যাটার্জী ভালো পরিচালকদের একজন। শচীন কর্তাকে সুর দিতে বলছেন, 'ওসপার' ছবি করবেন। কর্তা রাজি হচ্ছেন না। হাতে নাকি অনেক কাজ। আমায় এসে ধরলেন। কর্তাকে বললাম। রাজি হলেন শেষে। সলিলের সুরে অসাধারণ গান। জিন্দেগি-ক্যায়সা হে পেহেলি। মীরা বৌদির কাছে বাসু এলেন। গীতিকার যোগেশ এলেন। আমি বললাম, তবে কিনা রাজি হলেন। গায়কি-তে দেহাতি ভাব ছিল। এই সম্পদের তুলনা নেই। হিউমার ভালো জানতেন। মনটা জওয়ান ছিল। তাঁর কাছেই শিখেছি, একটা গান বারবার গেয়ে গেয়ে কেমন পূর্ণতার জায়গায় পৌঁছুতে হয়। যা দরকার, টেনে বের করে নিয়ে নিতেন। লতা, আশা, গীতা, রফি কেউই রেহাই পেতনা। আমায় তো ভালোবাসতেনই। ৯, মদন ঘোষ লেনে কাকার কাছে (কৃষ্ণচন্দ্র দে) গান শিখতে আসতেন। আগে থেকেই আমাদের পরিচয়। খেলার পাগলামো শেষদিনেও ছিল। খেলা থাকলে এমনকি ফাইনাল রেকর্ডিংও বন্ধ করে দিতেন। স্টুডিও থেকে ট্রেনে চেপে চার্চ গেইটে এসে খেলা দেখে বাড়ি ফিরতেন। এসব কথা মান্না দে ১লা অক্টোবর ২০০০ এফ. এম. রেডিওর শচীন কর্তা শ্রদ্ধাঞ্জলীর অনুষ্ঠানে বলছিলেন। পাঠকদের জানাতে চাইলাম।

মুম্বাইয়েরই কথা। ছবি তৈরি হবে। আরাধনা। শক্তি সামন্ত তৈরি করবেন। সুর কে দেবেন? শক্তিবাবু চাইছেন, শচীন কর্তা রাজি হলে ভালো হয়। শংকর জয়কিষাণ তিন লক্ষ টাকা চাইবেন, কর্তাকে দিয়ে অনেক কমে করিয়ে নেয়া যাবে। আগের একটা ছবিতে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়েছিলেন। ঠিক করলেন, এবার এক লক্ষ টাকা দেবেন। বাকি গল্পটা শুনুন,

"...শচীনদা গল্প শুনে মহা খুশি। তবে বললেন, 'ইনসান জাগ ওঠা'য় কম টাকা দিয়েছিলে, একটু বেশি দিও।'

শক্তি সামন্ত বললেন, কত নেবেন বলুন? বেশি চাওয়ার ধরনটা দেখবেন পাঠক। 'গতবার ৭৫ দিয়েছিলে, এবার কিন্তু আশি হাজার নিমু'।

শক্তিবাবুরা ভেবেই এসেছিলেন, এক লক্ষ দেবেন। শচীন ভৌমিক পাশ থেকে জানালেন,

এক লাখ ভেবেছিলাম আমরা।

মুখে আলোর রেখা খেলে যায়। লাফিয়ে উঠে বলতে থাকেন বারবার, 'এক দিবা। এক দিবা। দেখো, কি দারুণ মিউজিক দেবো তোমার ছবিতে। নাম কি ছবির?'

লতা মঙ্গেশকরের কথা না বলে গানের কথা এই দেশে কে লিখতে পারেন? শচীন কর্তার অভিমতটুকুই আমরা সরাসরি শুনে নিই,

'প্লে-ব্যাক শিল্পীদের মধ্যে লতা মঙ্গেশকর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাইকের এত উপযোগী গলা বোধহয় আর কারও নেই, এমনকি অতীতেও ছিল না। ভবিষ্যতেও তা হবে কিনা সন্দেহ। সব রকম গান, নানা সুরের। নানা ধরনের মুডের, লতার গলায় খাপ খেয়ে যায়। অত্যন্ত অনায়াসে লতা সব গান ও সুর তুলে নিতে পারে। এখনও, প্রাদেশিক মনোভাব ও ভেদাভেদের দিনেও, ভারতের সব অঞ্চলে লতার জনপ্রিয়তা, বিভিন্ন ভাষায় তার গান সকলের হৃদয় জয় করেছে।'

'আমার হিন্দী বহু গানের সাফল্যের মূলে লতার গলা।' একজন শিল্পী জীবনে বোধহয় এর চেয়ে বেশি প্রশস্তি প্রত্যাশা করেন না। নিছক অভিমানে লতাজী শচীন কর্তার গান বছর কয়েক গাইতেন না। হাসিখুশি রাহুল এ জিনিস সইতে পারেননি। আবার দু'জনের সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছিলেন।

সোজা সুরের পক্ষে ছিলেন শচীন কর্তা। অভিজ্ঞতাতেও দেখেছেন, 'সুর যতো সোজা, গান তত হিট হয়। নানারকম রং ফলিয়ে কেরামতি দেখিয়ে সুর বানানো যায়, তবে সোজা গান, শিশুটিও গাইতে পারে এমন গান, এসব তৈরি করাইতো সবচেয়ে কঠিন কাজ।

কঠিন সুর নিয়ে কি শচীনকর্তা পরখ করেননি? 'অমায়িক নিরহঙ্কার ও মিষ্টভাষী' মান্না দে এই বিষয়ে তাঁর সাথী ছিলেন। বললুম অমনি গান করে এলুম-মান্না দে এমন শিল্পী নন। তাঁর পরিশ্রম প্রবণতা শচীন কর্তার পছন্দ হত। 'পুছোনা কঁ্যায়সে ময়য়নে রয়ন বিতাই' এই গান কেউ কি কখনও ভুলে যেতে পারবেন?

'সরগমের নিখাদ' এ শচীন কর্তা তাঁর জীবনটাকে তিন অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। কুমিল্লার জীবন, কলকাতার জীবন আর মুম্বাইয়ের জীবন। সত্যিইতো তাই। ১৯০৬ থেকে ১৯২৪, এই শৈশব ও কৈশোর কুমিল্লায় কেটেছে। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৪—এই যৌবন কলকাতায় কাটিয়েছেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৭৫ এর ৩১শে অক্টোবর শচীন কর্তার ঠিকানা ছিল মুম্বাই। তবু কি তাঁর প্রকৃত পরিচয়? তার পরিচয় তিনি বোধহয় নিজেই রেখে গিয়েছেন।

'...নিজের শুধু এই পরিচয় যে আমি বাংলা মায়ের সন্তান এবং আমার সুরসৃষ্টি সমগ্র ভারতবাসীর সম্পদ—আমার সুর ভারতবর্ষের প্রতীক।'

জীবন সায়াহ্নে এসে শচীন কর্তা 'সরগমের নিখাদ হয়ে, তলানিতে পড়ে থাকতে' চেয়েছেন।

তলানি! আমরা কি তাই হতে দেবো তাঁকে? তবে তিনি আমাদের কি শেখালেন?

কথা মোহিনী চৌধুরী, সুর আর গান শচীনকর্তা

ফরিদপুর জেলার ডহরপাড়া জমিদার বাড়ির ছেলে ছিলেন মোহিনী। বাবা মতিলাল। মা গোলাপকামিনী দেবী। শচীনকর্তার চেয়ে বছর পনেরো ছোট ছিলেন মোহিনী। ১৯২০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। পড়াশুনোয় বরাবরের ভাল ছাত্র। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উনিশতম স্থান লাভ করেছিলেন। আই. এস. সি. পরীক্ষাতেও ভাল ফল করেন। ইতিহাসের নির্মমতা চৌধুরী পরিবারকে দেশছাড়া করে। কলকাতার বেহালায় বসতি গড়ে তুলেন। জি. পি. ও-তে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি জোগাড় করেন মোহিনী। পড়াশুনো আর করতে পারেননি।

কৈশোরজীবন থেকেই তিনি গান লিখতেন। গ্রামোফোন কোম্পানিতে গান পাঠালেনও কয়েকটা। গান মনোনীত হল। ঠিকানা দেননি বলে গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে জানাতে পারছিল না।

১৯৪৩ সালে তাঁর গান প্রথম রেকর্ড হয়। শৈলজানন্দ বাবুর 'অভিনয় নয়' ছবির গান লিখেছিলেন মোহিনী। জগন্ময় মিত্রের বিখ্যাত গান প্রায় সব ক'টাই তাঁর লেখা। সত্য চৌধুরী যখন গাইলেন 'পৃথিবী আমারে চায়', মোহিনীর নাম মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে চাকুরি ছেড়ে দেন। শৈলজানন্দের সাথে অনেক ছবির সহকারি হিসেবে কাজ করলেন। গানও লিখলেন পর পর। 'সাধনা' ছবি পরিচালনা করতে গিয়ে নিঃস্ব হলেন। পয়সার জন্যে সে সময়কার বহু জনপ্রিয় হিন্দি ছবির বাংলা অনুবাদ করেছেন। মন চায়নি

তাঁর। বাধ্য হয়েছেন।

কিছুকাল তিনি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। ছেড়ে দিয়ে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে কাজ নিয়েছিলেন। বাবা বারণ করেছিলেন, গান লিখো না—গান লেখা ছেড়ে দিলেন। অনেক পরে 'নায়িকা সংবাদ' আর 'শুকসারী' ছবির গান লিখেছিলেন। আকাশবাণীতে কিছু জনপ্রিয় গান রচনা করেছিলেন মোহিনী। অনুপম ঘটকের সুরে 'নবজীবনের গান' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল সেদিন। শচীনকর্তা তাঁর জীবনে অনেক যোগ্য প্রতিভাকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছিলেন। মোহিনীর গানের কথা শচীনকর্তাকে নাড়া দিত। ইচ্ছে তাঁর, মোহিনীর লেখা গান করবেন। কথা বলে জানতে পারেন, মোহিনী আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার নন। এই অনুমোদনের দায়ভার শচীনকর্তা নিজের হাতে নিয়েছিলেন। মোহিনী চৌধুরীর স্ত্রী লীলা চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণায় (নৈর্ঋত ঃ কবি গীতিকার মোহিনী চৌধুরী স্মরণ সংখ্যা ঃ বৈশাখ - আশ্বিন ১৪০৭) জানাচ্ছেন,

'শচীন দেববর্মণ ওঁকে রেডিওতে নিয়ে যান প্রথম। কবির মুখে শুনেছি কর্তা দু'খানা গানের সুর করে বললেন, 'আপনি কি রেডিও-র অ্যাপ্রুভড রাইটার'? উনি বললেন, 'না'। 'ওমা, তাহলে আপনার গান গাইমু কেমন তারা? চলেন আমার সঙ্গে রেডিওতে'। একটা চমৎকার অখ্যান সেদিনের রচনায় লীলা চৌধুরী পরিবেশন করেছেন, আমরা পাঠকের দরবারে হাজির করার লোভ সামলাতে পারছি না।

প্রথম দিনের কথা। মোহিনী শচীনকর্তার বাড়িতে গিয়েছেন। কর্তা একটা চেয়ার দেখিয়ে মোহিনীকে বললেন, 'বসেন ঐখানে। ঐ যে চেয়ারখানা দেখছেন ঐ খানায় অজয় বইতো। আপনে সুরের উপরে গান লিখতে পারবেন তো'? মোহিনী চৌধুরী অজয় ভট্টাচার্যকে অসামান্য শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। 'দেশের মাটি' ছবিতে অজয় ভট্টাচার্যের রচনা শুনে সারারাত কেঁদেছিলেন। তখন মনে হয়েছিল, অজয় ভট্টাচার্যের বাড়িতে চাকর হয়ে থাকতে পারলেও জীবন ধন্য হয়ে যেত। কর্তার কথায় জবাব দিলেন মোহিনী, 'লিখিনি কখনো। তবে চেষ্টা করবো।'

'কে আমারে আজো পিছু ডাকে'...এই গানটা লেখার সময় কর্তা বললেন, 'মোহিনীবাবু। এমন একটা গান লেইখা দ্যান যাতে 'কেয়া' থাকে। তাই এই গানে দুই তিনবার 'কেয়া' কথা লাগানো হয়েছে। কর্তা খুব খুশি। এই গান লেখার সময় একটা 'কথা' দিলেন, সেটা হল এই—

টংগালী গো টংগালী/নাকে মুখে চুনকালী/তুমি মা জগতে কালী/মেড়া পাঁঠা খাও/শিবের বুকে পাও/শিবের বুকে পা দিয়া/ভেটকী ধইরা রও/জগদম্বে গো।

'সমর' ছবিতে লেখা হল তারপর,

সুন্দরী লো সুন্দরী/দল বেঁধে আয় গান ধরি/আজ বাদে কাল যদি মরি/আর না দাগা দিস/তুই আগেই মরেছিস/মরেছি মরেছি ও তোর/দুচোখ ভরা বিষ/প্রাণে সয়না লো।

শচীনকর্তা মাটির গানের সুর দিচ্ছেন। মোহিনী নাগরিক ভাষায় তার শরীরে কথা বসাচ্ছেন।

আরও একটা গান দিলেন শচীনকর্তা।

'গাঁয়ের বঁধু দুলদুলিয়া যায়।' মোহিনী লিখলেন সেই বিখ্যাত গান, 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায়।'

স্মৃতিচারণায় লীলাদেবী একটা মজার কথা শুনিয়েছেন। শচীনকর্তার ছেলে রাহুলের বয়স তখন বছর পাঁচ। ডাকনাম পঞ্চম। কর্তা পঞ্চমকে ডেকে বললেন, 'পঞ্চম, বাজনাটা বাজাও তো।' রাহুল অমনি গাল ফুলিয়ে অদ্ভুত বাজনা বাজালো আর কর্তা তার সাথে গান গাইতে লাগলেন। হিমাংশু রায়, অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ—এমন দিকপাল গীতিকারের সাথে আজ মোহিনী চৌধুরীর নাম সমান সারিতে উচ্চারিত হয়।

আমরা এখানে মোহিনী চৌধুরীর লেখা শচীনকর্তার কয়েকটি গান তুলে ধরছি। সব ক'টি গানে সুর দিয়েছেন শচীনকর্তা। গায়কও তিনিই।

সেই যে দিনগুলি
বাঁশী বাজানোর দিনগুলি
ভাটিয়ালির দিনগুলি
বাউলের দিনগুলি
আজও তারা পিছু ডাকে
কূলভাঙা গাঙের বাঁকে
তাল সুপারির ফাঁকে ফাঁকে
পিছু ডাকে পিছু ডাকে ঃ
শুনি তাক্‌দুম তাক্‌দুম বাজে বাজে ভাঙা ঢোল!
ও মন যা ভুলে যা কী হারালি ভোল রে ব্যথা ভোল।।
না না না তেমন তো ঢোল বাজে না,
গাজনে যে লাগতো নাচন মন তো তেমন নাচে না।
কই গেল সে ঢ্যাংকুড়কুড় ঢ্যাংকুড়কুড় বোল
কই গেল সে ড্যাংড্যা ড্যাড্যাং ড্যাংড্যা ড্যাড্যাং বোল।।
এই না পারে ঢোল বাজেরে ঐ পারে তার সাড়া,
মাঝখানে বয় থৈ থৈ থৈ নয়নজলের ধারা।
কই গেল সে গাঁয়ের মাটি কই সে মায়ের কোল
কই সে হাসি কই সে খেলা কই সে কলরোল।।

হায় কী যে করি এ মন নিয়া?
সে যে প্রণয়-হুতাশে ওঠে উথলিয়া!
ঐ দুষ্টু পাপিয়া বলে 'পিয়া পিয়া' —'পিয়া-পিয়া'।।
তার মিষ্টি কূজনে শুধু জ্বলে হিয়া
মিছে অভিমান ওঠে মনে উছলিয়া
আছে সবারি কেহ না কেহ মরমিয়া
হায় একেলা আমারি শুধু নাই প্রিয়া।।
ঐ ফুলের বাসরে দেখ বনলতা
বুঝি তরুণ তরুর সনে বলে কথা!
তারা কেহ তো বোঝে না মোর আকুলতা
তাই মরমে মরি যে আমি গুমরিয়া।।
দেখ একটি আকাশে কত জ্বলে তারা
মেশে একটি সাগরে কত জলধারা
হায় আমি কি একেলা রবো সাথীহারা
মোরে কেহ কি বাঁধিবে না গো মালা দিয়া।।

ভুলায়ে আমায় দু'দিনে শেষে কি হায় ভুলবে?
এই নিশি পোহায় যদি হৃদয়-দুয়ার খুলবে!
দূর-চাঁদকে পাশে কে পায় চকোর মরে কাঁদি'
আর মন নিয়ে যে যায়গো তার ছায়া বুকে বাঁধি,
জানি প্রেমভরা এই হিয়া ব্যথায় ভরে তুলবে।।

হায় হায় পাষাণী প্রিয়া! হায় হায়রে পাষাণ হিয়া!

মন জ্বলে এ কোন জ্বালায় গোপনে ভালোবেসে।
মোর গান কি শুনবে না কেউ মোর কাছে এসে?
মোর সাথী যে কেউ নাইরে যার বুকে এ হার দুলবে।।

কে আমারে আজো পিছু ডাকে
সে কি আলো, সে কি আলেয়া?
আঁখি মেলে পথ চেয়ে থাকে
থাকে কেগো উতলা কেয়া।।
আজি আকাশের আঁখিজল
বনপথ করেছে পিছল,
কাঁদে কেকা কদমবনে
খনে খনে চমকে দেয়া।।
কেয়া কেন কাঁটার মাঝে
মরমের সুরভি ছড়ায়?
মালা হ'য়ে বুকে এল না যে
(কেন) তারি স্মৃতি চরণে জড়ায়?
আঁখি হ'তে দিয়েছি বিদায়
তবু হিয়া কাঁদে একী দায়।
বিরহের ভরা-নদীতে
একা একা বাহি যে খেয়া।।

পিয়া সনে মিলন পিয়াস ঃ
নিদ নাহি রজনীতে,
দিবসে বিবশ হিয়া
প্রেমাবেশে নয়ন উদাস।।
মধুবনে মধুমাসে বঁধু যদি নাহি আসে
বৃথা হবে কুসুম সুবাস,
বৃথা হবে মন-অভিলাষ।।
ঝরে ফুল ঝরো ঝরো
বনপাখি ঝুরিবে কুলায়,
অনুরাগে জর-জর
তনুলতা লুটাবে ধুলায়।
নব-ঘন-সমারোহে পরবাসে ছিনু দোঁহে,
নিশি বায়ে মিলিত হুতাশ
মিটিত না আঁখির তিয়াস।।

কথা অজয় ভট্টাচার্য, সুর আর গান শচীনকর্তা

যে বছর জন্মেছিলেন শচীনকর্তা, ঠিক সেই বছরেই জন্ম হয় অজয় ভট্টাচার্যের। কুমিল্লা জেলার শ্যামগ্রামে অজয় ভট্টাচার্যের জন্ম। বাবা রাজকুমার ভট্টাচার্য। মা শশীমুখী দেবী। বাবা কুমিল্লা কোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। অজয় ও সঞ্জয়—'পূর্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য—দুই ভাইয়ের নামই বাংলার কাব্যজগতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কি ছিলেন না অজয়? কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও চিত্রপরিচালক। খেলাধূলাতেও তিনি অসাধারণ ছিলেন, কুমিল্লার বিখ্যাত টাউন হলে তিনি নিজে অনেক নাটক প্রযোজনা করেন। মেধাবী ছাত্র অজয় ভট্টাচার্য ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। শিল্পসৃজনের ইতিহাসে এই সাফল্য মুখ্য না হলেও বাড়তি থাকলে যোগ করতে ক্ষতি কি?

পাশ করার পর কিছুকাল তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। পরে কলকাতায় চলে আসতে হয়। বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর জীবনকালের সময়সীমা মাত্র ৩৭ বছরের। এই সময়ে তিনি দেড় হাজার গান রচনা করেছিলেন। শৈশব ও কৈশোরে কুমিল্লার সাংস্কৃতিক জীবন তার সৃষ্টির মনন গড়ে তোলে। যে দু'জনের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, একজন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত। অন্যজন সুর ও কণ্ঠের যাদুকর শচীন দেববর্মণ। আমাদের শচীনকর্তা। অজয়ের গানের বাণী, সুরসাগরের সুর আর শচীনকর্তার কণ্ঠ—এই ত্রয়ীর সমাহার সেই সময়ে বাংলার আকাশ

বাতাস মাতিয়ে রেখেছিল। হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস, গ্রামোফোন কোম্পানি, মেগাফোন, সেনোলা এরা সবাই এই ত্রয়ী প্রতিভার প্রচুর রেকর্ড বের করে।

ছাত্রজীবনে অজয় ভট্টাচার্য কবি নজরুলের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' কাগজে তাঁর প্রথম কবিতা 'উল্কা' প্রকাশিত হয়েছিল। একাধিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। উপন্যাস লিখেছিলেন, 'যেথা নাই প্রেম।' সেই সময়ে এরিখ মারিয়া রেমার্কের 'রোডব্যাক' উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। গীতিকথার একাধিক বই রয়েছে। শচীনকর্তা কবির কিছু গানের স্বরলিপি নিজে রচনা করে 'সুরের লিখন' নামে প্রকাশ করেছিলেন। 'অশোক' ও 'ছদ্মবেশী' ছবি দু'টির পরিচালক ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই ছবি। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ আমরা তাঁকে আকস্মিকভাবে হারাই। এই বইয়ে আমরা কবির লেখা বেশ কিছু গান দিলাম, সব ক'টি গানেই শচীনকর্তা সুর দিয়েছিলেন। স্বরলিপি চাইলে আগ্রহীজন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি প্রকাশিত 'অজয় ভট্টাচার্যের গান' (সম্পাদনা : রেণুকা ভট্টাচার্য, ১৯৯১) দেখে নেবেন।

গান ॥

থাকি আমারি কথা
ওগো বিফল সাঁঝে
ও স্মরণ-গীতে
যেন বারেক বাজে।
যদি আঙিনা-তলে
ও দীপালি জ্বলে
জ্বেলো একটি বাতি
মোরে স্মরিয়া লাজে।
দূর বিদায়-বেলায়
ও শেফালীবনে
তুলে গোলাপ যদি
তোলো আমার তরে
ঢালি' নয়ন-বারি
তোমা চুড়ায়ে ভরি
রাখি' আমারি নাম
প'রো অলক-মাঝে।

শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য

দেশ মিশ্র—দাদরা

এই মহুয়া বনে
মনের হরিণ হারিয়ে গেছে
খুঁজি আপন মনে।

এ কাননের তরুলতা
জানে কি তার পথের কথা?
সে গেল হায় আচম্‌কা কোন্‌
পথিক হাওয়া সনে?

বাঁধন-ভীতু মায়া-মৃগে
বন্দী ক'রে হায়
হারিয়ে তারে দু'নয়নে
অশ্রু ঝ'রে যায়।

মনের দুয়ার ভেঙ্গে দিয়ে
সে গেলরে মুক্তি নিয়ে
তার মায়াতে বন্দী হ'য়ে
কাঁদি সঙ্গোপনে।

রচনা-১৯৩৫

যোগিয়া মিশ্র—ত্রিতাল

ওরে যোগী, প্রেম বিনা কে তাহারে পায়?
জপমালা বাঁধে নারে প্রেম দেবতায়।
ধ্যানে তোর তিনি নাই প্রেম মাগে সব ঠাঁই
চেয়ে দেখ আজি ভাই, (রে যোগী)
আঁখি মুদে কেহ কিরে দরশন চায়?
গৃহ ছাড়ি বনবাসে কেন তুই যাস্?
দেবতা রয়েছে ঘরে দেখিতে না পাস্।
হেথা যে রে তোরি পাশে শিশু হয়ে তিনি হাসে
বধূ হয়ে ভালবাসে, (রে যোগী)
তোর সুখে হাসে প্রভু কাঁদে বেদনায়।

রচনা-১৯৩৫

ভাটিয়ালী—কাহারবা

ওরে সুজন নাইয়া,
কোন্ বা কন্যার দেশে যাও রে
চান্দের ডিঙ্গি বাইয়া?
লক্ষ তারার নয়ন কোলে
কার চাহনির মানিক জ্বলে,
আব্‌ছা মেঘের পত্রখানি
কে দিল পাঠাইয়া?
কোন্ সে কন্যার দীর্ঘ নিশাস
আইল বাউরী বায়ে?
চোখের জলে তোমার নাম কে
লেখে আপন গায়ে?
নদীর জলের আরসিতে হায়
কোন্ সে প্রিয়া দেখে তোমায়?
সাঁঝের পিদিম ভাসায় জলে
কে তোমারে চাইয়া?

রচনা-১৯৩৫

মিশ্র—কাহারবা

কণ্ঠে তোমার দুলবে ব'লে
গানের মালা গাঁথি।
তুমি এসে বসবে ব'লে
হিয়ায় আসন পাতি।

তোমার সুবাস চাঁপার গন্ধ মাঝে
জ্যোছনা রাতে আলোর বুকে
নুপূর তব বাজে,—
পাইনে তোমায় বাসর জাগি
জ্বালিয়ে প্রেমের বাতি।

একলা কাঁদি অঝোর ধারে
সে ধারাতে আসবে না কি
তোমার তরী হৃদয়-পারে?

তুমি আমায় করবে অবহেলা—
তোমায় ডেকে কাঁদবো আমি
এ কী তব খেলা?
তোমার খেলা শেষ হ'লো না
ঘনায় আমার রাতি।

রচনা-১৯৩৫

গজল—কাহারবা

জাগার সাথী গো মম জাগিও আমার সাথে
ঘুমায় না শশী তারা এমন মাধবী রাতে।
আলোক-রাগে মুকুল জাগে
সুবাস জাগে অন্তরে
চাঁপার বনে ঘনায় মধু
মহুয়া-শাখা মুঞ্জরে
ঘুম-না-জানা ব্যাকুল অলি
কুসুমে ডাকি গুঞ্জরে।
ঘুম-ভাঙানিয়া-গীতি রাতের পাখায় বাজে
তটিনী নিদ্রাহারা সাগর ধেয়ানে রাজে।
হে চির-সখা, আমারি কথা
নিখিল নভে সঞ্চরে
তোমারি তরে জাগিব আমি
জাগিও বঁধু মোর তরে
এ রাতি মম রহিবে জাগি
চির-রাতির অন্তরে।

রচনা-১৯৩৫

ভৈরবী মিশ্র—কাহারবা

প্রভাতে আজ কে এলে গো, রূপ-অলকার
তিমির-দুয়ার খুলে?
পূর্ণিমা-চাঁদ অস্তপথে চমকে দাঁড়ায়,
তোমার রূপে ভুলে।
আকাশ ছিল তোমার ধ্যানে,
সে জাগে ঐ আলোর গানে,
অরূপ তব লীলা-কমল, বিশ্বরূপে
উঠল আজি দুলে।
না-শোনা কোন্ বাণী শোনাও,
অজানা হে, তুমিই জানো—
ঘুম ভাঙায়ে মানস-কলির
আবার কেন বেদন হানো?
কোন্ সুদূরের বাঁশীর টানে,
কোথায় যাবে কে বা জানে?
তোমায় স্মরি' অশ্রু-শিশির মৌন-ব্যথায়
জাগবে ফুলে ফুলে।।

রচনা-১৯৩৫

ভৈরবী—কাহারবা

প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে
রয় না বাহিরে।
ফুলের খেলায় চাঁদের মেলায়
কোথায় পাবি রে?

দেখ্ না খুঁজে হিয়ার মাঝে
রহে চির-সুন্দর,
আপন আলোয় উজ্জ্বল করে
প্রাণের গহন কন্দর।
অলখ্ যে জন তারে নয়ন
পাবে নাহি রে।

প্রেম-নগরে বসত্ যে তার
তোরি হিয়ার মাঝে
এক মনে শোন মরমে তোর
তার মুরলী বাজে।
তোর আঘাত সে যায় যে ভুলে
তোরে চাহি রে।।

রচনা-১৯৩৫

ভাটিয়ালী—কাহারবা

ফুলের বনে থাকো ভ্রমর
ফুলের মধু খাও,
আমার কথা কণ্ঠে লইয়া
বন্ধুর দেশে যাও।
যাও রে ভ্রমর যাও।
শুন্‌বে যেথায় বেভুল বাঁশী
সেথায় আছে মোর উদাসী
আমার নাম তার কানে দিও
তারে যদি পাও।
যাওরে ভ্রমর যাও।
বন্ধু যদি চম্‌কে উঠে
সজল চোখে চায়,
কইও তারে তারি লাগি
আজো কাঁদি হায়।
পথ যদি সে ভুলে থাকে,
পথ দেখায়ে এনো তাকে।
(আমার) বুকের মালার মধু নিয়া
তারে এনে দাও।

রচনা-১৯৩৫

বিজয়া

"বিদায় দাওগো মোরে—"
উমা সতী কেঁদে কয়।
কাজল মুছিয়া গেল
সিন্দুর মলিন হয়।
গিরিরাণী কহে, "মাগো,
এ ব্যথা বুঝিবিনা গো—
মা'র বুকে কী যে শেল
গোপনে বিঁধিয়া রয়।"
তোমারে ছাড়িতে উমা
পরান বিদরে হায়—
কাঁদে যত নরনারী
লুটাইয়া রাঙা পায়।
বলে তারা "সিন্দুরে লেপিয়া পাও
পদচিহ্ন রেখে যাও—
বুকে ধরে রব মোরা
প্রাণ হবে উমা-ময়॥"

রচনা-১৯৩৫

মালগুঞ্জ—ত্রিতাল

মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয়?
ক্লান্ত-প্রাণে মম স্নিগ্ধ সুরভি দিও।
মুগ্ধ শশী রহি গগন-তলে
জ্যোছনা-প্রীতি ঢালে সরসী জলে,
হিয়ার সুধা মম পরান ভরিয়া পিও।
উঠিবে ডাকি যবে ভোরের পাখী
তুমি তো যাবে চলি বেদনা রাখি,
পথের সাথী করি আমার মালাটি নিও।।

রচনা-১৯৩৫

আগমনী—কাহারবা

স্বপন দেখেছে গিরিরাণী
আকাশের চাঁদ ডেকে বলে—
"মাগো, আজ খোল দ্বার
আমারে তুলিয়া লও কোলে।"
প্রভাতে বাহিরে আসি,
হেরিল কাহার হাসি।
উমা-সতী হাসে মৃদু মৃদু,
চরণ রাখিয়া ফুলদলে।
নভোহারা দুটি তারা, উমার নয়ন কোলে,
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, যেন রাঙা রবি জ্বলে।
বিমোহিত গিরিরাণী,
মুখে নাহি সরে বাণী!
মা হইয়া মা ডাকিতে
সাধ জাগে যেন পলে পলে।।

রচনা-১৯৩৫

মিশ্র ভৈরবী—দাদরা

আকাশে নিভিয়া গেল লক্ষতারার দীপ
উদিল কনক-রবি ঊষার ললাটে যেন সিন্দুরের টীপ।
নতুন ধানের স্বপ্ন চোখে চাষা চলে মাঠের পানে
হাঁস উড়ে যায়, কোন্ বিদেশে
এই না দেশের গুণের কথা
ক'য়ে যায় সে গানে গানে।
কাজলা-দীঘি আছে হেথায় ফটিক সমান জল
সেই না জলের মনের ব্যথা হয়েছে কমল।
এই গেরামের নদীর ধারে
লতাপাতার ঘরে
আছে আমার পরান-বঁধু
সে যে রে ভাই বনের হরিণ
বাঁধবো তারে কেমন ক'রে?।।

রচনা-১৯৩৬

ভজন—কাহারবা

আমারি জীবনে শুনি যে বাঁশী তব
মরমে এলে কি প্রভু?

বেদনা যত মম,
রাঙালে ফুল সম
আরতি প্রদীপ উঠিল জ্বলি' আজি
তোমারি আলোকে প্রভু!
তোমারি প্রেম লাগি
চাঁদিমা রহে জাগি,
ধেয়ানে ধরণী জপে (নিতি প্রভু)।
আজিকে হিয়া তলে
মিলন-মণি জ্বলে
তোমারি পরশে আমারি আঁখি বারি
কুসুম হ'লো যে প্রভু।।

রচনা-১৯৩৬

নট-বিহাগ—ত্রিতাল

ওগো ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ মঞ্জীর বাজে—
বাজে দূর বনতল ছায়ে
শুনি হিয়া মাঝে।
আসিলে শ্যামল প্রিয়,
তোমরা রহিও,
আসিলে শ্যামল প্রিয়—
রাঙা ফুল দিও,
অভিমানে ঝ'রে গেছে মালা,
আঁখি মরে লাজে।।

রচনা-১৯৩৬

ভাটিয়ালী—দাদরা

কে যাবি চল বৃন্দাবনে
যারে লাগাল পাই
প্রাণনাথ বন্ধুরে পাইলে
অঙ্গেতে মিশাই।
ও তার অঙ্গের সুবাস আমি
অন্তরে মিশাই
রাধার অন্তর নিধি
অন্তরে মিশাই।
ওপারে উঠেরে চাঁদ
অঙ্গ শীতল করে
আমার লাগি সে চাঁদ সখি
অনল হইয়া ঝরে (গো)
অনল হইয়া ঝরে
কপাল দোযে কাল শশী
অনল হইয়া ঝরে
সুধার খনি কাল শশী
অনল রূপ ধরে।
ও পারে বন্ধুয়ার বাড়ি
মধ্যে সুর-নদী
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম
পঙ্খ না দেয় বিধি।
শুনি নাকি শ্যামের প্রেমে
মরলে জীবন পায়
জীবন থাকতে মরলাম আমি
কে করে উপায়?-(গো)
কে করে উপায়।।

রচনা-১৯৩৬

কাব্য-সঙ্গীত— কাহারবা

তুমি এলে হায়
মোর জীবন-নদীর পারে
গোধূলি ঘনায়।
দিনের বাসনাগুলি
লভিল পথের ধূলি
হিয়া মোর হেথা নাই
কী দিব তোমায়।

ক্ষীণ দীপশিখা ল'য়ে
করুণ তারাটি এলো
তারি সাথে আজি মোর
বেদনা মিলায়ে গেলো।
কী আছে কী নিবে আজি
নাহি যে অশ্রুরাজি
সাঁঝের শিশির হ'য়ে
ঝরিয়া সে যায়॥

রচনা-১৯৩৬

মালগুঞ্জ—ত্রিতাল

মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয়?
ক্লান্ত-প্রাণে মম স্নিগ্ধ সুরভি দিও।

মুগ্ধ শশী রহি গগন-তলে
জ্যোছনা-প্রীতি ঢালে সরসী জলে,
হিয়ার সুধা মম পরান ভরিয়া পিও।

উঠিবে ডাকি যবে ভোরের পাখী
তুমি তো যাবে চলি বেদনা রাখি,
পথের সাথী করি আমার মালাটি নিও॥

রচনা-১৯৩৫

০ ১ + ০
II[{মা -া জ্ঞা জ্ঞরা | -সরা সা ধ্া ণ্া] সা -গা গা গা | মা পধপা মগা মা} I
ম ন্ জু রা০ ০০ তে আ জি ত ন্ দ্রা কে ন হে০০ প্রি০ য়

I মা -ধা ধা ধা | ধণা -র্সা ণা ধা | মা -ণা ধা মগা | মা পা মগা মা II
ক্লা ন্ ত প্রা ণে০ ০ ম ম স্নি গ্ ধ সু র ভি দি ও

II[মা -ধা ধা ধা | ধণা -র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্রা না | র্সা -ণা -ধা -া I
মু গ্ ধ শ শী০ ০ র হি গ গ ন ত লে ০ ০ ০

I ধা র্গা র্গা র্গা | র্রর্মা -র্জ্ঞর্রা র্সনা র্সা | না র্সা র্রা ণা | ধা -া -া -া I
জ্যো ছ্ না প্রী তি০ ০০ ঢা০ লে স র সী জ লে ০ ০ ০

I মা গমা -ধণা -র্সা | র্সনা র্সা ণা ধা | ধণা ণধা পধা ধপা | মা পধপা মগা মা II[
হি য়া০ ০০ র্ সু০ ধা ম ম প০ রা০ ন০ ভ০ রি য়া০০ পি০ ও

II[মা ধা ধা ধা | ধণা -র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্রা না | র্সা -া -া -া I
উ ঠি বে ডা কি০ ০ য বে ভো রে র পা খী ০ ০ ০

I র্সা র্গা র্গা র্গা | র্রর্মা -র্জ্ঞর্রা র্সনা র্সা | না র্সা র্রা ণা | ধা -া -া -া I
তু মি তো যা বে০ ০০ চ০ লি বে দ না রা খি ০ ০ ০

I না না না না | র্সনা -র্রর্সা ণা ধা | মা র্সা -া ণা | ধপা ধা মগা মা II II
প থে র সা থী০ ০০ ক রি আ মা র্ মা লা০ টি নি০ ও

শচীনকর্তা শুধু অজয় ভট্টাচার্যের কথায় সুর দেননি, স্বরলিপিও করেছেন। তার একটি নমুনা এখানে দেওয়া হল।

মিশ্র ভীমপলশ্রী— দাদরা

স্বপন না ভাঙ্গে যদি শিয়রে জাগিয়া রবো।
গোপন কথাটি মম নয়ন সলিলে কবো।
যদি আনমনে চলে যাও
মোর গান নাহি গাও
বেদনা লুকায়ে রাখি' রচিব গীতালি নব।

ফুল হ'য়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি' ;
ও চরণ পাবো বলে মলিন হইয়া ঝরি।
তোমার আকাশ মাঝে
চাঁদ হ'তে চাহি না যে
শুকতারা আমি আজ দিগন্তে ঠাঁই লবো।

রচনা-১৯৩৫

ভজন—কাহারবা

দেহ মোর দেউল করিয়া
হায় বৃথা রহি জাগিয়া,
জ্বলে দিবারাতি নয়ন-প্রদীপ দুটি
হৃদয়-কমল রয়েছে ফুটি
(তায়) সুবাস কাঁদে তব প্রেম লাগিয়া,
এসো প্রভু, ব্যথা হরিয়া।
তব চির-বিচ্ছেদে হোমশিখা জ্বলিছে
সে যে মম অন্তর দহিছে।
ছিল আশা প্রভু, জুড়াব জ্বালা
চরণ তব বুকে ধরিয়া।
একি অবহেলা হায় দিলে অকরুণ।
কবে জাগিবে নভে সুখ-নবারুণ,
হে বিশ্ব-প্রাণ দেখা দাও প্রাণে
আনন্দ-রূপ ধরিয়া॥

রচনা-১৯৩৬

সাধন-সঙ্গীত— কাহারবা

নয়নে হলে অমর জ্যোতি
এ দেহে তুমি প্রাণ.
তোমারি পদে কুসুম সম
জীবন করি দান।
পূজার ধূপে তুমি সুরভি
আমারি নভে তুমি যে রবি
বিরহে মম নীরবে রহি
গাই মিলন গান।
আমারি চোখে ঝরেছে যত
ব্যাকুল অশ্রুজল,
সে জলে প্রভু গিয়াছে ভরি
তোমার নয়ন তল।
তোমারি নামে আমি যে গাহি
তুমিও জাগো আমারে চাহি
তোমারে পূজি চাহিনা কিছু
চাহিনা প্রতিদান ॥

রচনা-১৯৩৬

মিশ্র—ত্রিতাল

মরমী গো চলে যায় বেলা
কবে আর হবে ফুল খেলা?
বাঁশরী বাজালে কুসুম জাগালে
কেন তারে দাও অবহেলা?
কাঁদিছে আলো দুয়ারে বসি,
উতলা বায়ু চলে নিশসি,
ঝরিবে গো ফুল এ যেন হে ভুল
ভিড়িবে কবে তোমার ভেলা?

রচনা-১৯৩৬

কাব্য-সঙ্গীত— দাদরা

হের নীল নভ ঘেরি বরষার ছায়া
নামিল ধীরে হায়,
কত মরমীর মরম-বেদনা
মেদুর মেঘে ছায়।
কোথা মালবিকা কোথা বঁধু তার?
নাহি বন-পথ নাহি অভিসার,
যুগ যুগ ধরি প্রথম আষাঢ়
কাঁদে সে বেদনায়।
আজি মনে হয় কে যেন ছিল রে
হিয়ার হিয়া মোর।
মোর পথ চাহি কুটির দুয়ারে
ফেলিত আঁখি-লোর।
পূবালী পবনে তারি ব্যথা বুঝি
আজো ঘুরে ফিরে মোরে যায় খুঁজি
তার আঁখি-বারি আমার নয়নে
কি ছলে দিয়ে যায়॥

রচনা-১৯৩৬

মিশ্র—কাহারবা

তমালের হিয়াতল রাঙিল—
নীলিমার নীল রঙ লাগিল রে।
ভুবন-আঙিনাতলে আসি,'
কে দিল বিছায়ে আলো হাসি?
মায়াবী কানুর বাজে বাঁশী—
ঘুমানো ফুলের কলি জাগিল রে!
যুগ যুগ ধরি নিখিল গোঠে বাজে
সে চির-কিশোর বেণু
আকাশে আকাশে সুরের হিল্লোলে
ছড়ায়ে আলোক-রেণু।
রূপের কুমার সে যে জানি,
চরণে লুটায় মোর বাণী;
জীবনে জীবন তার মানি—
সকল পরান তারে মাগিল রে॥

রচনা-১৯৩৭

ভৈরবী—দাদরা

প্রেম যমুনারি পারে
মোর হিয়া কেঁদে মরে
কোথা বেণুধর শ্যামল
কোথা ধেনু গোঠে চরে।
নাহি রাধা অভিসারী
নাহি সখীজন তারি
কাঁদে বিরহী শুক সারী
বসি ম্লান তমাল পরে।
নাই রাস মধুর খেলা
নীল সলিলে রূপমেলা
কাঁদে বিজন গোধূলি বেলা
ব্যথা হিম নয়নে ঝরে।
খুঁজি কানুর মায়া বাঁশী
বহে যমুনা জল রাশি
নাহি উছল কল হাসি
ভোলে উজান চিরতরে।
এস মাধব নিখিল প্রিয়
আজি বিরহে মিলন দিও
এস আঁধারে বরণীয়
চির সুধা শশী রূপ ধরে॥

রচনা-১৯৩৭

মিশ্র—কাহারবা

যেথা দিন মিলাবে
অস্তাচলের ছায়া পারে—
সেথা খুঁজব তোমায়
চির-রাতের অন্ধকারে।
যারা চলে চলার সুখে,
ফিরে না আর ফিরার মুখে-
এবার তাদের মাঝে চাইব তোমায়
বারে বারে।
নাই বা যদি হ'লো পাওয়া
দুঃখ কিছুই নাই,
আমার চাওয়া পাওয়ার আশা
রাখে না যে তাই।
রাতের কুসুম যেমন ক'রে,
জেগে থাকে চাঁদের তরে—
তোমায় চাইনা পেতে সেই বিরহের
অধিকারে॥

রচনা-১৯৩৭

ভজন—কাহারবা

সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে
তার বন ফুল মালা দোলে
সে যে বংশীওয়ালা মোহিল ভুবন,
তার মোহন মুরলী বোলে।
বন ফুল মালা দোলে।

মোর আনন্দ সে যে নন্দ দুলাল
সে যে ছন্দ দুলাল মোর নন্দ দুলাল
রহে কদম্বমূলে যমুনার কূলে
বাঁশীতে উজান তোলে।
নিধুবনে সখা লয়ে খেলে হরি শিশু হয়ে
অধরে মধুর হাসি জাগে
যেথা চলে শ্যামরায় ফুল জাগে পায় পায়
ধূলিকণা পদছায়া মাগে।
যবে আমার জীবনে আসি ডাকিবে বাজায়ে বাঁশী
যেন অন্ধ নয়ন জাগে প্রেমের মলয় লাগে
হৃদয় দুয়ার যেন খোলে।।

রচনা-১৯৩৭



স্মরণ ঃ শচীনকর্তা

রাইচাঁদ বড়াল

[১৯০৩ সালে কলকাতায় জন্ম। বাবা সঙ্গীতশিল্পী লালচাঁদ বড়াল। সুরশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ তরুণ বয়স থেকেই এনায়েত খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, জদ্দন বাঈ, গহরজান, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্রে ভারতীয় সঙ্গীত বিভাগের প্রযোজক ছিলেন। নির্বাক যুগে 'চোরকাঁটা' ও 'চাষীর মেয়ে' ছবিতে একদল যন্ত্রী নিয়ে অসামান্য আবহসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। প্রথম সবাক ছবি 'চণ্ডীদাস' এরও তিনি সঙ্গীত পরিচালক। প্রথম কার্টুন চিত্রের নির্মাতা। পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কানন দেবী, পাহাড়ী সান্যাল ও আরও অনেকে তাঁর সুরে অবিস্মরণীয় নানা গান পরিবেশন করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি (১৯৪১), নারী (১৯৪২), দাবী (১৯৪৩), বিরাজ বৌ (১৯৪৬) সহ আরও বহু ছবির সঙ্গীত স্রষ্টা। পন্ডিত রবিশঙ্করের ভাষায়, '....খুব নামডাক ছিল, বড় ঘরের ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি আশিকী মেজাজ। তবলায় খুব মিষ্টি হাত ছিল'। ১৯৭৯ সালে 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮১ সালে চির বিদায় নেন।]

শচীন কর্তার গান প্রথম শুনেছিলাম বোধহয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রে। গান শুনে অবাক হয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি তার গলায় সুরের বৈচিত্র দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

বেগম আখতার যেমন হিন্দী গজল এবং দাদরা গানের জগতে বৈচিত্র এনেছিলেন গলা ভেঙ্গে ভেঙ্গে গান গেয়ে ঠিক তেমনি শচীনদেব বর্মণও পল্লীগীতির ক্ষেত্রে ওই ধরনের

বৈচিত্র এনেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই আমি তার একজন ভক্ত ছিলাম। তিনি যখন তার সেই নিজস্ব ঢঙে পল্লীগীতি গাইতেন তখন মনে হত আমি যেন কোন গ্রামেই আছি, আমি সে গ্রামের মাটির গন্ধ পাচ্ছি, নদীর জলোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছি।

তবে একটা কথা বলতে দ্বিধা নেই, তিনি যখন কোন ওস্তাদের হিন্দী রাগ সঙ্গীতের বাংলা রূপান্তরগুলো নিজস্ব ঢঙে গাইতেন তখন আমার ঠিক ভাল লাগতো না।

শচীন কর্তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলকাতা বেতার কেন্দ্রে। হয়ত তার গুণমুগ্ধ হবার জন্যেই সুযোগ খুঁজছিলাম তার কণ্ঠকে ছায়াছবিতে ব্যবহার করার জন্যে। একদিন সেই সুযোগ এল। যতদূর মনে পড়ে মীরাবাঈ ছবিতে গান করার জন্যে স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তাকে এনেছিলেন। কিন্তু তারপরই সুগায়ক পাহাড়ী সান্যাল নায়ক হয়ে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করলেন, ফলে তিনি আর গান করার সুযোগ পেতেন না। এতে হয়ত তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন।

বোধহয় ১৯৪০-৪১ সাল, নিউ টকীজ কর্তৃপক্ষ 'নারী' নামে একটি ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন প্রফুল্ল রায়। আর প্রফুল্লদা ওই ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে।

ওই ছবিতে একটা গান গাইবার জন্যে আমি শচীন কর্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেই গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গানটি শুনতে শুনতে প্রতিটি দর্শক চোখের জল ফেলেছিল। গানটি হলো — 'কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়, হায় ধরণীর লাঞ্ছিতা মেয়ে, একি তোর পরাজয়!

আজ, এতদিন পরেও যখন শুনি তখন তন্ময় হয়ে ভাবি—

"তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি।"

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

[১৯০৯ সালে হুগলি জেলার পান্ডুয়ার কাছাকাছি সরাই গ্রামে জন্ম। বাবা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। মা প্রভাবতী দেবী। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক কৌতুকাভিনেতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নিধুবাবুর 'সখি কী করে লোকেরি কথায়' ও 'এতকি চাতুরী সহে প্রাণ' তাঁব গীত প্রথম রেকর্ড। ওস্তাদ বদল খাঁর ছাত্র ছিলেন। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের গানের কথায় ভীষ্মদেবের সুর গ্রহণ করেছিলেন (এঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে)। কানন দেবী, বেগম আখতার, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, শচীন কর্তা তাঁর ছাত্র ছিলেন। বহু বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। প্রচুর খ্যাতিলাভের পর সব ছেড়ে দিয়ে পন্ডিচেরি চলে যান। আট বছর থেকে ১৯৪৮ সালে আবার ফিরে আসেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি বাংলা রাগসঙ্গীতে বিস্ময়কর অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৭ সালে তিনি মারা যান।]

শচীন আমার কাছে এবং আমার গুরু বাদল খাঁর কাছে বেশ কিছুদিন তালিম নিয়েছিল। তালিম নেবার সময় তার নিষ্ঠা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীত সাধনা করে গেছে।

আমাকে সে চিরদিনই গুরু হিসেবে সম্মান করেছে। আমি অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে আর গুরুকে মনে রাখে না। কিন্তু শচীনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখেছি। জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত সে আমাকে গুরু বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে।

শচীনের সঙ্গে যে দিনগুলো কেটেছে সেগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিস্মৃতির

গভীরে তলিয়ে গিয়েছে। তবুও আজ তোমাদের অনুরোধে রোমন্থন করে কিছু সুখ-স্মৃতি স্মরণ করার চেষ্টা করছি।

আমি যখন কয়েকটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন শচীনকে আমার — সহকারী হিসাবে নিয়েছিলাম। আমার সুর দেওয়া কয়েকটা ছবিতে সে গানও গেয়েছে। পরবর্তী কালে শচীন নিজেও সঙ্গীত পরিচালক হয়েছে।

হঠাৎ একদিন পরিচালক সুকুমারকে নিয়ে শচীন আমার বাড়িতে এসে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ইনি হচ্ছেন আমার কর্তা। অর্কেষ্ট্রা আমার মাথায় অত ভাল ঢোকে না। তাই ব্যাকগ্রাউণ্ড আর টাইটেল মিউজিক ইনি করবেন।

পরে বম্বেতে গিয়ে শচীন অর্কেষ্ট্রাতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বম্বেতে কয়েকটি ছবির গানে খুব লঘু ধরনের সুর ব্যবহার করাতে কয়েকজন এসে আমাকে তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল বলল, শচীন এটা কি করছে!

আমি শুনে বললাম ওর এক্সপেরিমেন্ট এতদিনে সার্থক হয়েছে। আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম, সব সময় জানবে, ছবির মিউজিক বা গান ঘটনার পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। কোন ক্যাবারে নাচের মিউজিক হিসেবে যদি কোন সঙ্গীত পরিচালক সরোদ বা জয় জয়ন্তী রাগ ব্যবহার করেন তবে কি কোন দর্শক সেটা সহ্য করতে পারবে?

আজ আমি আমার একজন প্রিয় শিষ্যকে হারিয়ে গভীর শোকাভিভূত।

নারায়ণ চৌধুরী

[১৯২২ সালে কুমিল্লায় জন্ম। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা ও ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা করেছেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও তালিম নিয়েছেন। নানা প্রকৃতির কাজ করেছেন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় অর্ধশতক। ছয় খণ্ডে 'গান্ধী রচনাবলী' সম্পাদনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি ছিলেন। 'সঙ্গীত পরিক্রমা', 'ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অন্যান্য' তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৯৯১ সালে আমরা তাঁকে চিরকালের মত হারিয়েছি।]

অনবদ্য কণ্ঠশিল্পী শচীন দেববর্মণ আগরতলার রাজপরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ ছিলেন ত্রিপুরা রাজবংশের একজন বিশিষ্ট বংশাবতংস—সিংহাসনের অন্যতম ন্যায্য উত্তরাধিকারী। জনশ্রুতি এই যে, যৌবনে তিনি একবার বৈরাগ্যের আবেগে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যান। পরে সংসারে ফিরে এলেও সিংহাসনের প্রতি তাঁর দাবী আর গ্রাহ্য হয়নি। আপস-রফার সূত্র হিসাবে স্থির হয় যে, নবদ্বীপচন্দ্র দেববাহাদুর অতঃপর সন্নিহিত ব্রিটিশ ত্রিপুরার সদর কুমিল্লা শহরে গিয়ে বসবাস করবেন, তাঁর জন্য সেখানে জায়গীর, মোটা মাসোহারা ও প্রাসাদোপম অট্টালিকা-ভবনের সংস্থান করা হবে—আগরতলা রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর আর প্রত্যক্ষ যোগসূত্র কিছু থাকবে না।

সেই থেকে নবদ্বীপ বাহাদুর আমৃত্যু কুমিল্লায় জীবন অতিবাহিত করে গেছেন।

আগরতলামুখো তিনি আর কখনও হননি। এ একপ্রকার নির্বাসন বলা চলে। অবশ্য কুমিল্লা শহরেও ত্রিপুরা রাজবংশের প্রভাবের কিছু কীর্তি চিহ্ন বর্তমান ছিল। কুমিল্লা ছিল ত্রিপুরার রাজাদের ব্রিটিশ এলাকাস্থিত জমিদারী চাকলা-রোশনাবাদের সদর কাছারী—এখানে প্রতি বছর পুণ্যাহের দিনে বিপুল ঘটাপটা করে রাজকীয় খাজনা আদায়পর্ব সাধিত হতো। ছিল ত্রিপুরা প্যালেস, রাজকুঠি, আগরতলার বিগত রাজা ও রাণীদের স্মৃতিতে খনিত বিরাট বিরাট সব দীঘি—যথা, ধর্মসাগর, রাণীর দীঘি, নানুয়ার দীঘি ইত্যাদি।

শেষোক্ত নানুয়ার দীঘি ছিল শহরের একেবারে পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত বিশাল দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর যে রাস্তাটি দক্ষিণমুখো চলে গিয়েছে তারই সংলগ্ন অঞ্চলকে বলে চরথা। মুখ্যতঃ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। এই চরথাতেই ছিল শচীন দেববর্মণদের বাড়ী—প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা উদ্যানবেষ্টিত কুঠি। এই গৃহেই শচীনদেবের বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বসবাস আগে পর্যন্ত কুমিল্লাই ছিল তাঁর বিচরণ ও বিকাশের মূলক্ষেত্র।

শচীনদেবের পিতৃদেবকে জীবনে মাত্র আমি একবার দেখেছি। বোধহয় উদ্যোক্তাদের অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে একটি প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হতে রাজী হয়েছিলেন। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল গম্ভীর দর্শন, চিন্তাশীল, কতকটা বা বিষণ্ণ। পরে জেনেছিলাম বাইরে কোথাও তিনি বেরোন না, গৃহাভ্যন্তরে বেশীর ভাগ সময় জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট থাকেন। শহরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। ইংরেজীতে 'রেক্লুস' বলতে যে ধরনের ব্যক্তি বোঝায় তিনি ছিলেন সেই গোত্রের মানুষ।

কিন্তু সন্তানেরা সকলেই ছিল খুব মিশুক, হাসিখুশী, শহরের যে কোন উল্লেখযোগ্য বারোয়ারী কাজে আগ্রহী। শচীনদেবের কথাই ধরা যাক। যেমন গানবাজনায় তেমনি খেলাধূলায় চৌকস, টাউনহলের মাঠে টেনিস খেলায় একজন পয়লা নম্বরের খেলোয়াড়। পড়াশুনায়ও ভাল। মনোযোগী ছাত্র। অবসর সময়ে বাঁশী বাজান, তবলায় সঙ্গত করেন, মাছ ধরার ব্যতিক প্রচণ্ড। নিজে দেখিনি তবে শুনেছি শিকারেও ছিলেন রীতিমত সুদক্ষ একজন 'তীরন্দাজ'। কলকাতার জীবনেও মাছ ধরা এবং শিকার তাঁর ছিল অবসর-পূরণের একটা বড় উপায়।

এহেন শচীনদেব কিন্তু প্রথম বয়সে গাইয়ে ছিলেন না। বাঁশী বাজিয়ে হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি ছিল। অবশ্য 'আর বাঁশী' নয়, 'টিপরাই বাঁশী', যা ত্রিপুরারই নিজস্ব উদ্ভাবন ও এক বিশিষ্ট সম্পদ। তবলাতেও হাত ছিল চমৎকার। পরে কলকাতায় কলেজে পড়া কালে অনুরাগের ক্ষেত্র বদল করেন—বাঁশী থেকে কণ্ঠসঙ্গীতে চলে আসেন। শুধু তাই নয়, তখনকার প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছে প্রণালীবদ্ধ ভাবে গানের তালিম নিতে থাকেন। গান হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে শিল্পস্ফূর্তির প্রধান অবলম্বন।

শচীনদেবকে খুব কাছে থেকে দেখার আমার সুযোগ হয় আমার যখন বয়স তেরো কি চোদ্দ—আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্র। কুমিল্লা টাউন হলে 'সীতা' নাটকের অভিনয় হবে, শহরের সব সেরা অভিনেতা উকীল ব্রহ্মানন্দ নাগ (জুবিলী নাগ), সুশীল মজুমদার (পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ চিত্রপরিচালক), অজয় ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালের প্রখ্যাত গীতিকার) এঁরা সব নাটকে অভিনয় করবেন। কিন্তু নাটকটিকে কেন্দ্র করে শহরে চাঞ্চল্য জেগেছে সেইজন্যে নয়, আসল উত্তেজনার হেতু সীতা নাটকের বৈতালিকের ভূমিকায় গান গাইবার জন্য কলকাতা থেকে খোদ্ কৃষ্ণচন্দ্র দে আসছেন। সেই দরাজ গলার বিখ্যাত গায়ক, যিনি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' প্লেতে বৈতালিকের গানগুলি গেয়ে সেই সময় কলকাতা শহর মাত করে রেখেছিলেন—কথা কও কথা কও, অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে, জয় সীতাপতি সুন্দর তনু-এ সব গানের সুর তখন আকাশে-বাতাসে সঞ্চারিত ছিল, কে না সে সব সুর শুনে সেই কালে মুগ্ধ হতেন? নাটকটিতে এহেন কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং গান গাইবার সম্ভাবনায় শহরে হৈ-হৈ পড়ে গেল, ছোট্ট মফঃস্বল শহরের প্রাণস্ফূর্তির পল্বলে সমুদ্রের কল্লোল জাগল।

কৃষ্ণচন্দ্রকে কুমিল্লায় আনবার কৃতিত্ব শচীনদেবের। তাঁরই আমন্ত্রণে ও আতিথ্যে কৃষ্ণচন্দ্র কুমিল্লা এসেছিলেন। সীতা প্লেতে বনবালাদের কয়েকটি গান আছে—কোরাস গান—মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে, রূপসায়রে দোদুল-দোলা আলোর কমল ফুটল গো, ইত্যাদি। (সীতা নাটকের সব কটি গান হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা, বাদে 'কথা কও' যেটি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' বইয়ের মুখবন্ধ থেকে নেওয়া)। ওই সব বনবালার গান গাইবার জন্য আমাদের মত কয়েকটি কচিকাঁচা ছেলের ডাক পড়লো, যাদের গলায় কিছুটা সুর আছে বলে নাট্যকর্তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল। আমরা জনাকয় ছেলে কয়েকদিন কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে গানগুলির তালিম নিলুম। দেখতুম শচীনদেব সব সময়ই রিহার্সালে উপস্থিত কিন্তু নিজে কখনও মুখ খোলেন না, কণ্ঠ যোগ করেন না—আগাগোড়া চুপচাপ থেকে গুরুর যথার্থ অনুগত শিষ্যের ভূমিকা পালন করতেন।

যথাদিনে সীতা নাটক মহা সাড়ম্বরে অভিনীত হয়ে গেল। লোকের মুখে মুখে কৃষ্ণচন্দ্রের গানের প্রশংসা, অন্যান্যদের অভিনয়ের সুখ্যাতি। আমরা অকিঞ্চিৎকর কোরাস গাইয়ের দল—আমরাও প্রশংসার ভাগ থেকে বাদ পড়লুম না।....এইখানে একটি ক্ষুদ্র 'পোষ্টস্ক্রিপ্ট' যোগ করি। আমরা কেউ বনবালা সাজতে রাজী হইনি, তাই পরিচালকের কলমের এক খোঁচায় বনবালা বন-বালকে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলুম। কোরাসগুলি বন-বালকদের গান রূপে পরিবেশিত হয়েছিল।

সেই প্রথম শচীনদেবকে খুব নিকট সান্নিধ্য থেকে দেখা। তারপর তাঁকে আবার দেখলুম গানের জলসায়—এইবার আর নেপথ্যচারী রূপে নয়, মূল আকর্ষণের পাত্র হিসাবে। এইবার তিনিই নায়ক—আসরের মূল গায়ক। কুমিল্লার প্রখ্যাত অ্যাড্‌ভোকেট ও জননেতা

কামিনীকুমার দত্ত (পরে পাকিস্তান সরকারের আইন-মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারে অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল অজিতকুমার দত্তের পিতা) মহাশয়ের গৃহে গানের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। গান গাইবেন শচীন দেববর্মণ ও হিমাংশু দত্ত। আমরা সব শ্রোতার দল সার বেঁধে বৈঠকে হাজির। মনে আছে শচীনদেব প্রথম গান গাইলেন চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এই নয়ন পানে—নজরুলের প্রসিদ্ধ গজলগীতি। প্রথম গানেই তিনি আসর মাৎ করে দিলেন। সে যে কী সুরের সম্মোহন বলে বোঝাতে পারব না। আজও এই বৃদ্ধ বয়সে সেই গানের ভাল-লাগার স্মৃতি মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়। শচীনদেব সেদিন আরও কখানা গান গেয়েছিলেন, সেগুলির স্মৃতি আজ আর স্মরণ-পথে জাগরূক নেই কিন্তু তাঁর অপূর্ব সুরেলা, জোয়াড়ি-মিশ্রিত কণ্ঠে গাওয়া বাগেশ্রী ও পিলু রাগিণীর মিশ্রণে রচিত চেয়ো না সুনয়না'র সুর গুঞ্জরণের রেশ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। পরে ওই একই গান অন্য শিল্পীদের কণ্ঠে একাধিক বার শুনেছি, গ্রামোফোন রেকর্ডেও শুনেছি, কিন্তু ওই প্রথম শ্রুতির আনন্দ-রোমাঞ্চ পরবর্তী সব শ্রবণের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে।

সেদিন হিমাংশু দত্তও কয়েকটি গান গেয়েছিলেন—তার মধ্যে নিজের সুরারোপিত গান ছিল আবার অন্যবিধ গানও ছিল। অজয় ভট্টাচার্যের লেখা হাসুহানা আজ নিরালা ফুটিলি কেন আপন মনে গানটি এবং একটি মীরার ভজনের কথা আজও মনে পড়ে। হিমাংশু দত্ত মূলতঃ সুরকার, গায়ক নন। সুরসংযোজনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, যেজন্য দেশবাসী পরবর্তী কালে 'সুরসাগর' উপাধি দিয়ে তাঁকে ন্যায্যভাবেই সম্মানিত করেছিলেন। তবে যাকে বলে কণ্ঠশিল্পী তা তিনি ছিলেন না। এই কথাটি মনে রাখলে শচীনদেবের সঙ্গে প্রতিতুলনার দায় এড়ানো স্বতঃই সহজ হয়ে পড়ে।

এর কিছুকাল পরে—তখন আমরা স্কুলের দেউড়ি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি—শচীনদেবকে দেখলুম গ্রামোফোন রেকর্ডের কণ্ঠশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে। বউবাজার অঞ্চলের অক্রুর দত্ত লেনে স্থাপিত হিন্দুস্থান মিউজিকাল প্রোডাক্টস লিঃ থেকে পরের পর তাঁর গান অবিরল প্রবাহিত হতে লাগলো—সুরের স্বতোৎসার ঝর্ণাধারা থেকে নির্বাধ স্রোতের মত। ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই, কণ্ঠে তোমার দুলবে বলে, ও কালো মেঘ বলতে পারো, বঁধু এলো মধু রাতে, স্বপন না ভাঙে যদি, ফুলের বনে থাকো ভ্রমর, যদি দখিনা পবন, আলো-ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে, মম মন্দিরে এলে কে তুমি, নতুন ফাগুনে যবে, ঊষার উদয়-ক্ষণে, তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে, প্রিয় আজো নয় আজো নয়, আমি ছিনু একা, মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা, কে যাবি চল্ বৃন্দাবনে, প্রভাতে যাইও ফুলবনেরে ভ্রমরা, আমি রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল, বন্ধু বাঁশী দে মোর হাতেতে, মনদুখে মরিরে সুবল সখা ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে, মনের কথা কইবার আগে আঁখি ঝইরা যায়, প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে রয় না বাহিরে, পদ্মার ঢেউরে পদ্ম দিয়ে যারে, চোখ গেল চোখ গেল পাখিরে চোখ গেল, কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া, ইত্যাদি।

এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গান কাব্যগীতি পর্যায়ের, কিছু গান রাগ প্রধান, বেশ কিছু গান ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব ও ঝুমুর বর্গের, দু-একটি গান ভজন অঙ্গের। প্রথম দিকের গানগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত, পরে এক সময়ে অজয় ভট্টাচার্যের লেখা গানেই তিনি বেশি কণ্ঠ সংযোগ করেন। নাম-তালিকার শেষের তিনটি গানের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়াও কিছু ভিন্নজাতীয় গান আছে—যেমন, স্বপন দেখেছে গিরিরাণী (আগমনী), বিদায় দাও গো মোরে (বিজয়া), তাজমহল, প্রেমের সমাধি তীরে, বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে জোয়ার এসেছে আজ, সাজে নওল কিশোর চাঁদের তিলকে (শেষের চারটি সিনেমার গান), প্রভৃতি।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গীত পরিচালক রূপে বোম্বাই প্রবাসে স্থায়িভাবে আস্তানা গাড়বার আগে কলকাতা থাকা কালে গ্রামোফোন ডিস্কে যত গান তিনি গেয়েছেন তার প্রথম দিকের কয়েকটি গান লোকগীতি-ঘেঁষা, শেষের দিকের অনেক কটি গানই ভাটিয়ালি ও ঝুমুর বর্গের, কেবল মধ্যবর্তী পর্বে দেখতে পাই তিনি লোকগীতির সুরের এলাকা থেকে সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণ করে যাকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলে 'রাগপ্রধান' গান, ইংরেজীতে ক্লাসিকো-মর্ডান সঙ্স্, সেই জাতীয় গানের রূপায়ণে বিশেষ করে কণ্ঠকে নিযুক্ত করেছেন। এই অধ্যায়ের গাওয়া গানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, যদি দখিনা পবন ফিরিয়া আসে গো দ্বাবে (গান্ধার), মম মন্দিরে কে তুমি (আড়ানা), আলো-ছায়া দোলা (বাহার), নতুন ফাগুনে যবে (রাগেশ্রী), ঊষার উদয়ক্ষণে (জয়জয়ন্তী), ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম তিনটি গানের বাণী অজয় ভট্টাচার্যের, শেষের দুটি গানের রচয়িতা 'যাযাবর'-খ্যাত বিনয় মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পাঁচটি গানেরই সুর হিমাংশু দত্তের দেওয়া। শচীনদেব সেই সব সুরে কণ্ঠসংযোগ করেছিলেন মাত্র। অপূর্ব সেসব গানের সুর আজও আমাদের কানে লেগে রয়েছে। কথা, সুর ও কণ্ঠের সে এক ত্রিবেণী সঙ্গম।

শচীনদেব মুখ্যতঃ ত্রিপুরার আকাশে -বাতাসে সঞ্চরমাণ তথা পূর্ববঙ্গের জল-হাওয়ার সঙ্গে অবিমিশ্র ভাবে যুক্ত ভাটিয়ালির ঐতিহ্যের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় গায়ক হলেও কেমন করে রাগসঙ্গীতেও প্রায় সমান দরের কুশলতা অর্জন করলেন? এর একটা কারণ এই যে, তিনি প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র দে পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একাদিক্রমে অনেক বছর রাগসঙ্গীতের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ছিলেন। কিন্তু সেটাই বোধকরি একমাত্র কারণ নয়। অন্যতর কারণ এই যে, তিনি যথার্থ গোত্রের অর্থাৎ সত্যিকারের একজন কণ্ঠশিল্পী ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে রাগসচেতনতা এবং লৌকিক সুরমনস্কতার এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় সাধিত হতে পেরেছিল। আমি আমার এক পূর্ববর্তী রচনায় (লেখক সমাবেশ, ১৫ নভেম্বর ১৯৮০) দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের দুই আসল মৌলিক সুররূপ হলো রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত। বাদবাকী সব সঙ্গীত হলো মিশ্র সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত, সেসব খাঁটি সঙ্গীত নয়। শচীনদেবের কণ্ঠে রাগসঙ্গীত আর লোকসঙ্গীতের সার্থক যুগ্ম মিলন সাধিত

হয়েছিল। এইটেই হচ্ছে আদর্শ মিলন। ফলে তিনি যখন রাগপ্রধান গান গাইতেন সুরবিস্তারের কৃতিত্ব প্রদর্শন করা ছাড়াও কণ্ঠে ভাটিয়ালির ঐতিহ্য থেকে পাওয়া সুরের সবটুকু মিষ্টত্ব ও মোহনিয়া ভাবটুকু ঢেলে দিতে পারতেন। সুরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিলন হতো সুরের মাধুর্যের। আবার যখন ভাটিয়ালি দেহতত্ত্ব বর্গের গান গাইতেন, সাধা আর মাজা গলায় গাইতেন বলে তাঁর গানের আবেদন হতো একেবারে অন্যরকম— প্রচলিত ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া-জারি-সারি গায়কদের পরিবেশনা-রীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মাজা গলায় ভাটিয়ালি গান— তার স্বাদই ভিন্ন।

সাধা গলায় আর আ-সাধা গলায় লোকগীতি গাইলে তার আবেদনের কী তারতম্য হতে পারে তা শচীনদেব আর আব্বাসউদ্দিন আহম্মদের গান পাশাপাশি মিলিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়বে। বোধগম্য কারণেই প্রসঙ্গটিকে আমি আর বিস্তার করতে চাইনে।

তা বলে কি শচীন দেববর্মণ রাগসঙ্গীতের একজন সিদ্ধশিল্পী ছিলেন? তেমন কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে। বেঁচে থাকলে শচীনদেব নিজেই এই দাবীর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করতেন। রাগসঙ্গীতের সাধনা একটি জীবনব্যাপী সাধনা, তাতেই সর্বক্ষণ একনিবিষ্ট হয়ে থাকতে হয়। গোটা জীবন তাতে তদ্‌গতচিত্ত ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকলে তবে যদি রাগসঙ্গীতের সমৃদ্ধ মণিমঞ্জুষার কিছু রত্নের শুলুক-সন্ধান মেলে। চরাচর ব্যাপী তরঙ্গায়িত নাদরূপী সুর প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে হলে, মেশাতে হলে স্বীয় জীবনটাকেই একটা অখণ্ড সুরের ধ্যানে রূপান্তরিত করতে হয়। তেমন অবসর শচীনদেব নিজের জীবনে কই আর পেলেন? সত্যি বটে শচীনদেব বেশ কয়েক বছর ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নাড়া বেঁধে ওস্তাদি গানের তালিম নিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে ভীষ্মদেবের ওস্তাদ শতাধিক বছর বয়স্ক বৃদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়ক বাদল খাঁ সাহেবেরও সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তা হলেও রাগসঙ্গীত শিক্ষায় তিনি ততটা মনোযোগ দিতে পারেননি যতটা মনোযোগ দিলে এই ক্ষেত্রে তিনি একজন দুর্ধর্ষ রাগসঙ্গীতশিল্পী হয়ে উঠতে পারতেন। তাঁর মূল মনোযোগ ছিল কাব্যগীতি, রাগপ্রধান এবং লোকসঙ্গীতের সুচারু ও সুষ্ঠু কণ্ঠ-অভিব্যক্তির উপর। এবং প্রত্যাশিত ভাবে এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর ন্যায্য সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

ভীষ্মদেবের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার কালে আমি ওই প্রক্রিয়ার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলুম। কেননা ওই পর্বে অন্য একাধিক সঙ্গীত শিক্ষার্থীর মত আমি ভীষ্মদেবের বাড়ীতে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। গান কতদূর কী শিখেছিলাম বলতে পারব না, তবে প্রাণ ভরে কয়েক বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রস আহরণ করেছিলাম এইটুকুই শুধু স্মৃতির সঞ্চয়ে অক্ষয় হয়ে আছে। ভীষ্মদেব শচীনদেবকে একটা বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। দেখতাম শচীনদেব যেদিন আসতেন সেদিন আর নীচের সঙ্গীত শিক্ষার আসর বেশিক্ষণ চলতো না। ভীষ্মদেব তাড়াতাড়ি ক্লাস ছুটি দিয়ে শচীনদেবকে নিয়ে দোতলায় চলে যেতেন এবং একান্তে তাঁকে

তালিম দিতেন। এরকম একাধিক দিন হতে দেখেছি। তাতেই বুঝেছিলাম কণ্ঠশিল্পী হিসাবে শচীনদেবের প্রতি ভীষ্মদেবের সম্ভ্রমের গভীরতা। গায়ক হিসাবে শচীনদেবের একটা আলাদা দাম ছিল ভীষ্মদেবের চোখে।

তার মানে এ নয় যে, ভীষ্মদেবের অন্যান্য কতিপয় অগ্রসর ছাত্রের চেয়ে শচীনদেবের রাগসঙ্গীতে কণ্ঠের কৃতিত্ব বা নৈপুণ্য বেশি ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী (কুমিল্লা), ভোলা সেন, জীবন উপাধ্যায়, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন চট্টোপাধ্যায় (ভীষ্মদেবের আত্মীয়) এঁরা সব স্বরবিজ্ঞান ও রাগবিস্তারের কুশলতায় নিশ্চিত শচীনদেবের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু শচীনদেবের মত কণ্ঠের জাদু ওঁরা কোথায় পাবেন? তার যে কোন তুলনাই চলে না। শচীনদেবের কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেতারে যেমন মূল আওয়াজের পাশে একটা জোয়াড়ির আওয়াজ সর্বক্ষণ বাজতে থাকে, তেমনি শচীনদেবের কণ্ঠে মূল সুরের সমান্তরালে একটা ভাঙা কিন্তু অপূর্ব মাধুর্যময় সুর সমস্বরে রণিত হতে থাকে। এতে তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন জাদু খেলে যায়। পাশাপাশি দুই স্বরের এমন সমান্তরাল অথচ খাপে-খাপে-মিশে যাওয়া সহাবস্থান হাজারে একটি গায়কের বেলায় চোখে পড়ে। এই দুটি আওয়াজ যদি বিষম হতো তো কেলেঙ্কারি হতো, কণ্ঠ বেসুরে খেলতো। কিন্তু তা তো নয়, শচীনদেবের কণ্ঠে জোয়াড়ির সুরটি মূল সুরের সঙ্গে ব্যবধান রক্ষা করেও বরাবর এক সুরে 'রা' কাড়তো—তাইতে শচীনদেবের গলা থেকে যেন মধু ঝরতো। এরকম কণ্ঠসম্পদ বহু ভাগ্যে মেলে—দৈবের উপর বিশ্বাস না রেখেও এমনতর ভাগ্যকে দৈব অনুগ্রহ বলে চিহ্নিত করতে মন প্রলুব্ধ হয়। তথাকথিত ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ বুঝি একেই বলে।

কিন্তু এই কণ্ঠের যেমন অসামান্য শক্তির দিক আছে তেমনি কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ দুর্বলতা। সব রাগ-রাগিণী এ-জাতীয় কণ্ঠে খোলে না। যেমন ভৈঁরো, টোড়ী, ললিত, দরবারী কানাড়া, শ্রী, পরজ, মার্বা, পুরিয়া, ইমন, সারং প্রভৃতি ভারী রাগ এই কণ্ঠের তেমন উপযোগী নয়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মধুর রাগিণী সকল, যথা, ভীমপলশ্রী, কাফি, সিন্ধু, তিলক-কামোদ, পিলু, খাম্বাজ, গারা, পটদীপ, ধানী, মাঁঢ, পাহাড়ী, বিহারী, ভৈরবী প্রভৃতি এই ধরনের কণ্ঠে খুবই জমে। এগুলির মধ্যে একটা wailing বা ক্রন্দনপরতার ভাব আছে, যথা ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, পটদীপ, পিলু-খাম্বাজ, পাহাড়ী, মাঁঢ প্রভৃতি—সেসব যেন এই কণ্ঠে আরও বেশি খোলতাই হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শচীনদেব গ্রামোফোন রেকর্ডে যত কাব্যগীতি গেয়েছেন তার বেশির ভাগই এই সব হাল্কা রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে রচিত। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি বিশেষ গানের নামোল্লেখ করতে চাই। যেমন, স্বপন না ভাঙে যদি, ও কালো মেঘ বলতে পারো, তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে, গোধূলির ছায়াপথে যে গেল চিনি গো তারে, প্রিয় আজো নয় আজো নয়, মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা, কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া, প্রেম যমুনারি তীরে প্রভৃতি। শচীনদেব সংকলিত 'সুরের লিখন'-বইয়েও এ-জাতীয় গানেরই

সংখ্যাধিক্য। এর কারণ আর কিছু নয়, এই সব গানের সুরের সঙ্গে তাঁর গলার প্রকৃতির সহজাত মিল আছে। পূর্বোল্লিখিত রাগ-রাগিণীর সুরের বাঁধুনির মধ্যে যে-কান্নার ভাবটি আছে তা তাঁর ভাটিয়ালি-সারি গাওয়া কণ্ঠের ক্রন্দনাকুলতার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়। এই কারণেই তিনি কণ্ঠরূপায়ণের বেলায় বারে বারে এই সব হাল্কা অথচ পেলব-মধুর রাগ-রাগিণীগুলির দ্বারস্থ হয়েছেন, এগুলির প্রতি বারবার তাঁর সুস্পষ্ট পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয়েছে। ভাটিয়ালির সুর আর এ সব সুরের মধ্যে কোথায় যেন একটা গোত্র-সাযুজ্য আছে। এই সাযুজ্যই তাঁকে ফিরে ফিরে এই সব সুরভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

শচীনদেবের কলকাতা বাসের প্রতিটি পর্বের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল—তাঁর গৃহে যাতায়াত ছিল। প্রথমে থাকতেন তিনি রাজা বসন্ত রায় রোডে, সেটা তাঁর সংগ্রামী পর্বের কাল। সবেমাত্র কলকাতার সঙ্গীতামোদী মহলে নিজের কণ্ঠমাধুর্য প্রসাদাৎ আস্তে আস্তে আপন বিশিষ্ট সম্মানের স্থানটি অধিকার করে নিতে আরম্ভ করেছেন। তারপর বেশ কিছুটা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা মিলতে উঠে এসেছেন হিন্দুস্থান রোডে। ততদিনে তিনি সংসারী হয়েছেন—বিবাহ করেছেন তাঁরই ছাত্রী কুমিল্লা জিলার কন্যা সুগায়িকা শ্রীমতি মীরাকে। এই গৃহে অনেক দিন ছিলেন। তারপর বোম্বাই থেকে ডাক আসতে তিনি কলকাতার বাস উঠিয়ে সঙ্গীত পরিচালক রূপে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদান করেন এবং তদবধি বোম্বাই শহরেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন — কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের পূর্বের যোগ আর ছিল না। বস্তুতঃ বোম্বাই প্রবাসের কাল থেকেই শচীনদেবের সঙ্গে আমাদের সংযোগসূত্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং এক সময়ে কার্যতঃ ছিন্ন হয়।

কণ্ঠশিল্পের মায়া কাটিয়ে সিনেমার হাতছানিতে বোম্বাই প্রস্থান শচীনদেবের শিল্পী জীবনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল বলে আমি মনে করি। সেটা শুধু তাঁর নিজের পক্ষেই দুর্ভাগ্যজনক হয়নি, বাংলার গানের জগৎ তাঁকে হারিয়ে রীতিমত দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। ওই ক্ষতি আর পরে পূরণ হয়নি। বোম্বাই গিয়ে শচীনদেবের আর্থিক ভাগ্য খুলে গিয়েছিল, প্রচুর বিত্ত তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু ওই বিত্তের পথে আমাদের চিরপ্রিয় সুরের দুলাল অসামান্য কণ্ঠশিল্পী শচীনদেব অন্তর্ধান করেছিলেন। লক্ষ্মীর ভাগে যে লাভ জমা পড়েছিল, ঠিক ততটাই পরিমাণ রিক্ততা সরস্বতীর ভাগে দেখা দিয়েছিল। এক ঠাঁইয়ের পূর্ণতা অন্য ঠাঁইয়ের শূন্যতার কারণ হয়েছিল।

এ কথা যে নিতান্ত কথার কথা নয়, তার প্রমাণ এমনতর ক্ষোভ শুধু আমার মনেই জাগেনি, খোদ্ শচীনদেবের মনেও জেগেছিল। শচীনদেব একবার বোম্বাই প্রবাস থেকে ছুটি কাটাতে কলকাতা ফিরে এসেছেন, উঠেছেন গড়িয়াহাট ব্রিজের নীচে তাঁর নবনির্মিত সুরম্য ভবনে। তাঁর সঙ্গে এক সকালে দেখা করতে গেছি। সকলের সঙ্গে দেখা হলো। শ্রীমান রাহুল তখন খুবই ছোট্ট শিশুটি—এই প্রথম ওকে আমি দেখলুম। দোতলার ড্রয়িং রুমে বসে এ কথা সে কথার পর শচীনদেব এক সময়ে গভীর বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,

"ভাই নারান, তোমরা যে-শচীন 'কর্তা'কে (আগরতলার রাজপরিবারের সন্তানদের 'কর্তা' বলা রীতি ছিল—সামন্তযুগীয় প্রথার স্মারক তবে ব্যবহারে ব্যবহারে তার সামন্তযুগীয় প্রভুত্বের অনুষঙ্গ লোপ পেয়ে গিয়েছিল) জানতে, সেই শচীনকর্তার মৃত্যু ঘটেছে। বম্বের ছবির জগতে গিয়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা হয়েছে ঠিক, কিন্তু যে-কণ্ঠশিল্পী শচীনকর্তাকে নিয়ে তোমরা গর্ব করতে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।"

আমি অস্বস্তিকবলিত হয়ে ভদ্রতা-সূচক তাঁকে কিছু একটা বলতে যেতে তিনি আমার হাত চেপে ধরে পুনরায় বললেন, "না না নারান, এ আমার মন-রাখা কথা নয়, একেবারে খাঁটি অন্তরের কথা। আজ যদি কেউ আমাকে কলকাতা থেকে প্রস্তাব করে পাঠাতো, 'তোমাকে পাঁচশো টাকা করে মাসোহারা দেব, তুমি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসো, আমি তন্মুহূর্তে বোম্বাইয়ের তল্পীতল্পা গুটিয়ে কলকাতা চলে আসতুম—আবার সেই পুরনো দিনের মত গানে গানে মেতে উঠতুম। গায়ক শচীনদেবের পাশে সিনেমার মিউজিক ডাইরেক্টর 'এস. ডি. বর্মন' কিছু নয়, কেউ নয়।"

একেবারে খাঁটি শিল্পীর মত কথা। সরল, অকপট, নিরভিমান এক শিল্পী। কিন্তু আমরা জানি বাস্তবে এই সদিচ্ছার বিশেষ কোন দাম নেই। এমনতর সদিচ্ছা প্রায়শঃ কার্যে পরিণত হয় না, শচীনদেবের জীবনেও হয়নি। আমাদের সকলেরই জীবনে এমনতর মহৎ ইচ্ছার বুদ্বুদ কখনও কখনও যে উত্থিত না হয় এমন নয়, কিন্তু বাস্তব জীবনের দাবী এত কঠিন-কঠোর হৃদয়ে লীন হয়ে যায়। তাই বলে কি শচীনদেব আমি যে-কথা শুনতে পেলে খুশী হই তেমন কথা বলে আমার মন রক্ষা করতে চেয়েছিলেন? মোটেই নয়। এমনতর কৃত্রিমতা তাঁর স্বভাবের বহির্ভূত ছিল। তিনি সেই মুহূর্তে তাঁর অকপট মনোভাবকেই ভাষা দিয়েছিলেন। ব্যক্তির ইচ্ছার তুলনায় পরিবেশের প্রভাব আরও অনেক বেশি অমোঘ আরও অনেক বেশি অলঙঘ্য। এখানেও সেই একই নিয়ম কার্যকর হয়েছিল।

কিন্তু বৈশ্যতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে শিল্পতান্ত্রিক মনোভাবের কখনও কি চূড়ান্ত বা চিরন্তন পরাভব ঘটতে পারে? কদাচ নয়। আজ যে শচীনদেব বর্মণকে আমরা স্মরণ করছি তিনি এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পী, আমাদের হৃদয়পটে তাঁর অবিনশ্বর গায়ক রূপ উজ্জ্বল মূর্তিতে অঙ্কিত, ওই মূর্তির পাশে তাঁর অন্যবিধ মূর্তি—তার যতই বহিঃছটা থাকুক—নিষ্প্রভ। কণ্ঠশিল্পী শচীন দেববর্মণ আমাদের স্মৃতিতে চির-ভাস্বর হয়ে রইলেন।

সুরেশ চক্রবর্তী

[১৯১৫ সালে কুমিল্লায় জন্ম। বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও গায়ক ছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দীর্ঘকাল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেন। বদল খাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। অমিয়নাথ সান্যালের সাথেও প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায়। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, ফারসি ও মারাঠি ভাষা জানতেন। রসায়নশাস্ত্রে এম. এসসি পাশ করে ১৮ বছর গুডইয়ার কোম্পানিতে উঁচুপদে কাজ করেন। সঙ্গীতবিষয়ক প্রচুর নিবন্ধের রচয়িতা। বদল খাঁর জীবন নিয়ে 'সুধাসাগর তীরে' ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জীবন নিয়ে 'স্মরণ বেদনার বরণে আঁকা' গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

... কোনও এক সময় ভীষ্মদেবের আশ্রয় নিয়েছিলেন অন্য আর এক রাজকুমার, যদিও সিংহাসনের অধিকার ছিল না তাঁর। কুমার শচীন দেববর্মণ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজবংশীয় তরুণ যুবক, সংগীতপিপাসার নিবৃত্তির জন্য কলকাতায় বাস করতেন আর অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে শিক্ষা নিতেন। শচীনবাবুরা, যাঁরা রাজবংশের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত, তাঁরা "কর্তা" নামেই অভিহিত হতেন। তাই 'শচীন কর্তা' নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন বোম্বাইতে সুর-শিল্পী হিসাবে চিত্রজগতে যোগদান করেন, তাঁরা নামটাকে আরো আধুনিক করে নিল ; এস্ ডি বর্মণ, বোধহয় উচ্চারণের সংক্ষিপ্ততা ও সুবিধার জন্য। মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুমার শচীন দেববর্মণ এস. ডি বর্মণ বলেই পরিচিত ছিলেন সমস্ত ভারতে।

শচীনবাবুর পিতা ছিলেন মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ—ইনি রাজ্যের সর্বাপেক্ষা

সম্মানিত প্রতিভূ ছিলেন—প্রেসিডেন্ট, কাউনসিল অফ স্টেট। ত্রিপুরার মহারাজা যখন রাজ্যের বাইরে থাকতেন, রাজ্যর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর ওপরই থাকত। শচীনবাবুর দাদা, ক্যাপ্টেন প্রিন্স প্রফুল্লকুমার দেববর্মণ ছিলেন মহারাজার মিলিটারী সেক্রেটারি এবং প্রায় নিত্যসঙ্গী। নবদ্বীপচন্দ্রের সঙ্গে আমার পিতার খুব সৌহার্দ্য ছিল, কিন্তু আমরা অল্প বয়সেই পিতৃহীন হওয়াতে তাঁর কাছে যেতে বেশ সংকোচ ও ভয় হত। সেই সঙ্গে শচীনবাবুদেরও কুমিল্লায় দেখেছি, কিন্তু আমাদের কিশোর বয়সে তার সঙ্গে সখ্যতা বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার মতো সহস ছিল না। সেই পরিচয় গভীরতর ও অন্তরঙ্গ হল কলকাতায় এসে, বেশ কিছুদিন পরে,—তখন আমি এখানে কলেজে ভর্তি হয়েছি। শচীনবাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হল কলকাতার এক সংগীতচক্রের মাধ্যমে। লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে গোলাম মহম্মদ টেলার্স-এর দোকানের ওপরে ছিল বিখ্যাত দন্তচিকিৎসক ডাঃ এস্ কে মজুমদারের চেম্বার। কোনও কোনও শনিবারের কর্মবিরতির অবসরে সেখানে গানবাজনা মহফিল বসত, নাম বোধহয় ছিল—'আসর'। আমি তো নবাগত, প্রবেশাধিকার লাভের কথাই ওঠে না। কিন্তু বর্তমান কলকাতার প্রসিদ্ধ শিশু-চিকিৎসাবিশারদ ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস ছিলেন আমাদের পারিবারিক 'ছোড়দা'—তিনি এই আসরে মাঝে মাঝে কৃপা করে আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। সেই সন্ধ্যায় ছিল শচীন কর্তার গান আর পরে তিমিরবরণের সরোদবাদন। ছোটখাট, অথচ বেশ সম্ভ্রান্ত আসর,—সকলেই রুচিশীল শ্রোতা আর রসিক।

শচীন কর্তা যথাসময়ে উপস্থিত হলেন,—সাদা পাঞ্জাবী ও ধুতি পরে। সব সুর, তবলা মিলিয়ে নিয়ে উনি প্রথমে গাইলেন,—'বাহার-রাগে'র দ্রুত একতালার গান—"আলোছায়াদোলা"—কার সুর তখনো জানি না, কিন্তু ভারী জমাটি গান বিশেষত আমার খেয়াল ভালো লাগা মনে এই গানটির বন্দিশ্ সুরের গঠন, সব কিছুই একটা অপূর্ব অনুভূতি এনে দিয়েছিল। অত ভিড়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না, তবে একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম যে শচীন কর্তা তখন পালিত স্ট্রীটে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে একাকী একটি ভৃত্য নিয়ে বাস করেন। পরদিন প্রত্যুষে উঠে খুঁজে বার করলাম, পালিত স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাট,—কর্তা তখন একটা গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গ বহুদিন করেছি। কিন্তু রাজপুত্র সুলভ অহমিকা বা পোশাক-পরিপাট্য কখনো দেখিনি—সাধারণ, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বেশেই থাকতেন, ফরমালিটির বালাই তখন ছিল না। আমি নমস্কার করে তাঁর সামনেই নীচে পাতা শতরঞ্জির ওপর বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে, কোথায় থাকি আর কেনই বা এসেছি। আমার বাড়ী কুমিল্লায় শুনে খুব আগ্রহান্বিত হলেন, আর যখন আমি জানালাম যে আমি ভীষ্মদেবের কাছে সংগীতশিক্ষা করছি, তখন আরো উৎসাহিত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, এক কাপ চা-ও এই সঙ্গে পাওয়া গেল।

আমি বললাম, কাল যে বাহারের গানটি আপনি গাইলেন, ওটা কার সুর বা রচনা?

বড়ো ভালো লেগেছিল সুর ও ছন্দের দোলা এবং একটা নতুন আমেজ পাওয়া গেল। শচীনবাবু বোধহয় ভাবেননি এক অজাতশ্মশ্রু কিশোরের কাছে সুর-ছন্দের পরিচয় বা স্বীকৃতি শুনবেন, তাই একটু আশ্চর্য হয়েই বললেন,—সে কী তুমি শোনোনি—এটা তো অজয় ভট্টাচার্যের লেখা আর সুর দিয়েছে হিমাংশু দত্ত। বেশ কঠিন লয়ের প্যাঁচ আছে গানখানায়। আমিও সব কথা শুনে বিস্মিত বোধ করলাম,—কারণ অজয়দার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলেও হিমাংশু দত্তের সঙ্গে তখনো কোনও ঘনিষ্ঠতা বা জানাজানি হয়নি। হিমাংশুবাবু বেশির ভাগ সময়েই কলকাতায় থাকতেন, তাই আমরা ছাত্র বয়সে কুমিল্লায় তাঁকে কাছে পেতাম না—তিনিও একটু দূরত্ব রেখেই চলতেন। পরে অবশ্য খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে, সুবোধ পুরকায়স্থ (যিনি প্রথমে হিমাংশুবাবুর জন্য গান রচনা করেন) আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—সুবোধবাবুর ছোট ভাই সুনির্মল আমার সঙ্গেই স্কুলে পড়ত।

অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে কর্তাকে বললাম যে, এই গানটা কি আমাকে শিখিয়ে দেবেন? প্রথম দিনের আলাপেই এতখানি সাহস দেখে কর্তা বোধহয় একটু চমকিতই হয়েছিলেন, কিন্তু আপত্তি করলেন না,—গানটা লিখে নিয়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে যখন এক সময় মনে হল বোধহয় সুরটা ও ছন্দবৈচিত্র্য ধরতে পেরেছি, তখন আমি নমস্কার জানিয়ে পরের সপ্তাহে আবার আসব বলে চলে এলাম। শুধু পরের সপ্তাহেই নয়,—এই যে তাঁর সঙ্গে অসমান-বয়সের মৈত্রীর সূচনা হল, সেটা বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং নানাভাবে আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি। কলকাতায় বাস ছেড়ে বোম্বাই প্রবাসে চলে যাবার পরে আর বেশি দেখা হয়নি,—আমিও কর্মজীবনে প্রবেশ করে সংগীতের বহু বিস্তৃত নানা রকম যোগসূত্র আর রাখতে পারিনি,—শুধু ভীষ্মদেবের সাহচর্য এবং সান্নিধ্যেই সংগীতের পরিশীলন হয়েছে। শচীন কর্তা যখন পরে এসে ভীষ্মদেবের শিক্ষার পরিধিতে যোগদান করেন. আমার পূর্বপরিচিতি ও-বাড়ীতে অনেক কাজে লেগেছিল। রাজবংশের সন্তান বলে ভীষ্মদেব ওঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং বয়ঃ-কনিষ্ঠ বলে পদধূলি নিতেও দিতেন না। মাঝে মাঝে কর্তার বাড়ীতে গিয়েই তালিম দিতেন এবং নিজের বাড়ীতে এলেও ভীষ্মদেব তাঁর নিভৃতি ও প্রায়-একাকী তালিমের ব্যবস্থা করতেন। 'প্রায়' বলছি এই জন্য যে আমি এই শিক্ষার সময়ে উপস্থিত থাকতাম. শচীনকর্তা চাইতেন যেন আমি থাকি, আর থাকত সুবোধ দাস (কেষ্ট) নামে কুমিল্লার এক তবলচী—সে মসীত খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করত।

ভীষ্মদেবের চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি,—সাধারণ শিক্ষায় বা বুদ্ধিতে তার সামঞ্জস্য অনেক সময় পাওয়া যেত না, কিন্তু আশৈশব একটা বিচ্ছিন্ন জীবনধারায় তাঁর লালন হয়েছিল, তার প্রকাশে হয়ত অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন, স্পর্শকাতর মনে কোনও আঘাত লাগলে, সেই ব্যথা বা অপমান নিঃশব্দে সহ্য

করে গিয়েছেন, কোনও বহিঃপ্রকাশ বা চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যেত না। হয়ত কোনও অসতর্ক ও নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কোনও অনুগত ভক্তজনের কাছে দুঃখ করেছেন, তার বেশি নয়। সুতরাং তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা বেশিই ছিল, কেননা যাঁর সম্বন্ধে অভিমান বা দুঃখ, তাঁকে স্পষ্ট করে বলা, তিরস্কার করা বা কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। এই অন্তর্মুখিনতা আরো বেশি হয়েছিল পণ্ডিচেরী থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, তাই তাঁর জীবন, আচার-ব্যবহার, সংগীত ও ধ্যানমগ্নতা নিয়ে বহু রহস্য জড়িত হয়েছিল, সম্ভব-অসম্ভব জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছিল, তার জট ছাড়াবার চেষ্টা তো তিনি কখনো করেননি, কাউকে করতেও উৎসাহ দেননি। এই সব জনরব "স্নোবলিং এফেক্ট্"-এ শেষকালে সব কিছু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাত্রার বাইরে চলে গিয়েছিল,—কেউ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে সংক্ষেপে বলতেন—"ওরা কিছু জানেও না, বোঝেও না, আর বুঝতেও চাইবে না।" অতএব অমূলক কল্পনার পাখায় ভর-করা কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল,—যিনি এই সব সত্যাসত্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারতেন, তিনি সম্পূর্ণ নিঃশব্দ ও নির্বিকার থেকেই চলে গিয়েছেন।

একদিন কাহিনীর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে—আমি নিজেই সেদিন সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যাপারটা আজ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমরাই তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শচীন কর্তা সেবার এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে গাইতে যাবেন স্থির করেছেন এবং খেয়াল-অঙ্গে গঠিত একটা বাংলা গান পরিবেশন করবেন। চয়ন করেছিলেন অজয় ভট্টাচার্যের লেখা আর হিমাংশু দত্তের সুরারোপিত গান—"যদি দখিনা পবন, আসিয়া ফিরে গো দ্বারে।" কর্তার খুব ইচ্ছা যে গানখানি সাধারণ বাংলা গানের ঢঙ্গে না গেয়ে একটু খেয়ালী ঢঙ্গে গান করা, এমনভাবে যে তান-বাঁটবাহুল্যে যেন মূল রসটির ব্যাঘাত না ঘটে, অথচ ভারতের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও বিদগ্ধ গুনিজন একে যথার্থ পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্বীকৃতি দান করেন। তাই তাঁর তখনকার সংগীত গুরু ভীষ্মদেবের কাছে প্রার্থনা জানালেন গানখানি পুষ্পমঞ্জরীর শোভায় যেন সজ্জিত করে দেন। ভীষ্মদেবও স্বীকৃত হলেন আর একদিন সকালে তাঁর গৃহে সেই শিক্ষার সভা বসলো। প্রাত্যহিক প্রার্থী আমি তো আছি-ই, তাছাড়া সেই সময় শচীনকর্তার সঙ্গে সঙ্গত করত কেষ্ট, (সুবোধ দাস) সেও যথাসময়ে উপস্থিত হল। অবশ্য সেদিন যে শুধু বাংলা গানটিই হয়েছিল তা নয়,—প্রথমে কর্তার তালিম হল লঙ্কদহন সারং (বা হরিদাসী সারং)-এর বিখ্যাত খেয়াল 'এরি মাঈ পিয়া' দিয়ে। ভীষ্মদেবও গাইছেন, কর্তার হাতে তানপুরা আর আমি অন্য পার্শ্বে হারমোনিয়াম ধরেছি। বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত সারং-এর তালিম-ই চলছে,—অকস্মাৎ ভীষ্মদেব বললেন,—"আপনারা গান করতে থাকুন, আমি একটু ভিতর থেকে আসছি।" বেশিক্ষণ বিলম্ব হল না, ভীষ্মদেব গানের ঘরে ফিরে এলেন, আর বললেন, যে "আজ তো গান শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে যাবে,—আমি মাংস আনতে দিয়েছি। অনেক কিছু আড়ম্বর হবে না, শুধু ডাল, ভাজা ও মাংস—আশা করি রাজপরিবারের লোক হিসেবে একে তুচ্ছ করবেন না।

সুরেশ ও কেষ্ট তো আমার ঘরেরই লোক, শুধু আপনার জন্যই সংকোচ হচ্ছিল।" শচীনকর্তা খুব লজ্জিত হলেন,—বললেন, "আমি তো আমার ভৃত্যের ওপর নির্ভর করে থাকি—এতো বেলায় ফিরে গিয়ে যে কী খাব, তা ভাবতেই মন খারাপ লাগছিল। মাংস ও ভাত তো আমার পক্ষে প্রচুর হবে,—তাছাড়া গুরুগৃহে ভোজন তো বহু ভাগ্যের কথা। আমাদের কাছে আপনার সঙ্গে বসে আহার করাই অমৃততুল্য মনে করব।"

মাংস আনতে পাঠিয়ে ভীষ্মদেব এবার বাংলা গানটা নিয়ে তালিম শুরু করলেন—গানটা তাঁর জানা ছিল না, কিন্তু কর্তা একবার গাইতেই সুর ও মাধুর্য যেন কণ্ঠে তুলে নিলেন। জৌনপুরীর সঙ্গে শুদ্ধ গান্ধার মিশ্রণে গানটির এক অপরূপ শোভা ফুটে উঠেছিল—আবার দুই ধৈবতের স্পর্শে আরো ফুলঝুরির মত বাহার খুলে গেল। কুন্দনলাল সায়গলের একখানা গান রেকর্ডে ছিল—'ঝুলন ঝুলা'—তার ছকেতেই সামান্য অদল বদল করে হিমাংশু দত্ত গানটিকে সাজিয়েছিলেন ; ভীষ্মদেবের কণ্ঠে ও সুরের সুধায় তার সৌন্দর্য যেন অনবদ্য মহিমায় ঝরে পড়ছে—কর্তা এক-একবার বলে উঠছেন,—আহা এরকমটি কি আমি গাইতে পারব? আবার সুরের প্রবহমান ধারার গভীরে নিমজ্জিত হয়ে যান। গান চলছে তো চলছেই,—সময়ের কোনও সীমারেখা নেই, সুরের ধারাবর্ষণেরও বিরতি নেই। কেষ্ট এক মনে ঠেকা দিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে দু-একটা টুকরো বাজাচ্ছে—আমরা যেন গানের ও স্বর্গীয় আনন্দে মস্ত্ হয়ে আছি।

অকস্মাৎ কক্ষের দরজা খুলে প্রবেশ করলেন ভীষ্মদেবের পিতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়,—আমাদের সম্বিত ফিরে এল,—ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা একটা বেজে গিয়েছে। পিতাঠাকুর বেশ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—"তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? কতক্ষণ আর গান করবে,—আর তারপর খাওয়াদাওয়া করে বাড়ীর মহিলাদের ছুটি দেবে? গান করো আর যাই করো, যাঁরা অভুক্ত থেকে তোমাদের আহার্য পরিবেশন করবেন, তাঁদের কথা কি তোমাদের মনে থাকে না?" বলেই গম্ভীরভাবে চলে গেলেন।

এর পরে গান সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল—আমরা তো বুঝতেই পারিনি কেন পিতাঠাকুর এসে অমন তাড়া লাগালেন! পরে শুনলাম, ভীষ্মদেব যে শচীনকর্তা ও আমাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন, সেটা উনি জানতেনই না—ভীষ্মদেব তাঁর মাতৃদেবীকে (বড়মাকে) বলে এসেছিলেন আমাদের খাওয়ার কথা এবং একটু বিলম্বে মাংস আনতে পাঠানো হল বলে বড়মা বলেছিলেন আহার্য প্রস্তুত হলে তিনি সংবাদ দেবেন—তাই ভীষ্মদেব অত নিশ্চিত মনে সংগীতরসের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। অথচ ভীষ্মদেব একবার তাঁর পিতাকে জানালেন না যে আজ শচীনকর্তা ও আমরা তাঁর সঙ্গে একসাথে ভোজনে বসব, তাই একটু দেরী হচ্ছে। পিতাঠাকুর শাসিয়ে গেলেন এবং সন্তানও একান্ত বশংবদের মত গান বন্ধ করে চুপ করে বসে রইলেন।

ইতিমধ্যে অন্দরমহলে এই আকস্মিক দুর্দৈবের কথা গিয়ে পৌঁছলো বড়মায়ের কানে

এবং তিনি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খবর দিলেন যে জায়গা হয়ে গিয়েছে—এবার তোমরা এসে যাও। আমরা গুটি গুটি দোতলায় পৌঁছে দেখি বারান্দায় চারখানি আসন পাতা আছে আর তার সামনে চারটি থালায় ভাত পরিবেশন করা রয়েছে। আমরা হাত-টাত ধুয়ে এসে বসে পড়লাম, ভীষ্মদেব এক প্রান্তে বসলেন,—আমি অপর প্রান্তে। বাটিতে বাটিতে ডাল মাংস সব সাজানো—আমরা খাওয়া আরম্ভ করতে যাচ্ছি—হঠাৎ ভীষ্মদেব বলে উঠলেন,—কর্তা, আপনারা আরম্ভ করুন, আমি একটু নীচ থেকে আসছি,—বলেই নীচে চলে গেলেন। আমরা ভাবলাম এক্ষুণি তো এসে যাবেন, এক সঙ্গেই আহার শুরু করা যাবে, তাই হাত তুলে বসে রইলাম আমরা তিনজন। বসে আছি তো বসেই আছি,—ভীষ্মদেব তখনো আসছেন না,—আমরা ক্ষুধার্ত, কতকটা অবসন্ন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বড়মা একটি বাড়ির ছেলেকে নীচে পাঠালেন দেখ্‌তো, কালো দেরী করছে কেন? ছেলেটি তাড়াতাড়ি ছুটে গেল নীচে আর একটু পরেই এসে বলল, "ছোড়দা তো ট্যাক্সি করে কোথায় চলে গেল—আমাকে পাশের পানওয়ালা বলল!"

আমরা সবাই তো স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম, এমন পরিপাটি ও সুস্বাদু রন্ধন উপভোগ করা মাথায় উঠল। কী করব বুঝতে পারছি না, এমন সময় বৃদ্ধ পিতৃদেব বিশ্রামশয্যা থেকে এসে দাঁড়ালেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে, তোমরা খাওয়া শুরু করছ না কেন? কালোই বা কোথায় গেল?

আমরা কিছু বলবার আগেই বড়মা ঘরের ভেতর থেকে জানালেন যে, ভীষ্মদেব আজ এঁদের খেতে বলেছিল বলে দেরী করেছে। কারণ নিজেই মাংস আনতে রামকে পয়সা দিয়ে পাঠিয়েছিল; সব কথা না জেনে শুধু শুধু ছেলেকে সকলের সামনে তিরস্কার করেছ—সে তো অপমান বোধ করতেই পারে, তাই কিছু না খেয়েই কোথায় চলে গেল। এবার পিতৃদেবের ভেঙ্গে পড়বার পালা—অশ্রুসজল, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কীরকম ছেলে দেখত? আমাকে তো একবারও বলেনি যে এঁরা আজ এখানে অন্নগ্রহণ করবেন, তাহলে কি আমি ওরকমভাবে তাড়া দিই? তোমরা বাবা আমার, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের একান্ত মিনতি রাখো,—তোমরাও যদি না আহার করো, তাহলে আমি আর এ বাড়ীতে জল গ্রহণ করব না। কালোকে খুঁজে আনবই এবং তখন পর্যন্ত আমি কোনও খাদ্যই গ্রহণ করতে পারব না—তার ওপর তোমরাও যদি আমার অনুরোধ না রেখে অভুক্ত থাকো, আমার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত হবে না। শচীনকর্তাই আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, কাজেই আমরা ওঁর দিকেই তাকিয়ে আছি কী করা হবে এর পরে। বৃদ্ধের একান্ত কাতর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমরা খেতে বাধ্য হলাম, কিন্তু যেই আনন্দ দিয়ে দিনটা শুরু হয়েছিল, সেই আনন্দ বা অনুভূতি আর রইল না,—মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেল! ভীষ্মদেবের এরকম অভিমান আমিও এর আগে আর কখনো দেখিনি, তাই আমিও একটু বিপন্ন বোধ করেছিলাম। সম্মানিত অতিথির সামনে পিতার তিরস্কার তাঁর মনে খুব আঘাত দিয়েছিল, পিতাও সরল

বিশ্বাসে ছেলেকে কোনও খবর না নিয়েই বলেছিলেন, এতে তাঁর আরো বেশি দুঃখ হয়েছিল।

ভীষ্মদেব কোথায় চলে গেলেন কাউকে কিছু না বলে, সেটাই প্রধান সমস্যা হল এখন। জানাশোনা সব বন্ধু আত্মীয়দের গৃহে লোক পাঠানো হল, কিন্তু বড়মা বলছিলেন যে ট্যাক্সি করে যখন চলে গেছে তখন ভবানীপুর বা বেহালায় হয়ত গিয়েছে। কারণ সেখানে ওঁদের নিকট আত্মীয়েরা ছিলেন। পরে শুনেছিলাম তিনি ল্যানসডাউন মার্কেটের কাছে শ্যামানন্দ রোডে এক আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে অকস্মাৎ মধ্যাহ্নে হাজির হয়েছিলেন আর তিনদিন বাড়ীমুখো হননি।

এই তীক্ষ্ণ স্পর্শকাতর মন, অভিমানী চিত্ত—কখনো কাউকে ব্যথা দিতে জানত না, অন্যায় করলেও মুখের ওপর প্রত্যাঘাত করতে পারতেন না, অপমান বা আঘাতের জ্বালা নিঃশব্দে সহ্য করেই গেছেন,—সেই দাহ তাঁর মনে সাম্য বা প্রশান্তিকে দগ্ধ করেছে, তবু তিনি সকলের সঙ্গে হাসিমুখেই কথা বলতেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম প্রদাহ তাঁকে পরবর্তীকালে প্রায় নিস্তব্ধ করে রেখেছিল ; শারীরিক বা মানসিক কোনো কষ্টই তিনি লোকের কাছে বিবৃত করে সহানুভূতি পাবার চেষ্টাই করেননি।

মনে পড়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনু (নিখিলানন্দ) জার্মানীতে যায় ও সেখানেই বিবাহ করে স্থায়ীরূপে বাস করতে থাকে। বিবাহের বেশ কিছু পরে সে সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিল ও পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য সরকার লেনের বাড়ীতেও আসে। মায়ের সঙ্গে ও অন্যান্য গৃহের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা হয়, জার্মান বধূটিও সকলের সঙ্গে মার্জিত ও মধুর ভাবে কথাবার্তা বলে। এই ঘটনা তাঁর পণ্ডিচেরীর থেকে প্রত্যাবর্তনের বহু পরে,—সুতরাং মস্তিষ্কবিকৃতি বা সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক বিবেচনার অভাব তো আমরা দেখিনি, আগের মতন প্রগল্‌ভ বা হাস্যকৌতুকে সমুজ্জ্বল ছিলেন না বটে, কিন্তু মান অপমান বা বিচারবোধ কোন কিছুই নষ্ট হয়নি, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন তিনি, আমরাই তাঁকে ঠিক বুঝিনি বা তার মূল্য দিইনি। জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাৎ-ও হয়েছিল আর অত্যন্ত স্নেহে ও আদরে উভয়কে গ্রহণ করেছিলেন।

সেদিন অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে শচীনকর্তা আমাকে বলেছিলেন, "দেখলে সুরেশ, ওস্তাদের কাণ্ডটা দেখলে? আজ খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, আর মাংসটাও চমৎকার রান্না হয়েছিল, আর একটু খাবার ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু আর চাইবার মতো অবস্থা তো ছিল না। ভালো করে খেতেই পারলাম না।' শচীনকর্তার আক্ষেপের সঙ্গে আমি ও কেষ্টও একমত হলাম।

শচীনকর্তার এবং তাঁর অনুষঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার এক বিদগ্ধ ও রসিক সমাজের সঙ্গে ভীষ্মদেবের সম্বন্ধ বহুদিন পর্যন্ত হৃদ্য ছিল,—সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন, কুন্দনলাল সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, কবি অজয় ভট্টাচার্য, হিমাংশু দত্ত, কবি শৈলেন রায়, ইত্যাদি আর তাছাড়া

ছিলেন ভীষ্মদেবের কৈশোরের সাথী বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গাঙ্গুলী (চিতুবাবু)। এঁরা সকলেই ভীষ্মদেবকে তাঁদের মধ্যমণি বলে মনে করে গর্ব বোধ করতেন, আর নানারকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর মধুর স্পর্শ লাভ করতে প্রয়াসী হতেন। চিত্রজগতের নীরেন লাহিড়ী (বেনু লাহিড়ী) ও সম্প্রতি স্বর্গত দিলীপকুমার রায়ও এর কিছু পরে এই গোষ্ঠীতে যোগ দেন—সব মিলে যেন সর্বদাই আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল। কিছু দিন ভীষ্মদেব শচীনকর্তার ভাবী পত্নী মীরা দেবীকেও তালিম দিয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহের পরে বোধহয় আর শিক্ষা অগ্রসর হয়নি।

শচীনকর্তার গৃহে (১-এ রাজা বসন্ত রায় রোডে) একটা সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল—নাম হল ঃ "সুরমন্দির"। প্রথম প্রথম শচীনকর্তাই শিক্ষার্থীদের তালিম দিতেন আর প্রায়ই ভীষ্মদেবকে মাঝখানে নিয়ে সন্ধ্যায় গানের মহফিল হত। আমি তো সর্বদাই উপস্থিত—তাছাড়া আরো অনেক ছোটখাটো সংগীতজ্ঞ ও শিল্পীরা এখানে নিয়মিত হাজিরা দিতেন,—বাংলাগানের তদানীন্তন কালের সুপরিচিত শিল্পী হরিপদ রায়ও এখানে আসতেন আর রাধিকা মৈত্রদের আড্ডার সেতারী ফণীবাবুও এসে যোগ দিলেন। একজন পরম-উৎসাহী সংগীতরসিক ছিলেন এই দলে শা' নগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়। একবার "সুরমন্দিরে" মহা সমারোহে সরস্বতী পূজা হয়েছিল, সেই উপলক্ষে বহু সংগীতশিক্ষার্থী ও উদ্ভিন্ন-শিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন, সকলকে নিয়ে একটা গ্রুপ-ফটো তোলানো হয়েছিল—তাতে প্রায় অনেকেই ছিলেন ভীষ্মদেবের সঙ্গে। এই "সুরমন্দিরের" দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়ে যায়, যখন শচীনকর্তা গ্রামোফোন রেকর্ডে ও রেডিওতে খুব জড়িত হয়ে পড়েন। বহুদিন সম্পূর্ণ একাকী আমাকেই এই প্রতিষ্ঠান চালাতে হয়েছিল, কিন্তু শচীনকর্তা ঐ গৃহত্যাগ করে যখন হিন্দুস্থান রোডে চলে যান, তখন ধীরে ধীরে এদিকের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে ও প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য ইতিমধ্যে শচীনকর্তার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় মীরা দেবীর সঙ্গে,—বোধহয় হিন্দুস্থান পার্কের কোনও বাড়িতে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

বিবাহের পরই শচীনকর্তার জীবনধারার বেশ একটু পরিবর্তন হয়—হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতেও ভীষ্মদেব মাঝে মাঝে যেতেন, আমিও বহুবার গিয়েছি, কিন্তু ভীষ্মদেবের যাতায়াত অনেক হ্রাস পেয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত আর ওখানে যেতেন না। ভীষ্মদেবেরও ব্যক্তিগত সমস্যা, সাংসারিক জটিলতা, মেগাফোনের কর্মবাহুল্য, ফিলম কর্পোরেশনে যোগদান—ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি নিজের গৃহের শিক্ষণও বেশি করতে পারতেন না, বাইরে গিয়ে শেখাবার প্রশ্নও ছিল না। ক্রমশ তিনি নিজের মধ্যে মনকে গুটিয়ে আনতে লাগলেন এই সময়ে—মানসিক ও সুরের ধ্যানজগতে সংঘাতের সূত্রপাত এই সময়েই হয়েছিল। কিন্তু এর পূর্ণ পরিণতি ও প্রকাশ হতে আরো সময় লেগেছে—করাচীর নিকটবর্তী শিকারপুরের সংগীতসভা, সিন্ধুনদীর মধ্যস্থলে দ্বীপনিবাসী "সাধ্‌বেলার" মহান সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিবিড়

সাক্ষাৎ, বরোদায় ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের নিমন্ত্রণে আতিথ্য গ্রহণ করার ফলে পূজনীয় গুরু বদল-খাঁ সাহেবের সঙ্গে সামান্য অসন্তুষ্টি, ফিলম করপোরেশনের পরবর্তী কনট্রাক্ট নিয়ে মতবিরোধ,—ইত্যাদি বহু ঘটনা তাঁর মনকে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলেছিল,—শুধু অকস্মাৎ নির্বাসিত জীবনে যাবার কল্পনা হয়নি—এর জন্য চতুর্দিক থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত আসছিল, মনের ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটছিল, তার আভাস কিছুটা তখনকার কথাবর্তার মধ্যেও কখনো কখনো প্রকাশ পেত। ফিলম করপোরেশনের কথাটাই এখানে বলে নিই প্রাসঙ্গিক হিসেবে।

আনুমানিক ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলম করপোরেশনে সংগীতপরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। প্রথমে দুটি হিন্দী চিত্রে সুরারোপ করেন,—"হরিকীর্তন" ও "আশা"। কিছুদিন পরে সুশীল মজুমদারের ছবি "রিক্তা"-য় সুরদান বাংলাদেশের অন্যান্য সংগীত পরিচালকদের বিস্মিত করে তোলে—এ এক নতুন, চমকপ্রদ সুরের ধারা। চারদিকে প্রশংসার বন্যা বইতে থাকে,—তখন অন্য একজন পরিচালক তাঁকে পরবর্তী ছবির জন্য কথা বলতে আসেন। তিনি যে পরিমাণ অর্থ কামনা করলেন, আজকের তুলনায় তা বলতেও লজ্জা করবে—কিন্তু সেই পরিচালক ভীষ্মদেবকে কিছু কমাতে বলেন তাঁর পারিশ্রমিক। ভীষ্মদেব বুঝিয়ে বলেন যে এই উপার্জনেই তাঁর সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়, বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সকলেই তাঁর ওপর প্রায় নির্ভরশীল, সুতরাং পারিশ্রমিক হ্রাস করার নানা অসুবিধা আছে। তাতে পরিচালক তাঁদের অর্থসঙ্গতি বিবেচনা করে জানাবেন বলেন। ইতিপূর্বে "রিক্তা" ছবিতে ভীষ্মদেবের সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন শচীন দেববর্মণ। কয়েকদিন পরে সেই পরিচালক এসে জানালেন তাঁরা আর ভীষ্মদেবকে চাইছেন না, কারণ অন্য একজন সংগীত পরিচালক ঐ কম টাকাতেই ছবিতে কাজ করবেন বলে তাঁর সঙ্গেই কনট্রাক্ট করা হয়েছে। ভীষ্মদেব এই অঙ্গীকার পত্রের আশায় অন্য আর একটি ছবির কাজ প্রত্যাখ্যান করেন—আমার মনে হয়, তাঁর যে ব্যবসায়-বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল না, তার প্রমাণ এই প্রত্যাখ্যান। সকলকেই নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে বিশ্বাস করতেন, তার জন্য বহুবার ক্ষতি ও অপমানও স্বীকার করতে হয়েছে। পরিচালকের কথায় ভীষ্মদেব বিস্মিত ও চমকিত হয়ে ওঠেন, জানতে চাইলেন কে এই সংগীত পরিচালক, কতদিনের সংগীত-পাণ্ডিত্য ও রসাধিকার? পরিচালক সবিনয়ে জানালেন যে আপনারই যিনি সহকারী ছিলেন, সেই কুমার শচীন দেববর্মণের সঙ্গে অঙ্গীকারপত্র করা হয়েছে। ভীষ্মদেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—সম্পূর্ণ বাক্‌রহিত অবস্থায় তিনি স্টুডিও ত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় একজায়গায় তাঁর সংগীতের মহ্‌ফিল ছিল—আমিও সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁকে গম্ভীর ও বিষণ্ণবদন দেখি ঃ আমাকে বললেন ঃ "কোনও জায়গা থেকে ওদের ফোন করে দাও, আজ শরীরটা খুব খারাপ, গান করতে পারব না। তুমি একেবারেই নিষেধ করে দাও যে চিকিৎসকের পরামর্শে আজ তাঁর কোথাও যাওয়া হতে পারে না।" আমি এই অপ্রিয় কর্তব্য সমাপন করে এসে ওঁর কাছে

বসলাম। প্রথমে কিছুই বলতে চান না, অনেকবার মিনতি করবার পরে বললেন—আমাকে তো কর্তার একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল। আমি তো তাঁকে আলাদা এককভাবে সংগীত পরিচালনা করতে বাধা দিতাম না—এটা কীরকম হল? আমি অবশ্য শচীনকর্তার সঙ্গে ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে কখনই আলোচনা করিনি—কারণ আমিও কর্তার কাছে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি—কিন্তু ভীষ্মদেব আমার সংগীতের দীক্ষাদাতা গুরু, তাঁর সম্মান সর্বাগ্রে আমাকে দেখতে হবে, তাই ভীষ্মদেব নিজেই কিছু বললেন না বলে, আমিও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছি। কিন্তু এর পরেই দু'জনার সম্পর্কে যেন ফাটল ধরল,—শচীনকর্তা বোম্বাইতে "বিশাল তৃণভূমির" দিকে যাত্রা করলেন, ভীষ্মদেব অধিকতর কূর্মপ্রবৃত্তি অবলম্বন করে মনে মনে সংসারে বীতস্পৃহ হবার সুযোগ অন্বেষণে বাপৃত হলেন।

এখানেও সেই অভিমান ভীষ্মদেবকে ব্যথিত করেছে অহরহ, কিন্তু খোলাখুলি আলোচনা হলে আমার মনে হয় এই ভুল বোঝাবুঝি দূর হত এবং পরস্পরের সম্বন্ধ অটুট থাকত। ভীষ্মদেব কলকাতায় পণ্ডিচেরী থেকে চলে আসবার পরেও শচীনকর্তা বহুবার কলকাতায় এসেছেন, কিন্তু নিবিড় অন্তরঙ্গতায়, পরম প্রীতির পরিবেশে আর তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে শচীনকর্তার ভীষ্মদেবের নিকট খেয়াল শিক্ষা ও তাঁর বিভিন্ন সংগীতে সুরযোজনার একটু আলোচনা করতে চাই। কর্তার কণ্ঠস্বর ছিল একটা আশ্চর্য ধরনের সুরের কোমলতায় আর্দ্র,—সেই আধভেজা কণ্ঠের দরদে সব শ্রোতাই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অথচ এদেশে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে, হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী তাঁকে প্রথমে নির্বাচিত করেননি, বরং বলেছিলেন আর কিছুদিন কণ্ঠসাধনা করে এলে তাঁরা বিবেচনা করতে পারেন। তখন হিন্দুস্থানের অন্যতম কর্ণধার চণ্ডীচরণ সাহা (সি সি সাহা) ব্যক্তিগত দায়িত্বে অন্তত একখানা রেকর্ড করা হোক বলে সংগীত কমিটির মত আদায় করেন। প্রথম রেকর্ড হোল—একখানি খাম্বাজ ঠুমরী অঙ্গের গান—"এই পথে আজ এসো প্রিয়া করো না আর ভুল" এবং অপর পৃষ্ঠায় ভাটিয়ালী অঙ্গের গান—"ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে"। রেকর্ডখানির অবিশ্বাস্যরকম বিক্রি ও প্রচলন হোল,—যাতে চণ্ডীবাবুর শুধু মুখরক্ষা হয়নি, হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর ভিত্তিও দৃঢ় হল এবং সেই সময় থেকে বহুদিন তাঁরা গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে গিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে এসে জুটলেন বহু সংগীতশিল্পী,—বাংলা গানের একটা নতুন, চমকপ্রদ ধারাকে রসের খাতে বইয়ে দিলেন। সজনীকান্ত মতিলাল, অনুপম ঘটক, হরিপদ রায়, রেণুকা দাশগুপ্ত, কুন্দনলাল সায়গল এবং সর্বোপরি আফ্‌তাব্-এ মৌসিকী, ওস্তাজ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব—এই রকম সব শিল্পীকে একসূত্রে গ্রথিত করে সর্বসমক্ষে প্রচারিত করেছিলেন চণ্ডীবাবু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে, এ বিষয়ে তাঁর তুলনা মেলা ভার। আমি চণ্ডীবাবুর সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ছিলাম,—আর এখনো মোহনলাল- শোভনলালের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। চণ্ডীবাবুর এই সন্তানদ্বয় হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীকে আবার বহু মর্যাদায় উন্নীত করেছে, তাছাড়া তাদের নব

প্রচেষ্টা ইন্ডিয়ান রেকর্ড কোম্পানী—সংক্ষেপে "ইনরেকো" আজ সসম্মানে সংগীতজগতে মস্তক উচ্চ করে দাঁড়িয়েছে দেখে চণ্ডীবাবুর স্বর্গত আত্মা নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করেছে।

প্রথম রেকর্ডের অসামান্য সাফল্যের পর কুমার শচীন দেববর্মণের খ্যাতি বহুবিস্তৃত হল আর নানারকম রাগপ্রধান ও ভাটিয়ালী/বাউল অঙ্গের গান তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে সকলের কর্ণেই গুঞ্জরিত হতে লাগল। প্রথম দিকের একটু হাল্‌কা গান গাইবার পরে কর্তার রেকর্ড বেরোল—বাহার রাগে "আলোছায়া দোলা" আর অন্যদিকে জৌনপুরী/গান্ধারী অঙ্গের গান "যদি দখিনা পবন।" হিমাংশু দত্তের সুরযোজনায় ও অজয় ভট্টাচার্যের লেখনীর সংযোগে এই রেকর্ডটা বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটা অপরূপ ছবি গড়ে নিল। পরপর কয়েকটি ক্লাসিক্যালধর্মী গানে শচীন কর্তা বাংলা গানের জগতে একটা স্মরণীয় নাম হয়ে রইলেন। এই সময়কার গানগুলি,—যেমন—"মম মন্দিরে এলে কে তুমি" (আড়ানা), "নতুন ফাগুনে যবে" (মিশ্র রাগেশ্রী), "প্রেমের সমাধি তীরে"—এ সব গানেই অপূর্ব সুর সুষমা যোগ করে ছিলেন হিমাংশু দত্ত এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সংগীত রচনার মাধ্যমে বাংলা গানের সামান্য তরী অসামান্য গর্বে খেয়াল-অঙ্গে পরিচিত হয়ে গেল। তাছাড়া হাল্‌কা ধরনের গান তো ছিলই, তাতেও সুরের যেন বন্যা বয়ে যেতে লাগল।

তবে একটা কথা অবশ্য সকলেই লক্ষ করে থাকবেন, যে বাউল—ভাটিয়ালী ও আধুনিক গানেব সজ্জায় শচীন কর্তার যে পারিপাট্য ও সহজ-প্রবণতা ছিল, খেয়াল ধরনের গানে তাঁর সেই নিজস্বতা আসেনি। তাঁর প্রায় সব গানেই ভীষ্মদেবের শিক্ষার প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। কুমিল্লার বিখ্যাত সংগীতশিল্পী মহম্মদ হোসেন (খুসরো মিঞা) বেশ ভালো ভালো কয়েকটি গজল গাইতেন—তার অক্ষরে অক্ষরে বাংলা বসিয়ে অজয় ভট্টাচার্য গান রচনা করলেন,—সুর তো আগেই হয়ে আছে। যেমন—"কিস্‌ কিস্‌ আদাসে তুনে—জ্বলবা দেখাকে মারা"—বাংলায় হল "তুমি তো বঁধূ, জানো।" সায়গলের গান, খাম্বাজের ঠুমরী—"কৌন বুঝাঈ রামা, তপত মোরে মনকী"—কর্তার কণ্ঠে রেকর্ড হল—"আমি ছিনু একা।" ভীষ্মদেবের কাছে শেখা কয়েকটি গানও কর্তা অবিকল বাংলায় "কণ্ঠানুবাদ" করেছিলেন, যথা চরজুকী মল্লার-এর গান—আজ ঝর লায়ো"—হয়ে দাঁড়ালো "মেঘ ঝরে যায়",—কাফী-ভৈরবীর গান—"ভালা মোরা মন ভাঁতি মুরলী বজাঈ"—হল "জাগো মম সহেলী গো, রজনী পোহায়," ইত্যাদি। শেষের গানটি সম্বন্ধে ভীষ্মদেব আমাকে একবার বলেছিলেন—"এই কাফী-ভৈরবীর গানটা আমার খুব প্রিয় ছিল—আমি ভেবেছিলাম, ওই সুরে একটা বাংলা গান রেকর্ড করব, কিন্তু শচীন কর্তা আগেই বাংলায় রেকর্ড করে ফেলেছেন, কাজেই ঠিক ওভাবে আর করা যুক্তিযুক্ত হবে না। দেখি অন্যরকম প্যাটার্নে করা যায় কিনা। সুরের ধ্যান তাঁর চেতনায় সর্বক্ষণই জাগরিত ছিল তাই সেই রাগে আরও একটু নমনীয়ভাবে ভেঙ্গে তৈরী হল—"যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা, আমারে ভুলিও প্রিয়"—কথা জোগালেন কবি শৈলেন রায়। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের বিখ্যাত খেয়াল—"ঝন্

ঝন্ ঝন্ ঝন্ পায়েলিয়া বাজে" (নটবিভাগ) গানটি শচীনবাবু ভীষ্মদেবের কাছেই প্রকৃষ্টভাবে তালিম নিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা রেকর্ড হলো—"ওগো ঝন্ ঝন্ ঝন্ মঞ্জীর বাজে। কথা দিয়ে সুরকে বাঁধলেন অজয় ভট্টাচার্য। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের আর একখানা গান—"না মানুঙ্গী, না মানুঙ্গী, না মানুঙ্গী" (খাম্বাজ) ভেঙ্গে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন—কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া এবং সেটা শচীন কর্তাই রেকর্ড করলেন।

আমি এখানে শচীনকর্তার গান বা জীবনের কোনও মূল্যায়ন অথবা সমালোচনা করবার প্রয়াস করছি না, কিন্তু জ্ঞান গোস্বামী বা শচীনকর্তার হিন্দী খেয়াল ভাঙ্গা বাংলা গানগুলি শুধু শব্দ-বদলে বসিয়ে হিন্দীরূপেই অবিকৃত রয়েছে, অথচ ভীষ্মদেবের হিন্দী খেয়াল থেকে নেওয়া গানগুলিতে নানাভাবে নিজস্ব নিরালা পরিবর্তনের স্বাদ রয়েছে, যাতে সেগুলি সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর প্রতিভার বিচিত্র ধারা প্রকাশ করেছে। তাঁর যে কয়খানি বাংলা গান আছে, তাতে তানকর্তব এক "ফুলের দিন" (জয়জয়ন্তী) গানখানি ছাড়া আর কোথাও নেই—শুধু সুরের, ছন্দের বাতাসে যেন ভেসে চলেছে, মনে হয় কত সহজ, কিন্তু গাইতে গেলেই দেখা যাবে, ওসব গান নকল করা যায় না,—ঈশ্বরের আশীর্বাদ কণ্ঠে বর্ষিত না হলে ওরকম সুরের স্থায়িত্ব কল্পনাতেও আসবে না। মনে পড়ছে এক তথাকথিত সংগীতসমালোচকের লেখা—"ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এমন কথা বলা যায় না...ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর এনে দিয়েছে...এই তীক্ষ্ণতা মিষ্টত্বের হানিকারক"। ইত্যাদি। এথচ এঁরাই সংগীতরসপিপাসুদের রসচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন বলে শুনতে পাই।

ভীষ্মদেবের পূতচরিত্রের একটা বিশেষ দিক লক্ষ করেছিলাম শচীনকর্তার বিবাহের সময়। শচীনকর্তার স্ত্রী মীরাদেবী প্রাক্-বিবাহযুগে শচীন দেববর্মণের কাছেই সংগীত শিক্ষা করতেন—অর্থাৎ শচীনকর্তার শিষ্যারূপেই তিনি ঢাকা ও কলকাতার সংগীতসমাজে পরিচিতা হয়েছিলেন। বিবাহের পূর্বে অল্প কিছু দিন তিনি ভীষ্মদেবের কাছেও তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শচীনকর্তার ছাত্রী বলেই সবাই জানত। ছাত্রীর সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াটা ভীষ্মদেব খুব ভালো মনে নিতে পারেননি—আমার কাছেও কয়েকবার বলেছিলেন যে কর্তার এ কাজটা ভালো হল কি?

রাজ্যেশ্বর মিত্র

[১৯১৭ সালে আগরতলায় জন্ম। বাবা অমরনাথ মিত্র। হুগলি কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে বি.এ. পাশ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডিপ্লোমা অর্জন করেন। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বত্রিশ বছর চাকুরি করেছেন। কালীপদ পাঠকের কাছে পুরাতনী গান শেখেন। সুবিনয় রায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন। বিশ্বভারতীর আমন্ত্রিত অধ্যাপক ছিলেন। 'দেশ' সাময়িকীতে দীর্ঘকাল 'শার্ঙ্গদেব' ছদ্মনামে সঙ্গীত সমালোচক ছিলেন। সঙ্গীত বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থের রচয়িতা। উল্লেখ্য গ্রন্থ, 'বাংলা সঙ্গীত (দুই খন্ড)', 'মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা', 'বেদগানের প্রাকৃত রূপ' ইত্যাদি। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রয়াত হন।]

কুমার শচীন্দ্র দেববর্মণ যখন কুমিল্লা এবং আগরতলা অঞ্চলে গানে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তখন আমি বালক মাত্র ; হয়তো সবে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীর সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। ঐ সময় তিনি বোধ হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন এবং অন্ধগায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র দের কাছে গান শিখতেন। ঐ সময় কৃষ্ণ চন্দ্র দে একবার আগরতলায় এসেছিলেন এবং 'দীনতারিণী তারা' গানটি গেয়ে খুব নাম করেছিলেন। শচীন দেববর্মণ বলতে গেলে কুমিল্লাতেই মানুষ ; সেখানে তিনি সঙ্গীত চর্চা করেছেন এবং তাঁর সমসাময়িক বহুগায়ক ও সুরকার তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। আজ তাঁদের মধ্যে কতজন জীবিত আছেন জানিনা তবে গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ এখনও রয়েছেন*। যদিও তিনি গান লেখা ছেড়ে দিয়েছেন বহুকাল আগেই। শচীন দেববর্মণ আগরতলায় আসতেন অবসরকালে কিছুদিন

* ১৯৮৪ সেপ্টেম্বরে প্রয়াত হয়েছেন

থেকে আবার চলে যেতেন। অন্যত্র তাঁকে যেমন দেখা যেতো, আগরতলায় ঠিক তেমনটি দেখা যেত না। এখানে তিনি শ্রেষ্ঠ রাজবংশের সন্তান। তাঁকে সেইরকম মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হত। তিনি কথা বলতেন খুব কম, স্বভাবতই খুব গম্ভীর ছিলেন। দেখতে ছিলেন ঠিক তাঁর পিতা নবদ্বীপ বাহাদুরের মত। আগরতলায় স্বয়ং মহারাজের পরেই ছিল তাঁর মর্যাদা। তাঁর মত সজ্জন ব্যক্তি কমই দেখা যায় ; তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র স্বভাবের লোক ছিলেন। নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়ির বাইরের দিকে একটা বৈঠক খানায় মাঝে মাঝে গান বাজনা হত, শচীন দেববর্মণ গাইতেন। যাকে উদাত্ত কণ্ঠ বলে তাঁর গলা সেরকম ছিল না, বরং তিনি ক্ষীণকণ্ঠই ছিলেন। কিন্তু গানে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য আর ছিল একটা অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা ; যা তাঁর গুরু কৃষ্ণ চন্দ্র দে-র বা ভীষ্মদেব কারুর মধ্যেই ছিল না। যদি বা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব তাঁর উপর বেশ খানিকটা পড়েছিল, ভীষ্মদেবের প্রভাব আদৌ ছিলনা। যদিও তিনি ভীষ্মদেবকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন শেষ জীবন পর্যন্ত। আসলে প্রখর ছিল তাঁর সৌন্দর্যবোধ এবং বাংলা গানের 'এস্থেটিকস'-এ তিনি একটা নতুন দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। এইখানেই ছিল তাঁর কৃতিত্ব।

আমি যখন ম্যাট্রিক শ্রেণীতে পা দিয়েছি তখন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে বেরুল তাঁর প্রথম রেকর্ড-'ডাকলে কোকিল রোজবিহানে' এবং 'এই পথে এসো প্রিয়া'। প্রথমটি পল্লীগীতির রীতিতে গাওয়া, দ্বিতীয়টি রাগ সঙ্গীত। রেকর্ডের ধাতুগতমান ভাল ছিলনা কারণ তাঁর গলা তেমন ভাল আসেনি এবং আরও অনেক দোষ-ত্রুটি বাজাবার সময় ধরা পড়ত। তথাপি এই গান দুটিই তাঁকে শিল্পী সমাজের শ্রেষ্ঠ স্তরে পৌঁছে দিল।

একাধারে রাগ সঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত দুটি বিপরীত পর্যায়ে দক্ষতা খুব কম গায়কের মধ্যেই দেখা যায়, কিন্তু শচীন দেববর্মণ এই দুটি দিকেই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। পল্লী সঙ্গীতের মানসিকতা তিনি গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। আগরতলায় সাহেবআলী নামে এক পল্লীগায়ক আসতেন। তাঁর একাধিক গান শচীন দেববর্মণ সংগ্রহ করে বিপুল সার্থকতার সঙ্গে রেকর্ড করেছিলেন। আর রাগাশ্রয়ী গানে তিনি কুমিল্লার স্বনামধন্য সুরকার হিমাংশু দত্ত সুরসাগর মহাশয়ের প্রচুর সহায়তা লাভ করেছিলেন। কলকাতায় যখন তিনি খ্যাতির শীর্ষে তখন তিনি বোম্বের চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হন এবং সেখানকার সঙ্গীতজগতে প্রবেশ করেন। সকলেই জানেন সেখানে তিনি কি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবে সেখানকার বাণিজ্যিক সাফল্য তাঁকে আর্থিক সমৃদ্ধি প্রদান করলেও বাংলা গানে তিনি সঙ্গীতকলাকে যে শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব প্রদান করে গেছেন, সেইটিই তাঁর মহৎ কীর্তি বলে গণ্য হবে।

কুমার শচীন দেববর্মণ ক্রীড়াজগতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে খুব ভাল টেনিস খেলতেন, কিন্তু শারীরিক কারণে ও খেলাটি তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তিনি ফুটবল খেলার উত্তম রেফারী ছিলেন। তাঁর অবস্থানকালে আগরতলার সমস্ত বড় বড় খেলায়

তিনি রেফারী হতেন এবং সেটা উভয়দল বা দর্শকমণ্ডলী সকলের পক্ষেই সন্তোষজনক হত। আজও আমার স্মৃতিরপটে তাঁর সেই ফরসা একহারা চেহারাটা ভেসে ওঠে। তিনি দীর্ঘ সিল্কের শার্ট পরতেন এবং হাতা দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রাখতেন। মিহি ধুতি তিনি খুব সুন্দরভাবে মালকোঁচা মেরে পরতেন। পায়ে থাকতো সেযুগের শুড় তোলা নরম চটি, খেলার সময় তিনি তাঁর বাড়ী থেকে ইস্কুলের মাঠ পর্যন্ত হেঁটে আসতেন ; সেখানেও তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি দেখতুম না। এইরকম আরও একজন স্বনামধন্য শিল্পীর কথা আমার মনে পড়ে। তিনি আজও জীবিত আছেন। তিনি হচ্ছেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ। এখন তিনি বেঁচে নেই, বিশ্বভারতীতে কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর স্বভাবের এই শিল্পীকে প্রায়ই দেখেছি বিকেলে সম্পূর্ণ একা সারা শহর চক্কর দিয়ে বেড়াতে। শচীন দেববর্মণের মাছ ধরায় খুব উৎসাহ ছিল শুনেছি কিন্তু আগরতলায় আমি তাঁকে কখনও এই কাজে রত থাকতে দেখিনি।

তিনি মাঝে মাঝে হোলীর গানে সুর দিতেন। হোলীর দিনে মহাউৎসাহে সেসব গান গাওয়া হত। আমিও সেইসব গানের অনেকগুলি জানতুম, কিন্তু আজ তাঁর একটি ছত্রও মনে নাই। কলকাতায় তাঁর প্রতিদিনেব খবর রাখতেন আমার জ্যেষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণজিৎ দেববর্মণ ; তিনি আজ বেঁচে নেই। সঙ্গীতে তাঁরও প্রতিভা ছিল।

কুমার শচীন দেববর্মণের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলনা। সে উদ্যোগও আমি করিনি। তিনি যখন খ্যাতির তুঙ্গে আমি তখন কলেজের ছাত্র। আমি যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছি তখন তিনি বোম্বাই-এর স্থায়ী অধিবাসী। কলকাতায় তাঁর শেষ আলোচনাসহ গান শুনি বঙ্গসংস্কৃতির এক বিরাট আসরে। তারপরে বোধহয় মাত্র দু' একবার এই সংস্কৃতির অধিবেশন হয়েছিল। আজ তাঁর রেকর্ড জগতের ইতিহাস সম্বন্ধে যিনি সবচেয়ে বেশি বলতে পারেন তিনি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর নীরদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। বর্তমানে এই কোম্পানী ইনরেকো নামে পরিচিত। নীরদ বাবুর সঙ্গে সঙ্গীতাচার্য কুমার শচীন দেববর্মন মেমোরিয়াল কমিটির যোগস্থাপন করার চেষ্টা চলছে। যোগাযোগ হয়ে গেলে শচীন দেববর্মনের সঙ্গীত সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য উদঘাটিত হবে এই আশা করছি।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

[১৯৩১ সালে কলকাতায় জন্ম। বাবা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মা হেমপ্রভা দেবী। বারো বছর বয়েসে 'গল্পদাদুর আসর'-এ গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের কথায় গান করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়েসে এইচ. এম. ভি. থেকে রেকর্ড বেরোয়। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র কাছে পাতিয়ালা ঘরানার ছাত্রী ছিলেন। অসংখ্য বাংলা ছবিতে গান করেছেন। গীত আধুনিক গানের সংখ্যাও কম নয়। বাংলা গানের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।]

অনেকদিন আগের কথা। যতদূর মনে হয়, ১৯৪৯ সালের শেষাশেষি। তখন আমি সমানে গাইছি। একদিন 'বিদূষী ভার্যা' ছবির একটা গান রেকর্ড করে বাড়ি এসে একটু বিশ্রাম করছি। গানটা এমনি গুনগুন করে গাইছিলাম। শুনলাম, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্নে শচীন গাঙ্গুলি এসেছেন। চলচ্চিত্র-নির্মাণ সংস্থা 'এম পি প্রোডাকশন'-এর কর্ণধার ছিলেন মুরলীবাবু। আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। শচীন গাঙ্গুলিও আমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর ডাকনাম ছিল ববি। তিনি ডাকনামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়িতে একবার আমি গানও করেছিলাম।

যাই হোক, শচীন গাঙ্গুলি আমাকে বললেন, শচীনদেব বর্মণ তোমাকে খুঁজছেন। তোমাকে বম্বে নিয়ে যেতে চান। ওঁর ছবিতে তুমি গাইবে। আমার বড়দা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ওর এখানে অনেক কাজ। এ সময়ে বম্বে যাওয়া তো একটু অসুবিধে। দাদা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন।

শচীন গাঙ্গুলি আমাকে বললেন, তা তো আমি জানি না। মীরা বউদি (শচীনদেব বর্মণের স্ত্রী) তোমার গান শুনতে চেয়েছেন। দেখো কী করবে। আমি দাদার দিকে তাকালাম। দাদা বললেন, চল তাহলে একদিন যাই।

শচীনদেব বর্মণের মতো মানুষ তাঁর ছবিতে গাইবার জন্য আমাকে ডেকেছেন এ তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আমার বড়দার নাম রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিই আমার সব দেখাশোনা করতেন। কোথায় রেকর্ডিং, কোন সুরকারের গান গাইব, কোন ফাংশনে যাব সব ঝক্কিঝামেলা দাদা সামলাতেন। আমি শুধু গাইতাম। দাদার নির্দেশ ছাড়া কিছু করিনি।

শচীনদার বাড়ি ছিল দক্ষিণ কলকাতার পঞ্চাননতলা এলাকার সাউথ এন্ড পার্কে। উনি বম্বেতেই থাকতেন। কলকাতায় এলে সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে উঠতেন। সেবার মীরা বউদি কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন।

একদিন দাদার সঙ্গে সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে গিয়ে মীরা বউদিকে গান শুনিয়ে এলাম। তিনি আমার গান শুনে খুব খুশি। আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মীরা বউদিকে এত ভাল লেগেছিল আমার। গুরুজনের আশীর্বাদের মতো কিছু নেই। শেষপর্যন্ত আমার বম্বে যাওয়া স্থির হল। দাদা বললেন, শচীনদা যখন ডেকেছেন যত অসুবিধেই হোক আমাদের যাওয়া উচিত।

১৯৫০ সাল। আমার আজও মনে আছে বর্ষাকালে প্রথম বম্বে গিয়েছিলাম। কলকাতায় সেদিন খুব বৃষ্টি। ওই বৃষ্টি মাথায় করেই হাওড়া স্টেশনে এসে বম্বে মেল ধরেছিলাম। বড়দা আমার সঙ্গে। আমি কোথাও একলা থাকিনি। দাদা জানতেন আমার অসুবিধে হবে। বড় কেউ থাকলে আমার দেখাশোনা করতে পারবেন। তখন ঠিক হল, আমার দিদি সঙ্গে যাবেন। আমার দিদির নাম সরসী।

বম্বেতে শচীনদা আমাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল খার রেলস্টেশনের গায়ে 'এভারগ্রিন' হোটেলে। আজও আমি চোখ বুজলে হোটেলটাকে দেখতে পাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার একটা কোণের ঘরে শচীনদা থাকতেন আমাদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একতলার একটা ঘরে। পরে আমি দোতলায় উঠে যাই।

শচীনদা এত স্নেহশীল ছিলেন, প্রতিদিন একবার করে আমার ঘরে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। আমি ঠিকমতো প্র্যাকটিস করছি কি না, আমার খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর। দাদাকে বলেছিলেন, কোনও অসুবিধে হলে আমাকে বলবে।

শচীনদেব বর্মণকে আমি আগে থেকে চিনতাম। তখন আমি ছেলেমানুষ। তেরো চোদ্দো বছর হবে। দক্ষিণ কলকাতায় বিজলী সিনেমাহলে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা

হয়। ওই অনুষ্ঠানে শচীনদাও এসেছিলেন। শচীনদা গাইবেন। তাঁর গান শোনার জন্য এত ভিড় হয়েছিল কী বলব। শচীনদার কী নাম তখন। সেই সময় তিনি হায়েস্ট পেড সিঙ্গার। তখনকার প্রত্যেকটা ফাংশনে একশ টাকা করে নিতেন।

ছোটবেলা থেকেই শচীনদেব বর্মণের গান শুনছি। আমার বাড়ির সকলেই তাঁর ভক্ত। সেই মানুষটাকে চোখের সামনে দেখে ভাল তো লাগবেই। ওই ফাংশনে আমিও গাইতে গিয়েছিলাম। আমরা গ্রিনরুমে বসেছিলাম। আমার মেজদা ছিলেন সঙ্গে। আমার মেজদার নাম ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি যখন গাইতে যাচ্ছি শচীনদা আয়োজকদের বললেন, এত ছোট মেয়ে। তোমরা ভাল করে কিছু পেতে ওর বসার ব্যবস্থা করে দাও। ডায়াসে এমনি বসলে ওর ঠাণ্ডা লাগবে।

তখন শীতকাল ছিল। পরে বাড়িতে ফিরে মেজদা আমাকে বলেছিলেন, তুই যখন গাইতে বসবি শচীনদা আমাকে বললেন. চাদরের ওপর আমার গায়ের এই শালটা পেতে দাও, মেয়েটা খানিকটা আরাম পাবে। আমি আপত্তি করলাম।

মেজদার কাছে একথা শোনার পর শচীনদেব বর্মণের এক অন্য রূপ আমি খুঁজে পেলাম। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি শুধু প্রতিভাবান, শ্রদ্ধেয় এক সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার নন, আমার কাছে কোমল মনের বিনয়ী একজন মানুষ। সেদিনের ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

এরপর শচীনদার সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। আমার সঙ্গীত গুরু ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র গান শচীনদা ভীষণ ভালবাসতেন। বড়ে গোলাম আলিকে আমি বাবা বলতাম। কলকাতায় বাবার কোনও অনুষ্ঠান থাকলে শচীনদা গান শুনতে আসতেন। আমি তো যেতামই। এরকমই কয়েকবার শচীনদার সঙ্গে আমার দেখাটেখা হয়েছে। কথাবার্তা বিশেষ হয়নি।

শচীনদা যে আমাকে তাঁর ছবিতে গাইবার জন্য বম্বে নিয়ে গেলেন তাঁর ছবিতে কিন্তু প্রথমে গাইনি। গেয়েছিলাম সঙ্গীত পরিচালক অনিল বিশ্বাসের সুরে 'তারানা' ছবিতে সেটা ছিল লতা মঙ্গেশকর ও আমার ডুয়েট। শচীনদার কথায় বম্বে এসে অনিল বিশ্বাসের সুরে প্রথম গাইলাম আপনাদের এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে। আমিও জানি না কেন এটাই হওয়ার ছিল। আমরা একরকম ভাবি, হয় আর একরকম।

প্রতিদিন শচীনদার সঙ্গে দেখা হচ্ছে; আমার খবরাখবর নিচ্ছেন অথচ কোনও গান তোলাচ্ছেন না। হতে পারে যে ছবির জন্য উনি আমাকে ডেকেছেন তার সুর হয়তো তখনও তৈরি হয়নি। সুরের ব্যাপারে কতখানি বৈচিত্র্য ও নিখুঁত ব্যাপার ছিল তাঁর সেকথা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা গান, কতরকম সুর তার। শচীনদা হলেন কিংবদন্তী সুরস্রষ্টা।

অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে বম্বেতে আমার বড়দাই যোগাযোগ করেন। অনিলদা বাঙালি আর বাঙালিদের উনি খুব পছন্দ করতেন। শচীনদাও তাই। আজকাল শুনি বম্বেতে বাঙালি বাঙালিকে দেখে না। আগে এরকম ছিল না। কলকাতা থেকে বম্বে গেলে বাঙালি বাঙালির সহযোগিতা পেত।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লতার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ও প্রায়ই আমার কাছে আসত। আমিও মাঝে মাঝে যেতাম ওর বাড়িতে। লতার মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন মমতাময়ী।

সেই সময় সান্তাক্রুজে সুকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম গায়ত্রী। আমি গায়ত্রীদি বলতাম। একসময় ওঁরা চন্দননগরে থাকতেন। কলকাতায় গায়ত্রীদির সঙ্গে আমার পরিচয়। ওঁরা যখন শুনলেন, আমরা বম্বে এসেছি আমাদের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এলেন। সুকুমারবাবু ও গায়ত্রীদিকে শচীনদাও খুব স্নেহ করতেন।

সুকুমারবাবুরা চার ভাই একসঙ্গে থাকতেন। সকলে বম্বেতেই সেট্‌ল করেছিলেন। সুকুমারবাবুই বড়। শচীনদা এঁদের বাড়িতে প্রায়ই খেতে যেতেন। খারের পরের স্টেশনই সান্তাক্রুজ, এভারগ্রিন হোটেল থেকে সুকুমারবাবুদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। আমরাও মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে যেতাম। গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া হত। আনন্দেই কাটত সময়।

বম্বেতে শচীনদা আমাকে পিতৃস্নেহে বেঁধে রেখেছিলেন। সুরকার নৌশাদের কাছে আমাকে নিয়ে যান। নৌশাদ আমার গান শুনলেন। শচীনদা বসেছিলেন। সি রামচন্দ্রও আমার গান শুনেছিলেন। সুরকার মদনমোহনের গান তো আমি গেয়েইছি। তবে সেটা তেমন কিছু নয়। অতি সাধারণ গান।

এই যে বছর দুয়েকের মতো বম্বেতে ছিলাম, হিন্দি ছবির বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি। শচীনদার তো দুটো-তিনটে ছবিতে গেয়েছি। প্রথম ছবিটার নাম 'সাজা', পরের ছবিটা 'সাজ'।

মাত্র দুটো বছর তো বম্বে ছিলাম। তার মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করেছি। সেই দিক থেকে বিচার করলে ওই অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি গোটা পনেরো-ষোলো ছবিতে গেয়ে ফেলেছিলাম।

শচীনদা কীভাবে আমাদের গান তোলাতেন বলি। উনি তো কাঠবাঙাল ছিলেন। বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। প্রথমে গানটা আমাকে তুলিয়ে দিলেন। বলতেন, সন্ধ্যা তুমিও গানটা নিয়ে একটু ভাবো। সাজা ছবির গান তোলানোর সময় প্রায়ই আমি চলে যেতাম শচীনদার ঘরে। আজকে গেলাম আবার দু'দিন পরে একটু গেলাম। এভাবে দিন কয়েকের মধ্যেই গান তোলা হয়ে যেত।

বম্বেতে হিন্দি গানের তো আলাদা একটা ধারা আছে। এক একজন সঙ্গীত পরিচালকের এক একরকম ধারা থাকে। শচীনদার একরকম ধারা ছিল, অনিলদার আর একরকম।

শচীনদার তোলানোর পর ওই গানটা নিয়ে সবসময় নাড়াচাড়া করতাম। ঘুরছি ফিরছি বা টুকটাক কাজকর্ম করছি সঙ্গে সঙ্গে গানটা গুনগুন করে গাইছি। এভাবে বেশ প্র্যাকটিস হয়ে যেত।

শচীনদার সঙ্গে যেদিন রেকর্ডিং করতে বেরতাম আমার বেশ মজা লাগত। উনি তো ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। কাঁধে ঝুলিয়ে নিতেন শান্তিনিকেতনি ব্যাগ পায়ে কোলাপুরি চটি অথবা পামশু। আপাদমস্তক একজন বাঙালি। শচীনদা দাদা আর আমি খার স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে সোজা মহালক্ষ্মীতে পৌঁছে গেলাম। শচীনদা যাতায়াত করতেন ফার্স্ট ক্লাসে। মহালক্ষ্মীতে সেই সময় ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরি নামে একটা স্টুডিও ছিল। ওখানই আমি রেকর্ডিং করেছি। রেকর্ডিং করেছিলেন প্রখ্যাত রেকর্ডিস্ট মীনু কাত্রাক।

১৯৪৯ সালের শেষাশেষি 'বাবা' ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র কাছে আমি 'গাণ্ডা' বেঁধেছিলাম। গাণ্ডা বাঁধা একটা অনুষ্ঠান। সঙ্গীত গুরু এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিষ্য বা শিষ্যা হিসেবে কাউকে গ্রহণ করেন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি আমার হাতে একটা লাল সুতো বেঁধে দিলেন। তারপর একটু ছোলা-গুড় আমার মুখে তুলে দেন। আমিও তাঁকে সামান্য ছোলা-গুড় খাইয়ে দিলাম। এটাই পদ্ধতি ছিল।

এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। জ্ঞানদা আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। তিনি তখন থাকতেন প্রাচী সিনেমাহলের কাছে, পঁচিশ নম্বর ডিকসন লেনে। তাঁর বাড়িতেই আমার গাণ্ডা বাঁধা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ওটা ছিল জ্ঞানদার আদি বাড়ি। ওখানে বাবার কাছে বেশ কিছুদিন আমি শিখেছি। বাবার কাছে যখন গাণ্ডা বেঁধেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারোর কিছু বেশি।

বাবা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গান গেয়ে বেড়াতেন। অনেক জায়গায় তাঁর শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। খবর পেলাম বাবা বম্বেতে। দাদা একদিন বললেন, শচীনবাবু, খাঁ সাহেব তো এখানেই। সন্ধ্যার বাবার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে। শচীনদা বললেন, আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি।

শচীনদা ঠিক খবরাখবর নিয়ে দাদাকে একদিন বললেন, চলো খাঁ সাহেবের কাছে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। আমরা তিনজনে মিলে বাবার কাছে গেলাম। উনি তো আমাদের দেখে ভীষণ খুশি। অনেকদিন আগের কথা তো। সম্ভবত বাবা সেই সময় ব্রিচ ক্যান্ডি নার্সিং হোমের কাছাকাছি কোনও এক জায়গায় উঠেছিলেন। উনি দাদাকে একটা কথা বলেছিলেন, দেখো বেটা, বেটিকো কভি সামকে বক্ত মত লেয়ানা ইধার।

বাবার একথা বলার একটা বিশেষ কারণ ছিল, তখন বুঝতে পারিনি এখন বুঝি। সেই সময় ব্রিচ ক্যাণ্ডির আশপাশ এলাকায় বাইজীরা থাকতেন। আমি তো বাবার মেয়ের মতো। উনি চাননি সন্ধের সময় ওই এলাকার মধ্যে দিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি। এরপর বাবার কাছে আমি সকালের দিকেই যেতাম।

বাবা ওখানকার একজন তবলচি ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমি হোটেলে যখন প্র্যাকটিস করতাম উনি আমার সঙ্গে বাজাতেন। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে শচীনদার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রায়ই এভারগ্রিন হোটেলে আসতেন। আমাকে প্র্যাকটিস করতে দেখে বলতেন, বাঃ দারুণ প্র্যাকটিস হচ্ছে। মান্নাবাবু বেশ মজা করে কথা বলেন। সেই সময় এভারগ্রিন হোটেলে হিন্দি ছবির এক সময়ের নামী চরিত্রাভিনেতা ইফতিকার থাকতেন। এছাড়া এরও দু'একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকতেন। তাঁরা পরবর্তীকালে হিন্দি ছবিতে বেশ নাম করেছিলেন।

আমি যে সময়টা বম্বে ছিলাম তখন হিন্দি ছবির প্লে-ব্যাকের জগতে ক্রমশই আলাদা একটা জায়গা করে নেওয়ার পথে লতা। নূরজাহান তো তার বছর কয়েক আগেই ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গেছেন। তখনও আশা ভোঁশলে তেমন করে আসেনি। তবে গীতা দত্ত খুব গাইছে। অন্যান্যদের মধ্যে শামশাদ বেগম, রাজকুমারী এঁরা রয়েছেন। শামশাদ তখন বেশ বড় মাপের গায়িকা। গীতারও প্রচণ্ড নাম।

আমি বম্বে ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার পর শচীনদা আমাকে বলেছিলেন, ইস্ সন্ধ্যা তুমি বম্বে ছেড়ে চলে এলে? ওখানে থাকলে তুমি কত কাজ করতে। আসলে সেই সময়টা—লতা, আমি গীতা আমাদের নিয়ে বেশ জমে উঠেছিল।

শচীনদার সাজা ছবিতে খুব মজা হয়েছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একটা ডুয়েট ছিল। ডুয়েটে একটা কিছু করার ছিল। শচীনদার ব্যাপার তো। উনিও মজার মানুষ। কী হল তাই শুনুন। টঙোলি গো টঙোলি/নাকে মুখে চুনকালি/নাকে মুখে চুনকালি'—এরকম দু'তিনটে মজার লাইন উনি জুড়ে দিলেন গানটার সঙ্গে। এগুলো কোরাসে, তারপর গান আসছে 'আ গুপচুপ গুপচুপ পেয়ার করে/ছুপ ছুপ আঁখে চার করে।' পরে এ গানটা রেকর্ডেও বেরিয়েছে। সাজা-তে আমার সোলো ছিল—'ইয়ে বাত কোই সামঝায়ে রে/কিঁউ আজ নজর শর্মায়ে রে।'

শচীনদারই একটা ছবিতে তালাতের সঙ্গে আমার ডুয়েট ছিল। নামটা এ মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৫৫ সাল থেকে পর পর দু'বছর কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে বম্বে-বাংলা মিলিয়ে বিরাট ফাংশন হয়েছিল। কোনও আর্টিস্ট বাদ ছিল না। নার্গিস, গুরু দত্ত থেকে শুরু করে লতা, রফি, মুকেশ, গীতা বম্বের প্রায় সকলেই এসেছিলেন। কিশোর (কিশোর কুমার) কিশোর হয়নি তখনও। ও আসেনি। আশাও ছিল না। বাংলার সমস্ত সঙ্গীত শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেন। দু'দিন ধরে ভোর তিনটে-চারটে পর্যন্ত এই ফাংশন হয়। পঞ্চাশ হাজারের মতো দর্শক ছিলেন। একবার সিনে অ্যাডভান্স পত্রিকা এই ফাংশনের আয়োজন করেছিল। বি সি আগরওয়াল তো ছিলেনই। প্রখ্যাত সাংবাদিক সরোজ সেনগুপ্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সরোজদার তখন কী নাম! ওঁর মতো সাং

বাদিককে সকলেই ভয় করত। সিনে অ্যাডভান্স পত্রিকায় কী লিখতেন, দারুণ আর্টিকেল সব। এ প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক এন কে জি-র কথাও বলতে হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখতেন। তিনিও একজন বিরাট সাংবাদিক। এন কে জি-র পুরো নাম নির্মল কুমার ঘোষ। সরোজদা, নির্মলদা এঁদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি। এঁদের মতো নির্ভীক সাংবাদিক এখন কোথায়।

'৫৫ কি '৫৬ সালে রঞ্জি স্টেডিয়ামের ওই ফাংশনে স্টেজে গাইতে উঠে দেখি, হিন্দি ছবির নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান একটু আড়ালে বসে আছেন। উনি নাচবেন। ওয়াহিদা তখনও এতটা পলিশড্ নন। চোখাচোখি হল। আমরা কেউ কাউকে চিনি না। উনি হাসলেন, আমিও একটু হাসলাম। ওই যেরকম হয় আর কি।

শচীনদাও ওই ফাংশনে নিমন্ত্রিত। বাংলা ছবির বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ ছিলেন। শচীনদা উইঙ্গসের পাশে বসে। আমি দৃষ্টি ছবির 'বলে কুহু কুহু কোয়েলা' গানটা ধরলাম। শুরুতে পাপিয়ার ডাকের মতো ক্রমেটিক নোটসের একটা ব্যাপার ছিল। কোমল ও শুদ্ধ স্বরে যাব। ওটা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। তারপরেই মূল গানটা শুরু। পরে নচিদাই আমাকে বলেছিলেন, যেই না পাপিয়ার ডাক ধরেছি শচীনদা 'গেল গিয়া' 'গেল গিয়া' বলে হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। শচীনদার আশঙ্কা ছিল ক্রমেটিক নোটসটা আমি ঠিকভাবে করতে পারব কি না। আসলে ওটা ভীষণ শক্ত। শচীনদার শঙ্কিত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ ছিল। নচিদা হাসতে হাসতে বললেন, সন্ধ্যা তুমি তো ওই নোট্স ধরলে, ওদিকে শচীনদা 'গেল গিয়া' 'গেল গিয়া' করতে লাগলেন। তুমি জায়গাটা নিখুঁত করতে পেরেছ দেখে শচীনদার মুখ আবার প্রশান্ত হয়ে ওঠে।

আমি সত্যিই ভাবি শচীনদার মতো এরকম মানুষ আজকাল কোথায়? এঁদের স্নেহ-মমতায় কোনও খাদ ছিল না। ভালবাসতেন হৃদয় উজাড় করে। যাই হোক, শচীনদার ওই 'গেল গিয়া'-র কথা মনে পড়লেই আমি হাসতে হাসতে মরি।

শচীনদা তো বম্বেতেই থাকতেন। মীরা বউদি মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে বম্বে আসতেন। মাসখানেক থেকে আবার কলকাতায় ফিরতেন। যতদিন বম্বেতে ছিলাম এরকমই দেখতাম। মীরা বউদির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কলকাতায় তাঁর সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে। কীভাবে আলাপ তা আগে বলেছি।

বম্বেতে বউদির সঙ্গে তো অনবরতই দেখা হত। উনিও এভারগ্রিন হোটেলে থাকতেন। রাহুলও থাকত। রাহুলের তখন তেরো-চোদ্দ বছর।

খার বাজারটা এভারগ্রিন হোটেলের খুব কাছে। একদিন দুপুরবেলা পৌনে তিনটে টিনটে হবে, আমি বই পড়ছিলাম। সেদিন আর বেরইনি। হঠাৎ দেখি, রাহুল জানালায় ধাক্কা মারছে—সন্ধ্যা পিসি সন্ধ্যা পিসি। দেখি, রাহুল দাঁড়িয়ে।

বললাম, কীরে কোথায় গিয়েছিলি।

রাহুল বলল, বাজারে।

বাজারে কী করতে গিয়েছিলি? আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। এসময় বাজারে।

বলল, কলা কিনতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, রাহুলের হাতে বড় বড় তিনটে সিঙ্গাপুরী কলা।

রাহুল হেসে বলল, বাবার একটা, মায়ের একটা, আর আমার একটা। রাহুলের কথা শুনে আমি খুব মজা পেয়েছিলাম। এই আর কি। সেই ছেলেমানুষ রাহুল যে এতবড় সঙ্গীত পরিচালক হবে তা আমি কল্পনাও করিনি। প্রচণ্ড কষ্টও হয়, রাহুল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বছর দুয়েক বম্বেতে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। আসলে কেন জানি না বম্বে ভাল লাগেনি। প্রচুর সুযোগ ছিল। সাফল্যের হাতছানিও কিছু কম ছিল না সেখানে। তবুও কলকাতার কথা ভেবে আমার ভীষণ মন খারাপ করত। চোখে জল আসত। মন পড়ে থাকত কলকাতায়। বাংলার মাটির টান উপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তবে বম্বে ছেড়ে চলে আসার সময় শচীনদাকে আর জানাইনি। ভয় পেয়েছিলাম, যদি শচীনদা আটকে দেন। জানাইনি বলে উনি হয়তো আমার ওপর রাগ করেছিলেন। আমার এরকম করা সত্যিই উচিত হয়নি!

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৯৩১ সালে কলকাতায় জন্ম। বাবা কান্তিভূষণ নির্বাক যুগের চিত্রাভিনেতা। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পুলক স্কটিশ চার্চের ছাত্র ছিলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করে আইনবিদ্যা নিয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপনা করেন কিছুকাল। আইনবিদ্যা চর্চা করেন। ১৯৪৮ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়েসে 'অভিমান' চলচ্চিত্রের জন্য গান রচনা করেন। বহু উল্লেখযোগ্য ছবিতে স্মরণীয় অসংখ্য গানের স্রষ্টা। বাংলা ও হিন্দি জগতের এমন কোন খ্যাতিমান গায়ক গায়িকা নেই যাঁরা তাঁর কথায় গান করেননি। গঙ্গার বুকে এক দুর্ঘটনায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।]

...জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তখন কলের গানে ঘরে ঘরেই একটি গান বাজতে শুনতাম। ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বরে একটি পল্লীগীতি 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহনে...।' যতদূর জানি এটাই কুমার শচীন দেববর্মণের প্রথম রেকর্ড এবং প্রথম রেকর্ডটিই সুপারহিট। এরপরে উনি রেকর্ড করলেন 'নিশীথে যাইও ফুলবনেরে ভ্রমরা...।' সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম গানটি পূর্ব বাংলার এক গ্রাম্য কবি শেখ ভানুর রচনা। গানটির প্রথম অন্তরায় ছিল জ্বালায়ে দিলের বাতি। জেগে রব সারারাতি গো। কুমার শচীন দেববর্মণ যখন গানটি রেকর্ড করেন তখন কবি জসিমউদ্দিন 'দিল' শব্দটি বদলে করে দেন 'জ্বালায়ে চান্দের বাতি/জেগে রব সারারাতি গো।' এই রেকর্ডটির পরে 'নতুন ফাল্গুন যবে' 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'আমি ছিনু একা' ইত্যাদি অজস্র হিট গান তখন খুব শুনতাম। শচীন দেববর্মণ

ছিলেন সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। হিমাংশু দত্তের সুর দেওয়া অজয় ভট্টাচার্যের লেখা 'আলোছায়া দোলা উতলা ফাগুনে', 'যদি দক্ষিণা পবন আসিয়া ফিরেগো দ্বারে', 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি' এই রকম কিছু গান ছাড়া ওঁর নিজের গাওয়া অনবদ্য সব বাংলা নন-ফিল্মি গানের অধিকাংশই ওঁর নিজের সুর। কিন্তু ওঁর সুরে অন্য কোনও শিল্পী নন-ফিল্মি গান গেয়েছেন কিনা স্মরণে আসছে না। উনি নিজে অবশ্য অন্য সুরকারের সুরে বাংলা ছবিতেও গান গেয়েছেন একথা মনে আসছে। সুরসাগর হিমাংশু দত্তের সুরে সে যুগের সুপারহিট ছবি 'জীবন সঙ্গিনী'তে গেয়েছিলেন অজয় ভট্টাচার্যের লেখা দুটি গান ১। 'জনম দুখিনী সীতা/লাঞ্ছিতা তুমি চির বঞ্চিতা' ২। 'কে যেন কাঁদিছে আকাশ ভুবনময়...'

শচীন দেববর্মণ প্রচুর বাংলা ছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছেন। সেখানে গেয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরা। কিন্তু শচীন দেবের নন ফিল্মি গান যেমন প্রকাশ হওয়া মাত্র সুপারহিট হয়েছে বাংলা ফিল্মের গান তেমন হয়নি। এ এক অবাক করা সত্য। বাংলা 'ছদ্মবেশী', 'জজ সাহেবের নাতনী' এমন দু-একটি ছবি ছাড়া কোনও ছবির গানই তেমন হিট করেনি। 'জজ সাহেবের নাতনী' ছবিতেই উনি সুযোগ দেন বিমলভূষণকে। বিমলভূষণের গাওয়া 'বড় নষ্টামি দুষ্টামি করে চাঁদরে...' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

শচীনদা বৃহত্তর সাফল্যের সন্ধানে চলে গেলেন মুম্বই। কিন্তু বাংলা ছাড়লেও বাংলা গানকে ছাড়েননি। মুম্বাই-তে অনিল বিশ্বাস, রামচন্দ্র পাল-এর পর সংগীত জগতে আসা এই বাঙালি সুরকার এস ডি বর্মণ রাতারাতি কাঁপিয়ে দিলেন মুম্বই ফিল্ম জগৎকে। ইতিমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দেও মুম্বই-তে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্য ওঁর ভাইপো মান্না দেকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ওপর একটি হিন্দি ছবিতে গান গাইবার জন্য কে সি দে কলকাতা থেকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে মুম্বই নিয়ে গিয়ে গান গাওয়ালেন। কিন্তু কিছু হিন্দি ছবি করার পবে কে সি দে দেখলেন স্বাস্থ্য এবং ভাগ্য ওঁর প্রতিবন্ধকতা করছে। উনি ফিরে এলেন কলকাতায়। মান্না দে কিন্তু ফিরলেন না। রয়ে গেলেন মুম্বই-তে এস ডি বর্মণের সহকারী হয়ে।

মান্না দেকে প্রবাসে পায়ের নীচে একটু মাটির সন্ধান করতে কী কষ্ট করতে হয়েছে মান্নাদা তা অকপটে আমায় বলেছেন। যখন পায়ের নীচে মাটি পেয়ে গেছেন তখনও চলেছে এই স্ট্রাগল। চোখের কোণে জলের রেখা এনে আমায় বলেছেন, জানেন 'তালাশ' ছবির 'তেরি নয়না তালাশ করকে...' এই গানটা তুলতে গেছি শচীনদার মিউজিক রুমে। ওখানে পরিচালক এলেন গান শুনতে। শচীনদা আমাকে বললেন, মানা তুই গেয়ে শোনা (শচীনদা মান্নাদাকে আজীবন মানা বলে ডেকে এসেছেন)। পরিচালক মান্নাদার সামনেই বলে উঠেছেন, মান্না দে গাইবেন নাকি? মুকেশ কী হল? শচীনদা জবাব দিয়েছেন, মুকেশ এ গান গাইতে পারবে না। পরিচালক শচীনদাকে সোজাসুজি বললেন, এমন গান কেন বানালেন যা মুকেশ গাইতে পারবে না? শচীনদা তখন ওঁর নিজস্ব স্টাইলে হিন্দিতে উত্তর

দিলেন, তালাশ ছবি যদি এস ডি বর্মণ করে তবে এই গানের সুরটাই থাকবে। আর গাইবে মানাই। তোমার অপছন্দ হলে তুমি অন্য মিউজিক ডিরেক্টর নাও। শচীনদা একরকম জোর করেই ও গানটি মান্না দেকে দিয়ে গাইয়েছিলেন এবং সবাই জানেন তার ফল কেমন হয়েছিল। পরিচালক মশাই সিলভার জুবিলিতে বলেছিলেন, এস ডি বর্মণ সাব আপনি আমাদের দাদা। আপনি চিরদিনের দাদা।

সবাই ওঁকে দাদা মানত। মুম্বই-তে হেমন্তদা যথারীতি হাসতে হাসতে আমাদের বলতেন, যাচ্ছি শচীনদার গান তুলতে। কিন্তু কে গাইবে কেউ জানে না। মান্নাবাবু, তালাত, মুকেশ, রফি সবাই গান তুলবেন। যাঁর কণ্ঠে এই বিশেষ গানটি ওঁর পছন্দ হবে সেই শেষ পর্যন্ত রেকর্ড করবেন। এ রকম ব্যাপার তখনকার মুম্বই-এর সব শিল্পীরাই হাসিমুখে মেনে নিতেন। কারও কোনও অনুযোগ ছিল না দাদার প্রতি। এহেন এস ডি বর্মণকে দিয়ে আমার লেখা গান গাওয়ানোর জন্য ধরলাম সহৃদয় সুশীলদাকে। আজকের সংগীত জগতের সবার প্রিয় 'মেলডি'-র দুলাল চক্রবর্তীর পিতা সুশীল চক্রবর্তী ছিলেন শচীনদার খুবই কাছের মানুষ। শচীনদা মুম্বই থেকে যখন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন তখনও নিয়মিত ঘড়ি- ধরা সময়ে ওই মেলডির পুরনো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গল্পগুজব করতেন। ওখানেই আমি প্রথম দেখি শচীনদার কলকাতার পুরনো সহকারী সুরশিল্পী কালীপদ সেনকে।

যাই হোক, সুশীলদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম, খোঁজ নিতাম কবে শচীনদা আসবেন। একসময় আমার ভাগ্য প্রসন্ন হল। সুশীলদা বললেন, ওমুক তারিখে সকালে ঠিক ওমুক সময়ে তুমি এসো। কর্তা কিন্তু খুবই টাইমের মানুষ। দেরি কোরো না। গেলাম। সুশীলদা আলাপ করালেন। আমি প্রণাম করলাম। শচীনদা বললেন, ওহো তুমি পুলক। মানা আমার কাছে তোমার খুবই সুনাম করে। খুব কম কথা বলতেন শচীনদা। এইটুকু বলেই চুপ করে গেলেন। সুশীলদা ধরিয়ে দিলেন পুলক গান নিয়ে কলকাতার বাড়িতে কবে যাবে। তখন কে একজন বললেন (বিষয়টা ঠিক মনে নেই, ধরা যাক) জানেন কর্তা কাল দেশপ্রিয় পার্কের ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে দেখি একটা পাগলা ষাঁড় ছুটে আসছে। একেবারে আমার সামনে। শচীনদার চোখ তখন ঘড়ির দিকে চলে গেছে। তিনি বলে উঠলেন, চল রে ভাই।

ব্যাস, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন তিনি। শুনলেনই না আর কোনও কথা। এমনই টাইমের মানুষ ছিলেন শচীনদা।

নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে পকেটে গান নিয়ে গেলাম শচীনদার কলকাতার বাড়ি সাউথ এন্ড পার্কে। ঘরে বসলাম। ওদিকের দরজায় হয়তো বউদি উঁকি দিয়েছিলেন। শচীনদা আমাকে ওঁর নিজস্ব ভঙ্গি আর ভাষায় বললেন, চা খাবা নাকি ভাই? অ্যাত বেলায় খাবা? তারপর আমায় কিছু বলার অবকাশটুকু না দিয়ে বললেন, না না অ্যাত বেলায় চার প্রয়োজন নেই।

এবার আমাকে হারমোনিয়ামটা দেখিয়ে বললেন, শোনাও। আমতা আমতা করে আমি

বললাম, আপনি ভুল করছেন। আমি গান গাই না, গান লিখি।

শচীনদা বললেন, হু হু শোনাও। আবার আঙুল দিয়ে দেখালেন হারমোনিয়ামটা। এরকম বার কয়েক হবার পর ছোটবেলায় বাবার কাছে অরগান বাজাতে শেখা আমি মরিয়া হয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কী একটা গান গেয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিলেন উনি। বললেন, ব্যস ব্যস আর নয়। তোমার হবেরে ভাই তোমার হবে। আমি এতক্ষণ তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম তোমার সুরবোধ কেমন। ভাল গান লিখতে হলে তোমাকে গান জানতেই হবে। বম্বের সব রাইটাররাই রীতিমতো গাইতে জানেন। ওঁরা যখন ওঁদের লেখা গান মিউজিক ডিরেক্টরকে দেন সে গানটা নিজের সুরে গেয়ে শুনিয়ে তবে দেন। তুমিও যদি সেটা করতে পার কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না ভাই।

শচীনদার এ কথা যে কত খাঁটি তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরেই। রেকর্ডিং-এ কিশোরকুমার অনুপস্থিত হওয়ায় ছবির একটি ডুয়েট গান লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে গাইতে দ্বিধা করেননি সে ছবির বিখ্যাত গীতিকার আনন্দ বক্সি। কাঁচ কা গুড়িয়া ছবিতে সম্ভবত একটা একক গানও গেয়েছিলেন আনন্দ বক্সি। এখনকার নামী মহিলা গীতিকার মায়া গোবিন্দকেও দেখেছি ওঁদের দেশওয়ালি গান গেয়ে গেয়ে শুনিয়ে সুরকারদের দিতে। অনেক সময়ই সুরকারও সেই সুরটি প্রয়োগ করেছেন সেই গানে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুম্বই-এর খ্যাতনামা গীতিকার ইন্দিবরও ওঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে খাওয়াতে কত নতুন নতুন হিন্দি গান শুনিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমিও আমার গলাতে গেয়ে অনেক নতুন নতুন বাংলা গান শুনিয়েছি।

যাই হোক, শচীনদার কাছ থেকে আমি কথা আদায় করে নিলাম উনি আমার গান গাইবেন। বললেন, পুজোর গানের জন্য ঠিক ওমুক মাসে ওমুক তারিখে আমাকে মুম্বই-তে যেতে। আমিও তারিখটা সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজে লিখে পকেটে পুরলাম।

মুম্বই-এ থাকার কিছুদিন পরেই লক্ষ করেছিলাম শচীনদার গাওয়া বাংলা আধুনিক গানের সুরের স্টাইলও খুব বদলে গেছে। অবশ্য হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি ছাড়ার আগেই তার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। মোহিনী চৌধুরীর লেখা 'হায় কী যে করি এ মন নিয়া' এবং 'এই চৈতি সন্ধ্যা যায় বৃথা...।' মোহিনী চৌধুরীর লেখা আরও দুটি গান, একটি গেয়েছিলেন বউদি অর্থাৎ মীরা দেববর্মণ 'আজ দোল দিল কে আমার হিয়ায়' অন্যটি শচীনদার সঙ্গে বউদির দ্বৈতসংগীত 'ওই গায় যে পাপিয়া গায় কোয়েলা গায়।' এরপর শচীনদা এইচ. এম. ভি.-তে গাইলেন মোহিনী চৌধুরীর লেখা আরও দুটি গান 'ভুলায় আমায় দু'দিন' এবং 'কে আমাকে আজও পিছু ডাকে।' এর পরেই রবি গুহমজুমদারের লেখা বিখ্যাত গান 'মন দিল না বধু/মন নিল যে শুধু/আমি কী নিয়ে থাকি'—থেকে শচীনদা ভিন্নতর হয়ে গেলেন।

দিন কেটে যাচ্ছিল। হাতের কাছে বাংলা গানের গীতিকার না পেয়ে বউদি মীরা দেববর্মণই

লিখতে লাগলেন শচীনদার বাংলা আধুনিক গান। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'শোন গো দক্ষিণ হাওয়া প্রেম করেছি আমি', 'রূপে বর্ণে ছন্দে ছন্দে জীবন জাগালে তুমি'—ইত্যাদি গান। এদিকে আমারও সময় এসে গেল শচীনদার দেওয়া তারিখে মুম্বই যাওয়ার। নির্দিষ্ট তারিখে লিংকিন রোডে শচীনদার 'জেট' বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। শচীনদা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, আপনি তো এই সময়েই এখানে আসতে বলেছিলেন। শচীনদা বোধহয় আমার ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হ হ, তুমি বসো।

ঘরে আরও লোকজন ছিলেন। এক ভদ্রলোক আমার সামনেই তার হাতের ছোট টিনের সুটকেশ খুলে ওঁকে দেখালেন নোটের গোছা। শচীনদা ওঁর ভঙ্গিতে বললেন, তুম জিতনা রূপাইয়া দেখাও হাম তুমারা পিকচার নেহি করেঙ্গা। ওই ভদ্রলোকের অনেক কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে শচীনদা তাকে বিদায় দিলেন।

ঘরের মধ্যে বসা অন্য এক ভদ্রলোক বললেন, দাদা, সাত সকালে এতগুলো টাকা ছেড়ে দিলেন? উনি বললেন, কুয়া জান? পাতকুয়া? পাতকুয়া থেকে একসঙ্গে সব জল তুলে নিলে কুয়া শুকিয়ে যায়। কুয়াতে জল জমবার সময় দিতে হয়। মিউজিক ডিরেকশনও তাই। টাকার লোভে একগাদা ছবিতে কাজ করলে আমি ফুরিয়ে যাব। আমার ইয়ারলি কোটা আছে। তার বেশি আমি কাজ করি না। আমার এ বছরের কোটা কমপ্লিট। যে যত টাকাই দিক এ বছরে আর আমি ছবি করব না।

শচীনদা ওঁর এই উক্তির প্রমাণ রেখে গেছেন। কত নামী দামি সুরকার হইহই করে ছবি করেন। তারপর নিঃশব্দে কবে কখন সরে যান কেউ তার খবর রাখে না। কিন্তু এস ডি বর্মণ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁর ডিমান্ড রেখে গেছেন। ফুরিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করেননি। দিয়ে গেছেন নিত্য নতুন সুরের স্টাইল।

সেদিন নিজের বাড়িতে শচীনদা চা খাওয়ালেন। ঘরের লোকদের বিদায় দিয়ে বললেন, কী গান লিখেছ শোনাও। প্রথম গানটি শুনেই বললেন, এ গানটি যে গাইবে সুপারহিট হয়ে যাবে। কিন্তু ভাই আমি রেকর্ড করতে পারব না। চমকে উঠে বললাম, সে কী! শচীনদা বললেন, না পুলক হোমফ্রণ্টে গণ্ডগোল ভাল না। তোমার বউদি গান লিখেছেন। আমি বানিয়ে ফেলেছি। তবে তোমায় আমি ফেরাব না। এখনই পঞ্চম আসবে। পঞ্চম দারুণ গাইয়ে। ওকে দিয়ে তোমার গান রেকর্ড করাব। (পঞ্চম তখন থাকত প্রথমা স্ত্রী রীতা পটেলের সঙ্গে সান্তাক্রুজের কাছে একটা সুন্দর বাড়িতে)।

বসে রইলাম। বসে বসেই ভাবতে লাগলাম স্বয়ং শচীন দেববর্মণ যখন বলেছেন গানটা সুপারহিট হবে তখন নিশ্চয় আমার গানটায় কিছু একটা আছে। কিন্তু কাকে দি। হঠাৎ মাথায় এল অখিলবন্ধু ঘোষের নাম। সেদিনই মুম্বই থেকে একটা পোস্টকার্ডে গানটা পাঠিয়েছিলাম কলকাতায়। অখিলবন্ধু নিজের সুরে গেয়েছিলেন সেই গান 'ও দয়াল বিচার

করো। দাওনা তারে ফাঁসি/আমায় গুণ করেছে। আমায় খুন করেছে ও বাঁশি...।'

শচীনদার ভবিষ্যৎবাণী বা আশীর্বাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। সত্যি সুপারহিট হল সে গান। যা হোক, পঞ্চম আসছে না। সময় কাটাবার জন্য বললাম, বউদির কী গান রেকর্ড করছেন একটু শোনাবেন?

হারমোনিয়ামটা নিলেন উনি। একটু বাজিয়ে বললেন, না থাক। এখনও রেকর্ড হয়নি। আমি অনুরোধ করলাম, রেকর্ড নাই বা হল। আপনার নতুন গান শুনতে দারুণ ইচ্ছে করছে।

শচীনদা বললেন, তবে একটু শোনো। কথাটা বলেই আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি আবার মেরে দেবে না তো ভাই? এখনও রেকর্ড হয় নাই। আমার সুর আমার গানের আইডিয়া কেউ মেরে দিলে বুকে বড্ড ব্যথা লাগে। শচীনদা কখনও কাউকে রেকর্ড না হওয়া কোনও গান শোনাতে চাইতেন না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একবার আমার সঙ্গে আমার সুরকার বন্ধু সুধীন দাশগুপ্ত গিয়েছিলেন শচীনদার বাড়িতে। সুধীনবাবুর অনেক অনুরোধে উপরোধে অনেক বাহানা দেখিয়ে আমাকে রীতিমতো অবাক করে দিয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসলেন, শচীনদা। সুধীনবাবু নিশ্চয় আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে ভাবলেন একটা অসাধারণ ব্যতিক্রমী ব্যাপার উনি ঘটাতে পারলেন। শচীনদা হারমোনিয়ামটা খুললেন। তারপর হঠাৎ একটা বেসুরো 'ডিসকর্ড' সুর বাজিয়েই বিরক্তিতে বলে উঠলেন, ধাস! না সুধীন হবে না। বেসুরো হারমোনিয়ামটা আমার মেজাজটাই নষ্ট করে দিল। হারমোনিয়ামটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন শচীনদা। আর আমি মনে মনে হেসে গড়িয়ে পড়লাম।

যাই হোক, আবার আমি ফিরে আসি সেদিনের ঘটনায়। আমি নিশ্চয় সৌভাগ্যবান। আমায় একটু শোনালেন ওঁর রেকর্ড না হওয়া নতুন গান। শুনলাম এক অপূর্ব সুর, অপূর্ব কথা, অপূর্ব গানের পূর্বাভাষ। শচীনদা গান থামিয়ে বললেন, বলরে ভাই জমবে তো? এ কিন্তু 'আমি ছিনু একা বাসর জাগায়ে' নয় এ ভিন্ন গান। 'আমি ছিনু একা' সপ্তাহে চারটে বানাতে পারি। কিন্তু এ গান বানাতে লাগে চার চারটি মাস। কমার্শিয়াল গান বানানো ভারী শক্তরে ভাই। মনে রাখবে তোমার বায়ার সতেরো থেকে সাতাশ, তাদের পছন্দ হলে তবে তোমার রেকর্ড কিনে বাড়ি যায়। তারপর তাদের বাপ-মায়েরা শোনে। সে গান পপুলার হয়।

এমন সময় পঞ্চম ঘরে ঢুকল। ওকে চিনতাম অনেক আগে থেকে। ওর তখন 'পড়োশন', 'ভূতবাংলা' ছবির গান হিট করে গেছে। আমায় দেখেই বললে, আরে কবে এলেন? শচীনদা বললেন, পুলক দারুণ মডার্ন গান লেখে। আর তুমি তো মডার্ন গানে দারুণ সুর করো। রেকর্ড করো পুলকের গান।

পঞ্চম বলে উঠল, কী যে বলেন ড্যাডি। আপনি আমাদের থেকে অনেক অনেক

মডার্ন। কিন্তু বাংলা গান আমার আসে না। ও আমি গাইতেও পারব না। সুর করতেও পারব না।

শচীনদা বললেন, পুলক এখন তুমি বাড়ি যাও ভাই। কাল সকালে পঞ্চমের বাড়ি এসো। আমি মর্নিং ওয়াক সেরে ওর বাড়িতে আসব।

পরদিন সকালে গেলাম পঞ্চমের বাড়িতে। পঞ্চম-রীতা বিশাল প্রাতঃরাশ দিয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানাল। ঠিক সময় শচীনদা এসে গেলেন। এসেই বললেন, তোমরা সিটিং শুরু করো। আমি লতাকে বলেছি। লতা তোমার সুরে পুলকের কথায় গাইবে এবারের পুজোর গান। আর এটাই হবে আর ডি বর্মণের প্রথম বাংলা গান।

অগত্যা পঞ্চম আমায় বলল, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। অমুক সময় কলকাতায় আসছি। ইতিমধ্যে কিছু সুর আমি বানিয়ে রাখছি। আপনাকে নিয়ে কলকাতায় সিটিং-এ বসব।

অসাধারণ সুরকার আর ডি বর্মণের বাংলা গানের প্রথম গীতিকার আমি এ নিশ্চয় আমার সৌভাগ্য ! যথা সময়ে পঞ্চম কলকাতায় এল। গেলাম ওই সাউথ এণ্ড পার্কের বাড়িতে। পঞ্চম বলল, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। একেবারে খেয়েদেয়ে যাবেন। দেখলাম এলাহি খাবারদাবারের আয়োজন। শচীনদার ঠিক উল্টো। পঞ্চম সুর শোনাতে শুরু করল। মনে আছে পর পর আটটা সুর শুনিয়েই পঞ্চম বলল, যে দুটো আপনার ভাল লাগে লিখুন।

আমি তো বাঁশ বনে ডোমকানা। বললাম, আটটা সুরেই কথা বসাব। পঞ্চম হেসে উঠল। এখন আমরা ক্যাসেটের যতই বদনাম করি তখন যদি আজকের মতো ব্যবস্থা থাকত তাহলে আটটি গানের অমর ক্যাসেট জন্ম নিতে পারত। যাই হোক, লটারি করে দুটো গান বেছে নিলাম। মনে পড়ল ভূপেন হাজারিকার সুরে কী একটা ছবির জন্য লতার নাম দিয়ে লিখেছিলাম 'পরশ পেলেই ঘুমিয়ে পড়ি আমি লজ্জাবতী লতা।' অনিবার্য কারণে ও গানটা রেকর্ড হয়নি। কিন্তু লতাজি শুনেছিলেন। আমায় হাসতে হাসতে বলেওছিলেন, আমার নাম দিয়ে লেখা গানটা আমি শুনেছি। ভাল লেগেছে।

তৎক্ষণাৎ মাথায় এসে গেল এই লতার নাম দিয়েই পঞ্চমের একটা গান লিখি। লিখেছিলাম 'আমার মালতী লতা/কী আবেশে দোলে/আমি সে কথা জানি না/আমায় কে যে দেবে বলে।' উল্টো পিঠে লিখেছিলাম 'আমি বলি তোমায় দূরে থাক/তুমি কথা রাখো না।'

আবার বলি আমি সৌভাগ্যবান। আর ডি বর্মণের প্রথম বাংলা গানের গীতিকার হতে পেরেছি বলে। আর যে রেকর্ডে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অদ্বিতীয়া লতা মঙ্গেশকর।

এর কিছুদিন বাদেই ঊষা খান্নার সুরে চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের জন্য বাংলা গান লিখতে মুম্বইতে এলাম। তখন রোজ সকালে পঞ্চমের রেকর্ড না হওয়া বাকি সুরগুলোর ওপর কথা বসাতাম। পঞ্চম কিন্তু তখনও বাংলা গানের ওপর ততটা মন বসাতে পারেনি। প্রত্যেকটি

সুরই হিন্দিতে লাগাল এবং গানগুলো সুপারহিটও হল। আর একবার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মুম্বই-এর রাস্তায় শচীনদার বাড়ির সামনে দিয়ে আসছি। ওপরের বারান্দায় দাঁড়ানো শচীনদার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। দেখা করতে গেলাম। শচীনদা জিজ্ঞেস করলেন, কবে এলে? কার কাজে?

আমি উত্তর দিলাম মান্না দের সুরে এইচ. এম. ভি-র জন্য আশা ভোঁসলের পুজোর গান লিখতে।

শচীনদার বোধহয় তখন কোনও নতুন গানের সিটিং ছিল। আমাদের কথার মধ্যেই ঘরটায় অনেকে এসে গেলেন।

শচীনদা বললেন, কী গান লিখলে?

আমি বললাম, 'আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম/একটি তোমার সই গো/তুমি চোখের পাতায় লিখে দিলে/আমি হলাম তোমার সই গো।' গানটা শুনেই বাঙালি যাঁরা ছিলেন সবাই একসঙ্গে তারিফ করলেন। অবাঙালিরা বলে উঠলেন কেয়া মতলব? ওখানে আনন্দ বক্সিও ছিলেন। বাঙালিরা হিন্দিতে অবাঙালিদের গানের অর্থটি বুঝিয়ে দিতেই তারাও তারিফ করল। শচীনদা বললেন, কলকাতায় ফেরার দিন আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

ফেরার দিন দেখা করতে গেলাম। সেদিনও সিটিং ছিল। অনেকেই আসতে লাগলেন। তখন শচীনদার কী একটা গান বিবিধ ভারতীতে শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম সে কথাটা। শুনেই ওঁর সেই ব্যতিক্রমী হাসিটি হাসতে লাগলেন। বললেন, বিবিধ ভারতীতে আমার গান শুনলে? অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা পয়সা চায়। আম পয়সা দি না। তাই ওরা আমার গান বাজাতেই চায় না।

এরপর প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি নাকি গল্পও লেখ? তোমার যদি কোনও ফিফটি ফিফটি গল্প থাকে আমায় দাও। দেব আনন্দকে শোনাব। ও আমায় খুবই মানে।

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, ফিফটি ফিফটি গল্প সেটা কেমন?

শচীনদা যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, সিনেমায় কাজ করছ আর ফিফটি ফিফটি বোঝ না। হিরো হিরোইনদের সমান প্রেফারেন্স। কে একজন বললেন, রিহার্সালটা শুনে যান। আমি বসে গেলাম। রিহার্সাল শুনলাম 'কোরা কাগজ থা মন মেরা/লিখ দিয়া নাম উসনে তেরা'/আমি দুঃখ পাইনি। বরং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। যে বিষয়টা ব্যক্ত করতে আমার লেগেছিল এতগুলো কথা (আমি খাতার পাতায় চেয়েছিলাম একটি তোমার সই গো/তুমি চোখের পাতায় লিখে দিলে আমি হলাম তোমার সই গো) সেই ভাবটি আনন্দ বক্সি ব্যক্ত করেছেন কত কম কথায়, কত বেশি ঠাস বুনুনিতে। আনন্দ বক্সি তখন ওখানে ছিলেন না। ওঁকে আমার অজস্র প্রশংসা জানিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছিলাম।

শচীনদা প্রসঙ্গে আরও একটু বলি। সত্যি এক ভিন্নতর মানুষ ছিলেন এই এস ডি বর্মণ। কখনও কোনও কাজে কিছুতেই কম্প্রোমাইজ করতেন না। মান্নাদার কাছে গল্প শুনেছি

বোম্বেতেই একবার কী একটা রেকর্ডিং-এ ওঁর রিদিম কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না। তখন কী রিদম উনি চান সে কথা মিউজিশিয়ানদের বোঝাতে স্কোরিং থিয়েটারের মধ্যেই উনি আদ্দির পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন, এই দেখো, আমি বগল বাজাচ্ছি। শুনে নাও ঠিক এই আওয়াজ, এই চটাং চটাং আওয়াজ এই রিদমই আমি চাই।

মান্নাদার কাছে আরও শুনেছি তখন পঞ্চম কাজ করছে এস ডি বর্মণের অ্যারেঞ্জার হিসাবে। একটা রেকর্ডিং-এ অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ হচ্ছে তো হচ্ছেই। বেশ কিছুক্ষণ পর শচীনদা অধৈর্য হয়ে পড়ে বলে উঠেছিলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি আগে গানটা টেক করে নি। তারপর তোমরা ও-সবগুলো করো।

সত্যিকারের সৃজনশীল সুরকাররা দেশি-বিদেশি অজস্র সুর আহরণ করে তারপর নিজস্ব ভাবধারায় সেই সুর গানের কথার মাধ্যমে যুগে যুগে পরিবেশন করে এসেছেন। গীতিকারদেরও অনেকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যের ভাব-ভাবনা নিয়ে নিজের ভাষায় নতুন রূপে সেগুলো প্রকাশ করে এসেছেন। অবশ্যই প্রকৃত সৃজনশীল সুরকার বা গীতিকারদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র প্রতিভা থাকে। সেই নিজস্ব মৌলিক ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার স্পর্শ প্রতিটি সৃষ্টিতেই পাওয়া যায়। যার ফলে মাঝে মাঝে এক কথায় বলে দেওয়া সম্ভব হয় এটা অমুকের সুর বা অমুকের কথা। হিন্দি 'আরাধনা' সুপারহিট হওয়ার পর একদিন শচীনদাকে বলতে শুনেছিলাম, আমার 'মেরি স্বপ্ন কে রানি কভি আয়েগি তু' গানটা যারা বলছে আমি বিদেশি ট্যাকিলা থেকে নিয়েছি তাদের বলে দিয়ো হ্যাঁ, সুরটা আমি অনুসরণ করেছি—অনুকরণ নয়। তবে সেটা ট্যাকিলা নয়। পূর্ব বাংলার কুমিল্লাব নৌকো বাইচের গান থেকে। আমি বাঙালি, আমার বাংলায় অজস্র সম্পদ ছড়ানো আছে। আমি সব আগে সেটাই তো নেব। মুম্বই-এর এক সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতনামা চিত্র প্রযোজক যখন তাঁব হিন্দি 'ফাগুন' ছবিতে পূব বাংলার বহু বছবের পুরনো যাত্রাপালা 'বেদের মেযে জ্যোৎস্না'র একটি গানের সুর লাগিয়েছেন 'এক পরদেশি মেরা দিল লেগায়া' গানটিতে তখন খুশিই হয়েছিলেন পূব বাংলার বাঙালি এস ডি বর্মণ।

শচীনদার কাছে যাবার যতটুকু সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ বোধহয় আর আমরা পাব না। একদিন মুম্বই-তে ঘুরতে ঘুরতে শক্তি সামন্তের নটরাজ স্টুডিয়োতে হাজির হয়েছিলাম। শক্তিদা ওঁর স্টুডিয়োর প্রজেকশন থিয়েটারে শোনালেন ওঁর তখনকার নির্মীয়মাণ 'অনুসন্ধান' ছবির দুখানা গান। 'ফুল কলিগো ফুল কলি' আর 'ফেঁসে গেছে কালিরামের ঢোল'। মুগ্ধ হয়েছিলাম গান দুটি শুনে আর তার চিত্রায়ণ দেখে। শক্তিদাকে বলেছিলাম, দারুণ। পঞ্চমকে আমার কংগ্রাচুলেশন দেবেন।

শুনে শক্তিদা একটু হাসলেন বললেন, ও দুটো ওর সুর কোথায়। পূব বাংলার নিজস্ব ঘরানায় বানানো শচীন দেববর্মণের সুর। অবশ্য, আমি পঞ্চমকে ওই সুর দুটো লাগাতে বলেছিলাম। বাবার সম্পত্তি ছেলে তো পাবেই। আমি কথাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম

না। শক্তিদা বললেন, শোনেননি শচীনদার বিখ্যাত সুর, 'সুন্দরী গো সুন্দরী/দল বেঁধে আয় গান ধরি' এটা থেকেই 'ফুল কলিগো ফুল কলি/বল রে এটা কোন গলি।' আর শুনি তাকদুম তাকদুম বাজে/বাজে ভাঙা ঢোল/ওমন যা ভুলে যা কি হারালি/ভোলরে ব্যথা ভোল' এই সুরটাতেই 'বল হরি বোল হরি বোল/ফেসে গেছে ফেসে গেছে কালিরামের ঢোল।' এই দুটো সুরের ফারাক কোথায়?

আমার মনে পড়ে গেল এই শক্তিদারই 'অমানুষ' ছবিতে কে এল সায়গলের বাঁধিনু মিছে ঘর/ভুলেরি বালু চরে' অনুসরণ করে হয়েছিল 'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে।' একদিন মুম্বই-তেই কী একটা রেকর্ডিং-এর ফাঁকে কথায় কথায় কে যেন বললেন, শচীনদা ওঁর গানে ওঁর দেওয়া কাজ ছাড়া কণ্ঠশিল্পীর বাড়তি কোনও কাজ একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, কালোয়াতি করছ কেন? কালোয়াতি চাই না।

আর একদিন কে যেন বললেন হিমাংশু দত্ত বিখ্যাত হয়েছেন বিদেশি 'রেমোনা' সুরটা লাগিয়ে। 'বনের কুহু কেকা সনে/মনের বেণু বীনা গায়' বা ওই যে 'বন্ধন হারা ওই বন্ধুর পথ/নিদ্রিত অজগর যক্ষের প্রায়।' রেমোনার স্টাইলটাই হচ্ছে প্রথম পঙ্ক্তি থেকে দ্বিতীয় পঙ্ক্তি একটু চড়ায় উঠবে তৃতীয় পঙ্ক্তিটি উঠবে আরও চড়ায়। চতুর্থ পঙ্ক্তিটি নেমে আসবে খাদে। পূর্ণ হবে একটি স্তবক।

মনে আছে আমি মন্তব্য করেছিলাম রেমোনার স্টাইলটি একটি অমর স্টাইল। বন্ধুবর সুধীন দাশগুপ্ত 'শঙ্খবেলা' ছবিতে আমার 'কে প্রথম চেয়ে দেখেছি' গানটিতে এই স্টাইল লাগিয়েছিলেন। এবং সেটি হিমাংশু দত্তের সময়ের অনেক পরে রিলিজ হয়েও সুপারহিট।

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে মুম্বই-তেই শচীনদার সামনেই শচীনদার কাছের মানুষদের মধ্যে কে যেন বলে উঠেছিলেন সলিল চৌধুরী কিন্তু দারুণ কায়দা করে দুটো বিখ্যাত বিদেশি গানকে বাংলায় কাজে লাগিয়েছেন। একটা 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ/হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' সুর নিয়ে 'ক্লান্তি নামে গো/রাত্রি নামে গো।' বিখ্যাত গায়ক প্যাট বুনের টেকনিক গানের সুর নিয়ে 'দুরন্ত ঘূর্ণি তাই লেগেছে পাক/এই দুনিয়া ঘোরে বন বন বন।' ধরা ছোঁয়ার উপায় নেই।

স্বল্পভাষী শচীন দেববর্মণ এতক্ষণ একটাও কথা বলেননি। কিন্তু ওই আলোচনাটা থামিয়ে দিয়েছিলেন একটা মারাত্মক কথা বলে। বলেছিলেন, ওই যে বললে কায়দা করে লাগানো। ওই কায়দাটা হচ্ছে আসল জিনিস। রবি ঠাকুর করেছেন। ডি এল রায়, কাজী সাহেব সবাই করেছেন। আমিও করেছি। গুরু দত্তর 'পিয়াসা' ছবিতে যে গানটা হেমন্তকে দিয়ে গাইয়েছিলাম। 'যানে হো ক্যায়সে/লোগসে জিনকে/প্যায়ার তো প্যায়ার মিলা/হামনেতো যব কালিয়া মাঙ্গি/কাটাকো হার মিলা।' এই সেকেন্ড লাইনটা আমাদের ন্যাশনাল সঙের 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ'—আমি বলার আগে কেউ কোনও দিন বুঝতে পেরেছিল কি? ও সব কথা ছাড়ান দাও। চলরে ভাই—বলেই ওখান থেকে উঠে পড়েছিলেন সংগীত জগতের এক তুলনাহীন সংগীত ব্যক্তিত্ব।

আশা ভোঁসলে

[বাবা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দীননাথ মঙ্গেশকর। বিশ্বখ্যাত তিন বোনের অন্যতমা। দিদি লতা মঙ্গেশকর। বোন উষা মঙ্গেশকর। নানা ভাষায় সঙ্গীত পরিবেশনায় দক্ষ। পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত সুরের গানে তিনি এদেশে অতুলনীয়। ভালো গানের সংখ্যা অগণন। পরিণত বয়েসে শচীনকর্তার একমাত্র সন্তান রাহুল দেববর্মণের ঘরনী হয়েছিলেন।]

কর্তা, তুমি চুপ করতো। কিচ্ছু জানোনা। এমন সাদা মানুষ!

তাঁর এই কথায় দাদা হো-হো করে হেসে উঠলেন। প্রাণ খোলা হাসি, একেবারে বাচ্চাছেলেদের মত। আমি নির্বাক হয়ে শুধু দেখছিলাম। মীরা দি (মিসেস্ শচীন দেববর্মন) তাঁর ওপর রেগে গেছলেন।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে দাদা?

তোমার বউদিকেই জিজ্ঞেস কর না!

আমি বউদির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—আরে, তোর দাদা ভারি আত্মভোলা লোক। একশো টাকার নোট দশ টাকা ভেবে দিয়ে দেয়। তুইই বল, আমি যদি ওকে না সামলাই তবে কি হবে?

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম, আচ্ছা, আপনি কর্তা বলে ডাকছিলেন কেন?

তোর দাদাতো ত্রিপুরা স্টেটের প্রিন্স। ওখানে রাজাদের কর্তা বলা হয়। উনি স্টেট

ছেড়ে দিয়েছেন সেই কবে, কিন্তু নামটা থেকেই গিয়েছে, তাই আমি কেন অনেকেই তো ওকে কর্তা বলে ডাকে।

ভাবলাম, সত্যিই শচীন দাদা প্রিন্স, কর্তা। ১৯৪৪ থেকে ১৯৭৫ এই সুদীর্ঘ দিন ধরে তিনি বম্বের সঙ্গীত জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। আজ সত্যই মৃত্যু তার কাছে পরাজিত হয়েছে। কঠিন শীতল মৃত্যু তার নশ্বর দেহটা ছিনিয়ে নিয়েছে বটে কিন্তু তার সঙ্গীতময় জীবন শুধু আজ কেন চিরদিন সকলের কাছে অমর হয়ে থাকবে।

সত্যি, দাদার মত এমন সরল আর আত্মভোলা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তার এই স্বভাবের সঙ্গে চেহারার যে কি অদ্ভুত মিল ছিল। গায়ের রঙ ফর্সা। সারা শরীর ঘিরে এক অদ্ভুত চমক ছিল। সব সময় সাদা ধুতি, পাঞ্জাবী পরতেন। দেখলেই মনে হত যেন সৌম্যতার প্রতীক।

আমি একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা দাদা, আপনি কেন রাজ সিংহাসন ছেড়ে দিলেন?

দাদা মুখে স্বভাবসিদ্ধ প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, রাজ সিংহাসনের চেয়ে মানুষের হৃদয়ের রাজা হওয়া অনেক ভাল। বহু মানুষের কাছ থেকে অফুরন্ত ভালবাসা আমি পেয়েছি। সে ভালবাসা অর্থ দিয়ে পাওয়া যায় না, সে ভালবাসা আমি অর্জন করেছি আমার গান দিয়ে।

মাঝে মাঝে ওকে রাগাবার জন্যে দুষ্টুমি করতাম। একদিন বললাম, দাদা—আপনার চেহারা চুল, গায়ের রঙ একদম মঙ্গোলিয়ানদের মত।

আমার কথা শুনে দাদা খুব জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, উঃ, বড্ড বক্‌বক্‌ করিস। তুই কি একটু চুপ করে বসে থাকতে পারিস না? আমার কাছে যারা আসে তারা কেউ ঠুংরি কেউবা গজল, কিন্তু তুই দেখছি একেবারে তরানা ....

তার বকুনি খেয়ে আমি মাথা নীচু করে হাসি। আসলে আমি তো বকুনি খাবার জন্যেই ওকে রাগাই। তিনি যখন গান শেখাতেন তখন তাকে ৭৫ বছরের একজন বৃদ্ধ বলে মনেই হত না, মনে হত একজন বিশ বছরের যুবক। উনি যখন আমাকে গান শেখাতেন তখন প্রায়ই বলতাম—পারছি না, ভীষণ কঠিন!

তিনি হেসে বলতেন—না, আরে, আগে গা-না।

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলতাম—না, আপনার মত অত ভাল হবে না।

তখনই উনি রেগে যেতেন, বলতেন—কি বলছিস হবে না, হবে না....ওর ফাদার হবে। আগে তুই গা...

যখন তিনি যেমনটি চাইতেন, তখনই তেমন করে গানটা তুলে দিতাম। আর গান তোলার পর সে কি আনন্দ। ছেলেমানুষের মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে বারবার বলতেন, বাঃ—বাঃ। কি চমৎকার গান করিস, তুই। দেখিস গলা যেন নষ্ট না হয়। সব সময় গলার

যত্ন নিবি। কেমন!

গান ভুল গাওয়া-হলেই তিনি খুব দুঃখ পেতেন, বলতেন—সর্বনাশ হয়ে গেল!

আমি মাঝে মাঝে বলতাম, দাদা এখনও আপনার গানে যৌবনের প্রাণস্পন্দন শোনা যায় কেন বলুন তো?

দেখ্ আশা, গানই আমার জীবন, আমার ধর্ম, আমার সব। হ্যাঁ, একটা কথা সব সময় মনে রাখবি যখনই গান গাইবি তখনই গানের অর্থের সঙ্গে, তার চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলবি। মনে রাখিস তুই নিজেই যেন সেই চরিত্রটা। অর্থাৎ যখন তুই ক্যাবারে গান গাইবি, নিজেকে হেলেন ভাববি।

কথাটা শুনেই আমি খিলখিল করে হেসে উঠতাম।

উনি বলতেন হাসিস না। দেখিস যতক্ষণ না তুই গানটাকে অন্তর দিয়ে অনুশীলন করবি অতক্ষণ তুই ভাল করে গান গাইতেই পারবি না।

দাদাই প্রথম আমাকে গানের মধ্যে হাসতে শিখিয়ে ছিলেন। 'জানু জানু বি কাহে ছনকে হ্যায় তোরা কঙ্গনা'—এই গানটি আমি আর স্বর্গতা গীতা দত্ত গাচ্ছিলাম। গানের একটা জায়গায় হাসির প্রয়োজন ছিল। তিনি নিজে হেসে দেখিয়ে দিলেন। আমি হাসলাম। কিন্তু তাঁর পছন্দ হলো না, বললেন, হাসার পর যদি তুমি নিঃশ্বাস নাও তাহলে শুনতে খুব ভাল লাগবে। আমি তার কথামত করলাম। চমৎকার হলো। আর সেই থেকেই গানের মধ্যে আমার হাসিটা খুব ফেমাস হয়ে গেল।

তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রায়ই বলতেন তুই আমার মাইয়ারে!

হঠাৎ অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি জুয়েল থিফ এর একটা গান গাইছিলাম 'রাত আকেলী হ্যায় বুঝ গয়ে দিয়ে'। আমি গানটাকে সোজাভাবেই গাইছিলাম। দাদা বললেন, আশা এক কাজ কর। ছেলেবেলায় আমরা কারুর কানের কাছে গিয়ে যেমন প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর জোরে কুও ... ও...ও...ও করতাম, তুইও ঠিক সেই রকম কর।

কথামত আমি গানের প্রথম চার লাইন আস্তে তারপর পঞ্চম লাইন থেকে জোরে, বেশ উঁচু গলায় গাইলাম। শেষ পর্যন্ত গানটা বেশ উচ্চস্তরের হয়েছিল।

তিনি তার একমাত্র পুত্র (রাহুল) কে খুব ভালবাসতেন। আবার তার ওপর প্রচণ্ড অভিমানও ছিলো। তিনি বলতেন, আমার ছেলে আমার নকল না করে যে নিজে নতুন কিছু করেছে তার জন্যে আমি গর্বিত।

আর কোনদিনও দাদা আমাকে গান শেখাবেন না—একথাটা যেন মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু তবুও এটা সত্য, ধ্রুব সত্য, তিনি নেই। আজ শুধু একটাই সান্ত্বনা, তিনি যে সুরের ভাণ্ডার উজার করে দিয়েছেন তা—মৃত্যুহীন। কোনদিনও স্তব্ধ হবে না সেই সুরস্পন্দন।

সলিল ঘোষ

[প্রয়াত 'দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুজ। দীর্ঘকাল মুম্বাই প্রবাসী। মুম্বাইয়ের চিত্র ও সঙ্গীতজগতের নিবিড় সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল রয়েছেন। 'দেশ' সাময়িকীর ২৪ মাঘ ১৩৭৬ সংখ্যায় শচীন কর্তার আত্মকথা প্রকাশের আগে পূর্বকথা রচনা করেন। চটুল আড্ডাধর্মী রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।]

মীরা বৌদি বললেন—"কর্তা, আপনার কি এখন মুড আছে, সলিলকে আপনার সেই পুজোর গানগুলি শুনিয়ে দিন না।"

কর্তা তাঁর শীর্ণ শরীর আর রোগা হাড়জিরজিরে সরু লম্বা পা শোফাতে উঠিয়ে মুখে পান রেখে কি যেন ভাবছিলেন। পরণে সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। কর্তার মুখে শিশুসুলভ সরল হাসি দেখা দিল, জবাব দিলেন—"হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দিতে বল।"

একটু পরে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে গান ধরলেন—"সুবল বল বল বল চাঁই।"

এক লাইন্ গেয়ে, গান থামিয়ে শচীনদা বল্লেন—"বুঝলে সলিল, গ্রাম্য কথাগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। এতদিন গ্রাম ছাড়া হয়ে থেকেও এখনও সেই কথাগুলি ঘুরে ফিরে মনে আসে। আমাদের দেশে 'চাঁই' কথাটা ব্যবহার হয় যেমন 'কোথায় হে চাঁই, বল দেখি।" আমি মীরাকে বলেছিলাম এই কথাটা দিয়ে একটা গান লিখতে। তারই ফল এই গান আগামী পুজোতে বেরোবে।" ভাটিয়ালি সুরে কীর্তনের আখর দেওয়া গানটি সবাই এখন শুনেছেন।

গানের আনন্দ উপভোগ করা ছাড়াও আমি কিন্তু মনে মনে খুব গর্ববোধ করেছিলাম সেদিন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার, সঙ্গীত শিল্পী শ্রীশচীন দেববর্মণ শুধু আমার জন্য বিশেষ করে গান করছেন একান্ত নিরালায়, ৬৩ বছর বয়সে, সে পরম সৌভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়। সেদিন এরকম আরও কয়েকটি গান শচীনদার মুখে শুনেছিলাম যার রেশ কখনও মুছে যাবে না আমার মন থেকে।

প্রায় ত্রিশ বছর বম্বেতে শচীনদা ও আমি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগতে বাস করলেও, আলাদা জগতে বিচরণ করলেও, সচরাচর আমাদের মধ্যে কোনরকম দেখা শোনা না হলেও শচীনদা ও মীরা বৌদির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা তাঁদের যে প্রীতি স্নেহ আমি পেয়েছি, তার কারণ হল আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত শুভময়। শুভময়ই এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় ঘটনাচক্রে। সে তখন মস্কোতে। শচীনদা ১৯৬১ সালে মীরা বৌদি সহ গিয়েছেন সেখানে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে। সেখানে শুভময় ও তার স্ত্রী সুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের হয় পরিচয় এবং হৃদ্যতায় তা পরিণত হয়। শুভময়ের ব্যবহার দুজনকেই মুগ্ধ করে। ফিরে এসে শচীনদা আমাকে সব খবর দেন। শুভময় তখন 'দেশ' পত্রিকাতে নিয়মিত 'মস্কোর চিঠি' লিখছে। শচীনদা শুভময়ের সব লেখা নিয়মিত পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই হল সূত্রপাত।

তারপর যখনই শচীনদার কাছে গিয়েছি নানা রকম বাহানা নিয়ে শচীনদা কখনও আমাকে হতাশ করেননি। সকলেই জানেন, শচীনদার শরীর গত পাঁচ বছর ধরে খুব ভাল নয়। খুব নিয়মমত চলেন। তাঁর কাজেকর্মে, দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র রয়েছে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ছাপ। বম্বের চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর মত নিষ্ঠাবান নিয়মানুবর্তী শিল্পী আর নেই যদি বলি, তবে কোন অত্যুক্তি বলে ভাববেন না। উনিও যখন কোন কাজের জন্যে আমাকে ডেকেছেন, সব কিছু ফেলে আমাকে ছুটে যেতে হয়েছে কাঁটায় কাঁটায়। সময় নির্ধারিত করে সময়মত না গেলে বা কোন কাজ কোনদিন করে দেব বলে সময়মত না দিলে শচীনদা অসন্তুষ্ট হবেন। উনি নিজেও পারতে কখনও কথার খেলাপ করেন না। ঠিক সময়মত টেলিফোনে মনে করিয়ে দেবেন।

কয়েক বছর আগে (১৯৬৫ সালে) বম্বেতে বাংলাদেশের বাউল সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল, যাতে যোগ দিয়েছিল বাউল বৃন্দাবন দাস ও সনাতন দাস প্রভৃতি আরও অনেকে। শচীনদাকে বলেছিলাম—'আপনাকে এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই আসতে হবে।' তাঁর শরীর তখন খুব ভাল না। চোখ, হার্ট ইত্যাদির নানা গণ্ডগোলে ভুগছেন। বেশি ঘোরাফেরা, রাত্রে দেরি করা, এসব সহ্য হয় না। ভেবেছিলাম হয়তো আসতে পারবেন না। কিন্তু অনুষ্ঠানে ঠিক সময়মত শচীনদা ও মীরা বৌদি এসে হাজির। ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ শুনে শচীনদা হয়ত চলে যাবেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের পায়ের তালে তালে রসঘন সেই গান, শচীনদাকে শেষ পর্যন্ত ঠায় বসিয়ে রাখল। পরে আমাকে বলেছিলেন—"কান পান্টাইয়া গেল, কান

পাল্টাইয়া গেল।" শচীনদার সেই বলার ধরন, প্রকাশ করার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা। বম্বের চলচ্চিত্র জগতের এক ধরনের গান শুনে শুনে কান যখন পচে গিয়েছিল, তখন বাংলাদেশের মাটির আস্বাদ আনা এইসব লোকসঙ্গীত শচীনদার কান পালটে দিয়ে তাঁকে বিহ্বল করেছিল। অভিভূত হয়ে সেদিন আরও বলেছিলেন আমাকে ছলছল চোখে—"গান শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, পূর্ব বাংলায় আমার প্রথম জীবনের নানান দৃশ্য ও স্মৃতি। কি আনন্দই না পেলাম এই গান শুনে।" আজ চলচ্চিত্র জগতে খ্যাতির শীর্ষে উঠে, ১০০ শিল্পী সম্বলিত বৃহৎ অরকেসট্রার সঙ্গীত পরিচালনা করেও বাংলাদেশের সহজ সরল লোকসঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁর নিকট এতটুকুও কমেনি। আরেকবার ভারতীয় বিদ্যাভবনে একইভাবে তাঁকে অভিভূত হতে দেখেছিলাম, শ্রী নির্মলেন্দু চৌধুরী ও বাউল শ্রী পূর্ণ দাসের গান শুনে।

আরেকবার বম্বেতে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গানের আয়োজন হয়েছে। কলকাতা থেকে শ্রী সত্যেশ্বর মুখার্জি, শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখার্জি সদলবলে এখানে এসে দুইটি অনুষ্ঠান করবেন। এ অঞ্চলে, এমন কি বাঙালিদের মধ্যেও মুকুন্দ দাস বা তার রচিত যাত্রাগান সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রোতারা আগ্রহ দেখাবে কি না কে জানে। শচীনদাকে ধরেছিলাম, এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য। শচীনদা কখনও এইসব সভা-সমিতি, উদ্বোধন, পৌরোহিত্য পছন্দ করেন না। সব সময় এড়িয়ে চলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ধরলাম, আমাকে না বলতে পারলেন না। 'আরে মুকুন্দ দাসের গান আমি ছেলেবেলায় শুনেছি, আমার খুব ভাল লাগে, নিশ্চয় আসব।' আমি বল্লাম—'শুধু শুনতে এলে চলবে না, আপনাকে প্রধান অতিথিরূপে মুকুন্দ দাস সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে হবে।' শচীনদা আপত্তি জানালেন—'আমি কি বলতে লিখতে পারি তোমাদের মত।' পরে রাজি করিয়েছিলাম তাঁকে, মুকুন্দ দাস সম্বন্ধে উনি কিছু আমাকে বলবেন, আমি অনুলিখন করে নেব এবং সেটা পড়লেই চলবে। বলা বাহুল্য শচীনদার উপস্থিতি ওই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল বহুলাংশে।

এই অনুলিখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল শচীনদা ও মীরা বৌদির সঙ্গে তাঁর জীবন কাহিনী লেখা নিয়ে আমার আরেক দাবি। আমি একদিন শচীনদাকে বলেছিলাম—"আপনি এখন আপনার সাধনা ও শিল্পী জীবনের চরম শীর্ষে। রাজপরিবারে জন্ম ও লালিত পালিত হয়ে সব ত্যাগ করে একদিন বাউল সন্ন্যাসী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন সঙ্গীত সরস্বতীর সাধনায়। কঠোর সাধনা ও কষ্ট করেছেন প্রথম জীবনে, যার মূলে রয়েছে আজকের এই সাফল্য ও খ্যাতি। আপনার সেই কাহিনী শুনতে চাই, পাঠকদের জানাতে চাই। আপনি লিখে দিন বা আমাকে বলুন।"

শচীনদা মীরা বৌদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এইসব জটিল পরিস্থিতিতে বৌদি উদ্ধার না করলে দাদা একেবারে অসহায়। বললেনন—"মীরা দেখ, সলিল কি বলে—আমার জীবনী শুনতে চায়। আরে ছ্যা, আমার কি অতশত মনে আছে নাকি। মীরা বরঞ্চ অনেক

কিছু গুছিয়ে বলতে পারবে আমার বিষয়।"

এই হল আমার শচীনদার জীবন কাহিনী সংগ্রহ করার সূত্রপাত। শচীনদার মুখে সে কথা পরে শুনবেন। তার আগে শচীনদার যে বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সজল শ্যামল বাংলা মাটির সৃষ্টি এই শিল্পী কঠোর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বম্বেতে এসে জটিল হৃদয়হীন শুষ্ক কঠিন চলচ্চিত্র জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন—রসের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন—কোথাও এতটুকু আপোষ না করে—শুধু তাই নয়, নিজের সত্তা সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন, এতটুকুও না বদলিয়ে গিয়ে—সে এক আশ্চর্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও ক্ষমতাশালী শিল্পী ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হত না। বাংলাদেশ থেকে আমরা হাজার হাজার বাঙ্গালি শত শত শিল্পী বম্বেতে এসেছি। অনেকেই এখানে এসে নিজেদের সত্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু শচীনদাকে কোন কিছু—অর্থ, যশ, খ্যাতি, জনপ্রিয়তা—বদলাতে পারেনি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী মানসের নিকট অন্য সকলকে সম্ভ্রমে মাথা নত করতে হয়েছে; বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পে, সেখানে প্রচলিত গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে নিজেকে না ভাসিয়ে দিলে টিকে থাকা দায়। শচীনদা কিন্তু একান্ত নিজস্ব স্টাইলে, চালচলনে, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা, চলাফেরা সব কিছুতেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিজস্ব ভঙ্গীতে চলচ্চিত্র শিল্পের এই গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে থেকেও শরীরে মনে কোন পাঁক না লাগিয়ে সাফল্য খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। এইখানেই শচীনদা অনন্য।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীশার্ঙ্গদেব 'দেশ' পত্রিকার ১৫/২/৯৬ সংখ্যাতে শচীনদার শিল্পী জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র দেশের কাছে তিনি একটি আইডিয়ার প্রতীক। বাংলার কাব্য সঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের প্রতিফলন নানাভাবেই ঘটেছে, কিন্তু শচীন দেববর্মণের কণ্ঠে রাগসঙ্গীতের আবেদন প্রকাশ পেল অনন্যভাবে এবং এমন একটা যুগে যখন বাংলার সঙ্গীত জগতে রথী-মহারথীর অভাব ছিল না। যে সঙ্গীতবোধ এবং কলাচাতুর্যে এটি সম্ভব হয়েছিল তা সাধারণ শিল্পীর প্রতিভায় সম্ভব হয় না। অপরদিকে লোকসঙ্গীত এবং কাব্যসঙ্গীতের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন সে বৃত্তান্তও বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন। লোকসঙ্গীতে তিনি যে আর্ট খুঁজে পেয়েছিলেন তা মানবচিত্তের চিরন্তন অনুভূতিতে সঞ্জীবিত। তাকে তিনি কাব্যসঙ্গীতে বহুভাবে প্রয়োগ করে মানবিক আবেদনে পূর্ণ করে রেখেছেন। আজও এই পরিণত বয়সে তিনি এদিকে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন তা আমাদের চমৎকৃত করে। বোম্বাইয়ের এই মিউজিক ডাইরেক্টরের কাছে আজও ভাটিয়ালি পল্লীগীতির দিনগুলি ম্লান হয়ে যায়নি। আজও এক একটা গানে যখন তাদের প্রতিবিম্ব পড়ে তখন আমরাও তাঁরই মত বিহ্বল হয়ে পড়ি।'

'কাব্যসঙ্গীতে একটা ইনটেলেকচুয়াল আন্দোলন জেগে উঠেছিল এই শতকের তিরিশ

দশকে যার পুরোভাগে ছিলেন হিমাংশুকুমার দত্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ, অজয় ভট্টাচার্য এবং শচীন দেববর্মণ। এঁদের রচনা, সুরপ্রয়োগ এবং গায়নশিল্প সবই মূলতঃ ছিল বুদ্ধি প্রণোদিত। জনপ্রিয়তার পরিচিত সড়কে এরা অতি সহজে পদক্ষেপ করেননি। অথচ লোকরুচির প্রতি ছিল এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। এঁদের সহজাত প্রতিভার সঙ্গে শিক্ষিত পটুত্বের সংযোগ হওয়াতে বাংলার কাব্যসঙ্গীতে একটা সার্থক এবং সফল ধারার প্রবর্তন ঘটেছিল যা অনায়াসেই এদের ব্যক্তিত্বকে জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও শচীনদেব বর্মণের একটি একক প্রচেষ্টা ছিল। সেটি হচ্ছে কাব্যসঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের মূল্যায়ণ। রাগসঙ্গীতের অতি দক্ষ শিল্পী হয়েও লোকসঙ্গীতের বহু দুর্লভ সুরমাধুর্য প্রকাশ করার জন্য তিনি ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। অতএব রাগসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীত এই দুই বিষয়কে অধিকার করেই শচীনদেব বর্মণের সঙ্গীত চিন্তা বর্তমান। এই চিন্তা সুদীর্ঘ শিক্ষা, শ্রুতি, বৈদগ্ধ্য, অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠায় সুপরিণত ও সুপরিকল্পিত। তাই বাংলায় শচীনদেব বর্মণ কেবলমাত্র একজন শিল্পী বলে পরিচিত নন, তিনি বোধ করি আধুনিক কাব্যসঙ্গীতেরই প্রতীক।”

শার্ঙ্গদেব অতি সুন্দরভাবে শচীনদার সঙ্গীতের মূল্যায়ণ করেছেন স্বল্প কথায়।

শচীনদার বিষয় লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে বিভিন্ন সময়ে, তাঁর নানান কথাবার্তা। তাঁর সহজ সরল সরস নানান প্রকাশভঙ্গীর ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে এসবের আমার কাছে। একদিন বিকেলে আমি শচীনদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম—অনেক দিন যাইনি, দেখা করে আসি শচীনদা কেমন আছেন। শচীনদা কিন্তু আগে না জানিয়ে যখন তখন কেউ আসে, অযথা সময় নষ্ট করে, এসব খুব পছন্দ করেন না। খ্যাতির চরমশীর্ষে জনপ্রিয় সুরকার—নানাজনে নানাভাবে জ্বালাতনও করে। কিন্তু আমি মাঝে মাঝে অজান্তে হঠাৎ যদি কখনও গিয়ে পড়েছি ত শচীনদা কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। খুশীই হয়েছেন। সেদিন বিকেলে গিয়ে দেখি শচীনদা একলা বসে আছেন খাবার টেবিলে, চেয়ারে পা গুটিয়ে বসে পায়ে মোজা, পরণে লুঙ্গি, গায় চাদর জড়ানো। এক কাপ চা আর টোসট্ মধু দিয়ে খাচ্ছেন। মীরা বৌদি তখন কলকাতাতে। টেবিলে ব্রাউন পেপার দেওয়া কভারে একটা খাতা পড়ে রয়েছে—উপরে হিন্দীতে নাম লেখা—‘বিবাগী ভ্রমরা’। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে খাতাটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“এটা কি কোন নতুন ছবির গল্প—সুর দিচ্ছেন?” শচীনদা নিজস্ব বাঙাল ভাষায় যা বলেছিলেন তার মর্ম হল—“আর বোলো না—আমার একটা গল্প মনে ধরেছিল, যেটা এতে আছে। এক প্রযোজককে শোনালাম। তার ভালও লাগল, কিন্তু বলে কিনা কিছু কিছু পাল্টাতে। আমি কোথায় গল্পের মধ্যে চন্দনের গন্ধ দিতে চাই আর প্রযোজক কিনা ওর মধ্যে পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধ দিয়ে ভরাতে চায়। আমি বলে দিয়েছি—আমার দরকার নেই—গল্প দেব না।” কি উপভোগই না করেছিলাম শচীনদার এই বলার ধরণ।

আরেকদিন মনে আছে শচীনদার টেলিফোন পেলাম, "তুমি একবার আসতে পারবে, একটা কাজ আছে, একটু সাহায্য করবে।" আমি একটু মজা করার জন্য বললাম—"বলেন কি, আপনার যদি কিছু কাজে আসতে পারি সে ত আমার সৌভাগ্য। ছেলেবেলায় আপনার সেই প্রথম রেকর্ড 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে' শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি আপনার ভক্ত, কোনও আলাপ না হলেও বহুকাল পর্যন্ত। এখনও গানটা পুরো মনে আছে। আমার হেঁড়ে গলায় আপনাকে শুনিয়েও দিতে পারি। সাহায্যের কথা কি বলছেন, আপনার হুকুম—কখন আসব বলুন।" শচীনদা আবার ঘড়ি টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে খুব সচেতন। সঠিক ঘন্টা মিনিট টাইম দিয়ে দিলেন—বললেন—"দেরী কোরো না, পরে আবার অন্যরা আসবে।" কাজ তেমন কিছুই না। শচীনদার কাছে অনুরোধ এসেছে পত্রিকা সম্পাদকের কাছ থেকে, তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ চাই। শচীনদা সেটা মোটামুটি লিখেছেন। লেখাটা শুনে মতামত জানাতে হবে। ভাল কপি করে দিতে হবে। এই সামান্য ব্যাপারও শচীনদা নিখুঁতভাবে সব কিছু করেছিলেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিকথার যে চিত্রটি তিনি ফুটিয়েছিলেন তা খুবই মধুর।

চলচ্চিত্রের গল্প খোঁজার ব্যাপারে শচীনদার একান্ত নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গী আরেকদিন যে কি উপভোগ করেছিলাম তা বলার নয়। 'দেশ' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক আমার মেজদা শ্রীসাগরময় ঘোষ বম্বেতে বেড়াতে এসেছেন। শচীনদা বললেন ওঁকে নিয়ে একদিন এসো। তাঁর সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করব। নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পৌঁছলাম। নানা আলাপ-আলোচনা হল সাগরদার সঙ্গে—কলকাতার ছাত্রজীবন—সঙ্গীতে উনি কি কি করতে চেয়েছেন, তাঁর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা—কোন তত্ত্ব তাকে পথ দেখিয়েছে, ইত্যাদি। নানা বিষয় কত কি সব কথা হল আজ মনে নেই। কিন্তু দারুণ উপভোগ্য হয়েছিল সে আলোচনা—অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন শচীনদা, যা সাগরদাকেই তাঁর বৈঠকী লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে অনুরোধ করব। কিন্তু শচীনদা গল্প খোঁজা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা ভোলার নয়। 'আমার জন্য ভাল কিছু গল্প বা গল্পের বইয়ের সন্ধান দিন। দেব আনন্দ আমাকে মানে। ভাল গল্প পেলে ওকে অনুরোধ করব ছবি তুলতে। কিন্তু একটা কথা, এখানকার ছবির হিরো-হিরোইনদের জানেন ত। গল্পে কেউ বেশি কম হলে চলবে না। নায়ক-নায়িকার ব্যতিক্রম কম বেশির মধ্যে ষাট চল্লিশ পর্যন্ত চলতে পারে, তার বেশি নয়।" খুব মজা পেয়েছিলাম শচীনদার এই বিবৃতিতে যা কাগজ কলমে লিখতে গিয়ে অর্ধেক রস নষ্ট হয়ে গেল, তাঁর মুখে শোনার চাইতে। সাগরদা ৫০ : ৫০ বা ৬০ : ৪০ নায়ক নায়িকা সম্বলিত কোন গল্পের সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা জানি না।

আরেকবার প্রমাণ পেয়েছিলাম শচীনদার বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রীতি। বম্বেতে ত্রিশ বছরের অধিক বাস করে কর্মস্থল এখানে হলেও তাঁর মন পড়ে আছে বাংলাদেশে, সেখানকার গান, নদী, সবুজ মাঠ ইত্যাদির মধ্যে। তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় বহু নিদর্শন পেয়েছি এসবের।

একদিন শচীনদার আহ্বান পেলাম। যথা সময়ে পৌঁছানোর পর শচীনদা জানালেন, বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে গান করবার। "তুমি ত জান আমি সভা-সমিতি জলসা ইত্যাদি বিশেষ যাই না। পাবলিকে গান করাও ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এখানে আমাকে যেতে হবে। দু'চার কথা বলে গানও করতে হবে বলে অনুরোধ এসেছে। আমি এই কথাগুলি বলতে চাই তুমি ফেয়ার কপি করে দাও।" শচীনদার বক্তব্য ছিল—"আপনাদের সম্মুখে গান করার এই আমন্ত্রণ, আমার কাছে যেন মনে হল বাংলা মাটির আমন্ত্রণ, বাংলা মায়ের আমন্ত্রণ। রবীন্দ্র সরোবরের সেই অনুষ্ঠানে শচীনদা দুই-এক মিনিট তাঁর বক্তব্য বলে শ্রোতাদের গানে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

শচীনদা ও মীরা বৌদি সাধারণতঃ শীতকালে দু-তিন মাস কলকাতাতে কাটানোর চেষ্টা করেন। শচীনদার কথায়—"আমি শীতকালে কলকাতায় কাটাতে চাই. সেখানে তখন ভাল মাছ, তরিতরকারী পাওয়া যায়। আর তাছাড়া সকালে লেকের ধারে একটু বেড়ান—আর একেবারে পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বসে একটু আড্ডা দেওয়া। বম্বের চিত্র জগতের ব্যস্ততার বাইরে, একটু নিরিবিলি দিন কাটাব। ওতেই আমার আনন্দ। কিন্তু সে উপায় কোথায়। খবর বেরিয়ে যায় যে আমি কলকাতাতে এসেছি। নানারকম তখন অনুরোধ আসতে থাকে প্রোগ্রাম করার। সকালে লেকে বেড়াতে গেলে, ছেলেমেয়েরা চিনে ফেলে। হঠাৎ দেখলাম কেউ এসে টিপ করে প্রণাম করে কোন গানের অনুষ্ঠানের বা চলচ্চিত্রের গানের কথা জিজ্ঞাসা করে। রটে যায় আমি এখানে। তখন বাড়িতে শুরু হয় ভীড়। আর আমাকে বম্বেতে পালিয়ে আসতে হয়।"

শচীনদাকে দেখেছি, ওই ধরণের কোন অনুষ্ঠান জলসা ইত্যাদিতে গান করা খুব পছন্দ করেন না। আমাকে একবার বলেছিলেন—"নিজেকে কিছুটা দুর্লভ বা rare করতে চাই। তুমি ত জান চলচ্চিত্রে এক সময় আমি বহুস্থান থেকে এমনকি নিজের পরিচালনায় যে সব ছবিতে কাজ করেছি তার প্রযোজক পরিচালকদের কাছ থেকে গান করার অনুরোধ পেয়েছি বহু। কিন্তু আমি সচরাচর গান করার অনুরোধ উপেক্ষা করেছি। তোমাকে আমি হাত গুনে বলতে পারব যে, কটা ছবিতে আজ পযন্ত কটা গান করেছি, নিজের গলায়। যতটুকু স্মরণ আছে বাংলা ফিল্মে নয়টি গান ও হিন্দী ছবিতে সাতখানা মোট ষোলটি গান আমি আজ পর্যন্ত করেছি। চলচ্চিত্রের সহিত প্রায় ২৫ বছর জড়িত থেকেও এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ খানা ছবির সঙ্গীত রচনা করে।"

শচীনদার কথাতেই তাঁর ফিল্ম গান করার ইতিহাস বলি। "কলকাতায় কয়েকটি ফিল্মে (যেখানে আমি সঙ্গীত পরিচালনা করিনি) আমার নিজের রচিত সুরে গান গেয়েছি। সে সব সন তারিখ এখন আর মনে নেই। তবে একটা বেশ মনে আছে যে, ইংরাজী ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল এই সাত বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত বাংলা ছবিতে আমি নিজে গান করেছিলাম, সেই সব ছবির প্রযোজক বা পরিচালকদের বন্ধুত্বের দাবিতে। আমি একখানা

গান করলে ছবির মর্যাদা বা মূল্য বৃদ্ধি হবে বা আমার অনেক বন্ধু এমনও অভিমান দেখাতেন যে, আমি যদি অন্ততঃ একখানা গান না করি তাহলে তারা ছবি তোলাই বন্ধ করবেন। আমি তাঁদের এই স্নেহ প্রীতির দাবী অগ্রাহ্য করতে পারিনি। তবে আমি দুটি শর্ত দিতাম, যাতে তাঁরা সর্বদাই রাজী হয়েছেন। প্রথমটি—আমি যে গান করব, তার সুর আমিই রচনা করব (অন্য কেউ সঙ্গীত পরিচালক হলেও বা)। দ্বিতীয়টি—সেই গান কোন প্লেব্যাক হবে না অন্য অভিনেতার মাধ্যমে। ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড সঙ্গীতরূপে গানটি থাকবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

আমি সর্বপ্রথম স্বর্গত শ্রী মধু বসুর 'সেলিমা' ছবিতে (১৯০৫) নিজের সুর রচনায় একটি গান করেছিলাম। কথাগুলি এখন আর মনে নেই। তারপর, নাম মনে নেই আরেকটি বাংলা ছবিতেও বিখ্যাত সেই ভাটিয়ালি গানটি গেয়েছিলাম, "ওরে সুজন নাইয়া—কোন কন্যার দেশে যাওরে চাঁদের ডিঙ্গি বাইয়া।'

বাংলাদেশে সে সময় খুব সম্ভবতঃ 'নন্দিনী' নামে একখানা ছবি নির্মিত হয়েছিল। আমি কাজীদাকে (কাজী নজরুল ইসলাম) খুব শ্রদ্ধা করতাম, এই একটি মাত্র ছবিতে আমি কাজীদার লিখিত গান ও তাঁর সুরে একটি গান করেছিলাম—'চোখ গেল, চোখ গেল, কেন ডাকিস রে—চোখ গেল পাখীরে।' এই গানটি ছাড়া আমি অন্য কারো সুরে কোন গান চলচ্চিত্রে গাইনি, একমাত্র নিজের রচিত সুর ছাড়া।"

এর পর 'অভয়ের বিয়ে' (১৯৪২) নামে একটি বাংলা ছবিতে গান করেছিলাম, নিজের সুরে, হিন্দী গান, 'আয়ে দিল বেতর উসে ইয়াদ কিয়ে যা।" বম্বে এসে যখন হিন্দী ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করলাম, তখন আমার হিন্দী ছবির প্রযোজক ও পরিচালকরা সর্বদাই তাদের ছবিতে গান গাইবার অনুরোধ করত। বম্বেতে যে ছয়টি ছবিতে আমি গান গেয়েছি প্রতিটি নিজের সঙ্গীত পরিচালনায়।"

১৯৪৬ সালে বম্বেতে ফিল্মিস্তানের 'Eight Days' ছবিতে লোকসঙ্গীতের সুরে একটা গান করেছিলাম—যার প্রথম লাইন "উম্মীদ ভরা পন্ছী, থা খোঁজ রাহা সজনী।" গানটি কে লিখেছিলেন মনে নেই।

তারপর ১৯৫৭ সালে স্বর্গত বিমল রায়-এর 'সুজাতা' ছবিতে ভাটিয়ালি সুরে একটি গান করেছিলাম, যার প্রথম লাইন হল—'শুন মেরে বন্ধুরে।' গানটি লিখেছিলেন—মজরু সুলতানপুরী। বিমল রায়ের অপর ছবি 'বন্দিনী'তেও (১৯৬০) আমি লোকসঙ্গীতের সুরে আরেকটি গান করেছিলাম—'ও মাঝি-মেরে সজন হ্যায় উস্‌পার'—লেখক শৈলেন্দ্র। তারপর নবকেতনের 'গাইড' ছবিতে (১৯৬৩) একটি গান—"উওহা কোন হ্যায় তেরা—শৈলেন্দ্রর লেখা। সম্প্রতি ১৯৬৯ সালে রালহান-এর 'তালাশ' ছবিতে একটি গান করেছি—'মেরে দুনিয়া হ্যায় মা তেরে আঁচলমে'—সুলতানপুরীর লেখা।

এর পরেও ১৯৬৯ সালে শচীনদা, শক্তি সামন্তর 'আরাধনা' ছবি ও দেব আনন্দের

'প্রেম পূজারী'তেও গান করেছেন।

রেকর্ডে গান করা সম্বন্ধে শচীনদার বক্তব্য হল—"মিউজিক্যাল প্রোডাকট্স"-এর রেকর্ডে আমি প্রথম গান করি। আমার বহু গান রেকর্ড করেছিল এরা এবং সবগুলিই খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এতে বেশিরভাগই ছিল বাংলা গান, কিছু হিন্দী। হিন্দুস্থানে সবশুদ্ধ ৫৫টি রেকর্ড করেছি, যার গান সংখ্যা হল ১১০। এর মধ্যে ৯৪টি বাংলা গান ও ১৬টি হিন্দী গান।

পরবর্তীকালে আমার গান এইচ এম ভি রেকর্ড করেছে ও এখনও করছে। এখানেও বেশিরভাগই বাংলা গান ও কিছু হিন্দী। এইচ এম ভির রেকর্ড সংখ্যা আমার জানা নেই।

১৯৩২ সাল থেকেই শচীনদার গানের সঙ্গে আমি পরিচিত হলেও শচীনদাকে প্রথম দেখি বম্বেতে ১৯৪৬ সালে বম্বের কুপারেজ ফুটবল খেলার মাঠে রোভার্স প্রতিযোগিতায়। শচীনদা ১৯৪৪ সালে বম্বেতে এসে, তখনও কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, নিজের কাজে। কিন্তু যত কাজই থাকুক না কেন, কলকাতার বিভিন্ন ফুটবল দলগুলির কোন খেলায় শচীনদার অনুপস্থিতি ভাবাও অসম্ভব। সঙ্গীতের পরেই বোধ হয় শচীনদার বিশেষ আকর্ষণ হল খেলাধূলা—প্রধানতঃ ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস। একদিন আমাকে বলেছিলেন—'আমি পয়লা নম্বরের টেনিস খেলোয়াড় হতে পারতাম, কিন্তু কি করব, গানের গলার জন্য আমার প্রিয় টেনিস খেলা ছাড়তে হল। খেলা অত অভ্যাস করলে গলা নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তা না হলে কলেজে ছাত্রজীবনে উঠতি চ্যাম্পিয়ন টেনিস খেলোয়াড় ছিলাম।"

শারীরিক অসুস্থতার আগে পর্যন্ত শচীনদাকে সর্বদা রোভার্স কাপ বা ক্রিকেট টেসট্ খেলার মাঠে দেখা যেত। কোন খেলা দেখা বাদ দিতেন না।

শচীনদার নিজের কথায় তাঁর জীবন কাহিনী আপনাদের বলার আগে মীরা বৌদির বিষয় দু'চারটি কথা বলতে চাই। শচীনদার সঙ্গীত জীবনের সাফল্যের মূলে মীরা দেবীর প্রেরণা, উৎসাহ, সাহচর্য সম্পূর্ণ বর্তমান। মীরা বৌদি শুধু ভার্যা বা গৃহিণীই নন, একধারে একই সঙ্গে শচীনদার একান্ত সচিব, ম্যানেজার, গান রচয়িতা সবকিছু। বৌদি নিজেও সঙ্গীতজ্ঞা, ভাল গান করেন। একদিন শচীনদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"বৌদি গান করেন না? ওঁর একটা আসর বসাতে চাই।" শচীন কর্তা কৌতুকের হাসি দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—"মীরা সঙ্গীতচর্চার আর কোথায় সময় পায়, আমার ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব রাখতে রাখতেই ওর সময় চলে যায়।" কথাটা খুবই সত্যি। শচীনদা সব কিছু ভুলে গিয়ে একান্ত মনে ত্রিশ বছর যে সঙ্গীত সাধনায় রত একাগ্র চিত্তে অন্য কিছু চিন্তা না করে, তা সম্ভব হয়েছে মীরা দেবীর জন্য। শচীনদার অন্যান্য সবকিছু গুরুভার মীরা দেবী নিজের উপর নিয়ে সুষ্ঠুভাবে তা পালন করে যাচ্ছেন। সদা হাস্যময়ী সঙ্গীতে মশগুল মীরা দেবীও অসাধারণ ও বহুগুণ সম্পন্না। শচীনদা আমাকে বলেছিলেন—"বম্বেতে অনেক সময় মুশকিলে পড়ে যাই। গানের কোন আইডিয়া, কোন কলি বা কোন সুর মনে এল, কিন্তু তা

থেকে সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ গান বেঁধে দেবে, যাতে সুরটাকে ধরে রাখতে পারি, তার অভাব বোধ করতাম। শ্রী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীরবি গুহমজুমদার তাঁর প্রিয় লেখক, কলকাতার বাসিন্দা। প্রয়োজনে কাছেপিঠে তাদের কি করে পাবেন। শচীনদা বহু সময় নিজের গানের লাইন বা কলির আইডিয়া দিয়ে দেন গান রচয়িতাকে। তার উপর ভিত্তি করে গান লেখা হলে শচীনদা সুর দেন। এইরকম একটি বিখ্যাত গান, গৌরীপ্রসন্নর লেখা—"আজ বাঁশী শুনে আর কাজ নাই—সে যে ডাকাতিয়া বাঁশী।" ইদানীং বাংলা গান লিখেছেন যা শচীনদা পূজোতে রেকর্ড করেছেন।

দাম্পত্য জীবনে এঁদের দুজনের যে সমঝোতা, যে মধুর হাসিখুশী, হিউমার, সংবেদনশীল সহানুভূতির সম্পর্ক দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার। বহু সময় এঁদেরকে দেখে আমার মনে হয়েছে "আইডিয়াল কাপল্"। শচীনদা যেমন সব কিছুতেই মীরা বৌদির উপর নির্ভরশীল, তেমনি মীরা বৌদিরও 'কর্তা'ই হল ধ্যান-ধারণা। মীরা বৌদি শচীনদাকে ত্রিপুরার রীতি অনুযায়ী 'কর্তা' বলে সম্বোধন করেন এবং কোন কোন সময় 'আপনিও' বলেন। এই প্রসঙ্গে এঁদের দাম্পত্যজীবনের মধুর সম্পর্কের একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। শান্তিনিকেতনের 'কারুসঙ্ঘ' বম্বের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে প্রদর্শনী করছে। তাদের বাতিক শাড়ি, চাদর, কাঁথা ইত্যাদির। শচীনদার বাতিকের গলার চাদর খুব পছন্দ এবং গলার চাদর উনি সর্বদা ব্যবহার করেন। শচীনদা ও মীরা বৌদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, প্রদর্শনী দেখে, চাদর কিনে নিতে। মীরা বৌদি শচীনদার জন্য কয়েকটি চাদর ও অন্যান্য আরও কিছু কিনলেন। এর মধ্যে শচীনদা একপাশে আমাকে ডেকে নিয়ে প্রদর্শনীতে টাঙ্গানো একটি সুন্দর শাড়ি দেখিয়ে বললেন—"মীরাকে কিছু বলবে না। ওই শাড়িটা খুলে, ওর অজান্তে, আমাকে যাবার সময় দিয়ে দিও। মীরার কাছে এখন দাম চেও না। আমার পকেটে এখন টাকা নেই, তোমাকে আমি পরে দিয়ে দেব। বাড়িতে ফিরে মীরাকে সারপ্রাইজ দিতে চাই।" আমি বললাম—""ঠিক আছে।" শচীনদা কিন্তু সেদিন আখেরে আর মীরা বৌদিকে সারপ্রাইজ দিতে পারেননি। কারুসঙ্ঘের কর্মীরা শাড়িটা খুলে অনবধানতাবশতঃ অন্যান্য সব সওদার সঙ্গে মীরা বৌদির সামনেই প্যাক্ করে দিয়েছিল। মীরা দেবী বললেন শাড়ীটা কে নিল। তখন শচীনদা বাধ্য হয়ে বললেন—ওটা আমি নিতে বলেছি। তুমি দামটা তাহলে দিয়েই দাও। সেদিন শচীনদার মীরা বৌদিকে "সারপ্রাইজ" দেবার প্রচেষ্টা বানচাল হওয়াতে আমি খুব দুঃখিত হলেও, আমরা সবাই খুবই কৌতুকান্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

অঙ্কুর দেববর্মণ

[১৯৪০ সালে জন্ম। কিছুদিন আগে ত্রিপুরা সরকারের চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন। শচীনকর্তারা পাঁচভাই ছিলেন। প্রশান্তকুমার, প্রফুল্লকুমার, কিরণকুমার আর শচীনকর্তা। কিরণকুমারের পুত্র অঙ্কুর দেববর্মণ। যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই পেশ করেছি]

শচীনকর্তার সরাসরি সান্নিধ্যে আসিনি। আমার ছোটবেলা থেকেই তিনি মুম্বাইয়ে। মাঝে মাঝে পুজোতে ত্রিপুরা আসতেন। খুব কম। ১৯৪৬-এর পর আর দেখিনি। ১৯৩০-এ শচীনকর্তার বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ লোকান্তরিত হন। শ্রাদ্ধবাসরে এসেছিলেন শচীনকর্তা। বাড়িটা ছিল, এখন যেখানে আগরতলার রবীন্দ্রভবন, সেই চত্বরে। সাদা পাঞ্জাবি ধুতি পরেছিলেন। রাজপরিবারে বাঙালি সংস্কৃতি, ধর্ম ও লৌকিক আচারই পালন করা হত। বীরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এমন সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা করেছে।

হাতা গুটানো সিল্কের শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, ধুতি পরতেন। জন্ম কুমিল্লায়, নবাববাড়ির উল্টোদিকে। নবদ্বীপ মহারাজের বাড়ি। নবদ্বীপ মহারাজের লেখা 'আবর্জনার ঝুড়ি'। হাতের লেখার ফটোকপি আছে। রাজা রাজড়াদের বৈঠকে আলোচনার স্মৃতি রয়েছে এই বইয়ে। নবদ্বীপ মহারাজ আগরতলায় নবদ্বীপ বাহাদুর নামে পরিচিত ছিলেন। প্রশান্তকর্তাকে দেখিনি। প্রফুল্লকর্তা খুব পড়ুয়া ছিলেন। বাংলা মাসিকপত্র প্রচুর আনতেন। প্রবাসী। সবুজপত্র। শৌখিন, রাশভারি, কমাণ্ডিং পার্সোনালিটি। প্রথম জীবনে রাজদরবারের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সাধু ফকির প্রচুর আসতেন। তাদের সাথে সময় কাটাতেন। শিশুপ্রিয় ছিলেন। দুর্গাপুজো।

শিশুর সঙ্গে শিশুর মতই মিশে যেতেন। সাজঘর ভর্তি পটাশবাজি। নানারঙে মোড়া। একটাও কাউকে দেবেন না। পুজোর আগে একটাও নয়। প্রচুর জায়গা। শিশুর দল সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ত। প্রত্যেককে বাজি দিলেন। এক, দুই, তিন বললে ফুটাতে হত। তারপর তুবড়িবাজি। ঝাড়বাজি। শেষই হতনা যেন।

জগন্নাথবাড়ির কাছে দুটো গাছ ছিল। প্রচুর শকুন বসত। কিছু 'আগর' গাছও ছিল। অনেকে বলেন, শহরের নাম তাই আগরতলা। শকুন থেকে শকুন্তলা রোড। অনেকে আবার বলেন, আগর ফা ছিলেন এখানে। তাই আগরতলা।

কৈলাস পাগলা বলে একজন ছিলেন। খুব অপরিচ্ছন্ন। হাতে অনেক আংটি। নিকেলের সাধারণ আংটি। কাসর শঙ্খ বাজালে সহ্য করতে পারতেন না। দৌড়ে চলে যেতেন। শকুন্তলা রোডে শেকলে হাতি বাঁধা থাকত। আমাদের হাতির উপর বসিয়ে প্রফুল্লকর্তা চড়াতেন। মোরামের রাস্তা। পাকা ছিল না। ১৯৬৩ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন আগরতলায়। এরপর ছেড়েছি ঐ বাড়ি আমরা। প্রফুল্লকর্তার শ্রাদ্ধবাসরে শচীনকর্তা এসেছিলেন। ৭ই মার্চ, ১৯৪৬।

বাবা কিরণকুমার দেববর্মণ। ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেলস-এর লেফটেনান্ট কর্ণেল ছিলেন। আমার মা লালসিংমুড়া গ্রামের মেয়ে ছিলেন। সাবিত্রী দেবী। বাবাকে কম পেয়েছি। জন্মের সময় যুদ্ধ চলেছে। বাবা খুব ভাল গান গাইতেন। নিজের হারমোনিয়াম ছিল। গলা খুব সুন্দর। ব্যাণ্ড পার্টিতে ওনার কম্পোজিশন ছিল। শচীনকর্তা বলেছেন, 'গানের প্রেরণা ছোড়দা থেকে পেয়েছি। ললিতকলায় ভরপুর। কেন যে সেনাবিভাগে!' মাঝে পাতিয়ালা রেজিমেন্টে ছিলেন। বীরবিক্রম নিয়ে এলেন। কাকা হতেন উনি। ডেকে আনলেন। পাতিয়ালাতে বাবার স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। বাবা বার্মা থেকে এলেন যুদ্ধের শেষে। এসে ডাকলেন। ভোরবেলা। ঐ চেহারাটা মনে আছে। বেশি আর মনে নাই। খেলনা দিলেন। ট্রাইসাইকেল এরোপ্লেন দিলেন। অনেক পিতলের বুদ্ধ নিয়ে এলেন। মূর্তিগুলি বুদ্ধমন্দিরে ছিল। চুরি হয়ে গিয়েছে এখন। অল্পসময়ের জন্য চিটাগাং গেলেন। ফিরে এলেন। যুদ্ধের শেষ। চাদমারি টিলায় প্র্যাকটিস হত। ঐ প্র্যাকটিস করতে যেতেন। একজন উঁচু অফিসার (মেজর হতে পারেন) দু'ইঞ্চি মর্টার চালাতে গিয়ে কামানে ফিট করেছিলেন। বাবা ছিলেন। পেছনে আরও কয়েকজন ছিলেন। উল্টো ফিট করেছেন। বললেও শোনেননি। বাবা ভাবলেন, হয়তো ভুল দেখেছেন দূর থেকে। ফায়ার করলেন। ঐ অফিসার গেলেন। বাবার গায়ে লাগল। অর্জুনকর্তা মারা গেলেন। বৃটিশের রেড ক্রশ হাসপাতালে (এখন যেখানে এম. বি. বি. কলেজ) বাবার চিকিৎসা হল। বিকেলে খবর পেলাম। বাবা মারা গিয়েছেন। আরও কয়েকজন মারা গিয়েছিলেন। নবদ্বীপ বাহাদুরের বাড়িতে বিরাট চৌচালা বৈঠকখানা ছিল। সুসজ্জিত। উপরে ছন, পাকা ভিটে। অনেকে ভিড় করেছিল সেদিন। এখনও মনে পড়ে। রাত আটটা সাড়ে আটটায় বিরাট শোক মিছিল বেরোয়। রাজকীয় মর্যাদায় সৎকার হয়।

আজও ভুলিনি...।

নবদ্বীপ বাহাদুরের কথা মনে পড়ে না। আমার দাদু। তবে শচীনকর্তার মা নিরুপমা দেবীকে দেখেছি। আমার ঠাকুমা। খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর সময় খুব কেঁদেছিলাম। নবদ্বীপ বাহাদুর বিদ্যোৎসাহী মানুষ। গম্ভীর। করুণ জীবন।

বীরচন্দ্র মহারাজ নবদ্বীপকর্তার কাকা ছিলেন। ঈশাণের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে নবদ্বীপকর্তার সিংহাসন পাওয়ার কথা ছিল। নিয়মমতোই পাওয়ার কথা। নাবালক ছিলেন (১৪/১৫ বছর)। বীরচন্দ্র যুবক (২৭/২৮ বছর)। স্বাধীন দেশীয় রাজ্য হলে কি হবে। বৃটিশ প্রভাব ছিল। কলকাঠি নাড়ত। এই ডিপ্লোমেসিতে নবদ্বীপকর্তা বাদ গেলেন। ঈশাণ বীরচন্দ্রকে দায়িত্ব দিলেন। এই নিয়ে বিতর্ক আছে। উঁচুপদের অনেকে (দেওয়ান) নবদ্বীপের পক্ষে মামলা লড়লেন। বীরচন্দ্র রাজা হলেন। কিরীটবিক্রম ওতো নাবালক ছিল। রাজা হয়েছিল। রাণী কাঞ্চনপ্রভার দায়িত্বে কাউন্সিল করে রাজকার্য চলত। কারণতো একই ছিল। নবদ্বীপ মহারাজের রাজা হতে ক্ষতি ছিল কি? কোথাও একটা চক্রান্ত ছিল।

বীরচন্দ্র যোগ্য রাজাই ছিলেন। ত্রিপুরার সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম বলেছিলেন, এই বালক 'বিশ্বকবি' হবে।

রাধাকিশোরমাণিক্যের বেলায় নবদ্বীপকর্তার আবার ডাক পড়ে। কুমিল্লা থেকে বলে কয়ে নিয়ে আসা হয়। 'চরথার বাড়ি' বলা হত। নানুয়ার দিঘির কাছে। অভিমান ছিল। মামলা করে সর্বস্বান্ত ছিলেন। কুমিল্লাতে 'ঠাকুর বর্ডিং' ছিল। বীরবিক্রম চাইছিলেন, নবদ্বীপকর্তা রাজদরবারে উপদেষ্টা হিসেবে থাকুন। মন্ত্রীপরিষদের প্রধান ছিলেন। ঐ বাড়িকে তাই 'মন্ত্রীবাড়ি'ও বলা হত। ঘরেই পড়াশুনো করতেন। বাইরে খুব বেরোতেন না। সেতার বাজাতেন ভালো।

নবদ্বীপ নিজে শিল্পীও ছিলেন। দুর্গাপ্রতিমা বানাতেন। শাস্ত্রভক্ত ছিলেন। রঙ, মূর্তির মাটির ধরন, সব মেনে চলতেন। কুমিল্লা 'ঠাকুর বর্ডিং' এ শচীন থাকতেন। পড়তেন। রাজার ছেলেদের পড়ানোর বিষয়ে মাষ্টারমশাইদের সম্ভ্রম কাজ করত। একই অপরাধে রাজার ছেলেদের কম শাস্তি হত। নবদ্বীপকর্তা একদিন দেখতে পান। পছন্দ করেননি। শচীনকে নিয়ে চলে এলেন। ঈশ্বর পাঠশালায় ভর্তি হলেন শচীনকর্তা। পরে ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়েন। ইংরেজিতে ভালো ছিলেন। মুম্বাই থেকে ইংরেজিতে চিঠি দিতেন। একবার একটা চিঠি 'ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা'য় পড়া হয়েছিল। নবদ্বীপের কাছে শিক্ষা পেয়েই শচীন সাধারণ লোকের সাথে খুব মেলামেশা করতেন। এতো সাদামাটা ধরন-রাজার বাড়ির লোকেরা পছন্দ করত না। তাঁর গান চায়ের দোকানের ছেলেরাও গাইছে, রাজপরিবার এই জিনিস মানতে পারেনি।

এখন রাজপরিবারের লোক তাঁর নামে পরিচিত হয়। একসময় তাঁকে অপাংক্তেয় ভাবা হত।

নজরুল গানের শিল্পী শচীনকর্তা

Hindusthan	Hindusthan
(H 839)	(H 969)
কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া	চোখ গেল চোখ গেল পাখিরে কেন ডাকিসরে
মেঘলা নিশিভোরে মন যে কেমন করে	পদ্মার ঢেউরে তোর শূন্য হৃদয় নিয়ে যারে

খানিকটা অবাক হবার মতই ঘটনা। সারা জীবনে শচীনকর্তা নজরুলের মাত্র চারটি গানের রেকর্ড করেছেন। নানা অনুষ্ঠানে শ্রোতারা আবদার করলেও এর বাইরে আর কোন গান গাইতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে একটা গান বাড়তি গাইতেন, 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী'। শচীনকর্তা ও নজরুলের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। তাই আমরা অবাক হই।

উপরে আমরা চারখানা গানের রেকর্ড পরিচিতি দিয়েছি। 'কুহু কুহু...' গানটি নিয়ে একটা মজার কাহিনী রয়েছে। নজরুল স্টুডিওতে বসে গুণ গুণ করে সুর ভাজছেন। শচীনকর্তা স্টুডিওতে এলেন। কর্তাকে দেখেই নজরুলের আব্দার, 'কর্তা, কুহু কুহু করে কোকিলের মতো গান করুনতো'। কর্তাতো অবাক। স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে বললেন—'ধুর কাজীসাহেব যে কি কন্'।

নজরুলও ছাড়বেন না। কর্তা আর কি করেন। করলেন তেমন খানিকটা। অমনি কাজীসাহেব গান লিখলেন—'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া, কুহরিল মহুয়া বনে'।

কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কুহরিল মহুয়া বনে।
চমকি' জাগিনু নিশীথ-শয়নে।।
শূন্য ভবনে মৃদুল সমীরে
প্রদীপের শিখা কাঁপে ধীরে ধীরে
চরণ-চিহ্ন রাখি দলিত কুসুমে
চলিয়া গেছ তুমি দূর বিজনে।।
বাহিরে ঝরে ফুল আমি ঝুরি ঘরে
বেণু-বনে সমীরণ হাহাকার করে,
বলে যাও কেন গেলে এমন করে
কিছু নাহি বলে সহসা গোপনে।।

মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে
তারি তরে গো মেঘবরণ যার কেশ।
বুঝি তাহারি লাগি হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ।।

মৌরী ফুলের ক্ষেতে মৌমাছি ওঠে মেতে
এলিয়েছিল কেশ কি গো তার
এই পথে সে যেতে।
তার ডাগর চোখের ঝিলিক লেগে রাত হয়েছে শেষ

শিরীষ পাতায় ঝিরি ঝিরি বাজে নূপুর তারি
সোনার ডালে দোলে তাহার
কামরাঙা-রঙ শাড়ি।
হয়েছে মন ভিখারী—বন-শিকারী আমি
উঠি পাহাড় চূড়ায়—ঝর্ণা-জলে নামি
কালো পাথর দেখে জাগে কার চোখের আবেশ।।

"চোখ গেল চোখ গেল" কেন ডাকিস রে
চোখ গেল পাখি (রে)।
তোর ও চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে—
চোখ গেল পাখি (রে)॥
তোর চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে—
জানে সবাই,
চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে—
তার ওষুধ নাই ;
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় তাহার আঁখি রে—
চোখ গেল পাখি (রে)॥
তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশিরাতে
বুকে লাগে
চোখ গেল ভুলে রে 'পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা' বলে তাই
ডাকিস অনুরাগে রে।
ওরে বন পাপিয়া কাহার গোপন প্রিয়া,
ছিলি আর জনমে,
আজো ভুলতে নারিস আজো ঝুরে হিয়া
ওরে পাপিয়া বল্, যে হারায় তাহারে কি
পাওয়া যায় ডাকি রে—
চোখ গেল পাখি রে
চোখ গেল পাখি॥

পদ্মার ঢেউ রে—
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা যা রে
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারিয়েছি তারে ॥
মোর পরাণ বঁধু নাই,
পদ্মে তাই মধু নাই—নাই রে—
বাতাস কাঁদে বাইরে—সে সুগন্ধ নাই রে—
মোর রূপের সরসীতে
আনন্দ মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে ॥
ও পদ্মা রে ঢেউ-এ তোর ঢেউ ওঠায়
যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিলমিল করে
কৃষ্ণ-কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশী বাজায়
যদি দেখিস তারে—দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস কেন বুকে আশার দেয়ালী জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

পঞ্চম ঃ পরিচয় ও প্রতিভা

কোন বড় মানুষের সৃষ্টি ও জীবনকথা বলতে চাইলে তাঁর ছেলেমেয়েদের কথা কখনও কখনও আলোচনায় যোগ হয়, কখনও কখনও হয়না। হয়না কখন? যখন আর পাঁচ সাতটা ছেলেমেয়ের মত ওরা সাধারণ জীবনযাপন করে। ছেলে বা মেয়ে-যদি তাঁর বাবা মার চেয়ে নতুন কোন পথের পথিক হয়, আলোচনায় বাদ দেয়া যায় না। শচীনকর্তা আর মীরাদেবীর একমাত্র সন্তান রাহুল। ডাকনাম তাঁর পঞ্চম। মুম্বাইয়ে ছবির জগতে সবার 'দাদামণি' ছিলেন অশোককুমার। তিনি রাহুলের 'পঞ্চম' ডাকনামটা দিয়েছিলেন। রাহুলের আরও একটা ডাকনাম ছিল। অনেকেই জানেন না। টুবলু। পঞ্চমের দিদিমা এই নাম ধরে ডাকতেন। মীরাদেবীর মা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক ছিলেন। পড়াশুনা'য় পঞ্চম খুব একটা ভালো ফল দেখাতে পারতো না। ইংরেজিটা করতে পারতো না বিশেষ। অথচ দিদিমা নাতিকে ইংরেজিতে ছাড়া চিঠিই দিতেন না। চাইতেন, নাতি তাঁর ইংরেজি শিখে নিক। কোথায় কি। পঞ্চম সেসব চিঠি নিয়ে তাঁর বন্ধু শচীন ভৌমিকের কাছে চলে যেতেন। শচীন চিঠি পড়ে নিয়ে একটা উত্তর লিখে দিতেন। পঞ্চম সেই উত্তর ধরে ধরে লিখতেন। লিখে দিদিমাকে পাঠাতেন। দিদিমাতো কি খুশি। নাতি দিব্যি ইংরেজি শিখছে। শচীন ভৌমিকের কথা একটু বোধহয় বলা দরকার। একসময় সত্যিই তেমন চালচুলো ছিল না। ধীরে ধীরে বোম্বের ছবির জগতে জায়গা করে নিয়েছেন। বহু ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্য লিখেছেন।

পঞ্চমের নিবিড় বন্ধু ছিলেন। গানও কিছু কম লেখেননি। রাহুলের কণ্ঠে 'মনে পড়ে রুবি রায়' ও 'ফিরে এসো অনুরাধা' গান কে না শুনেছেন! এই দুই গানের রচয়িতা শচীন ভৌমিক। যাই হোক, দিদিমার কথায় আবার আসতে চাই। মীরাদেবীর মা, পঞ্চমের দিদিমা। খুঁজে খুঁজে খবর নিতেন, কখন কে দুপুরবেলা আসবে, কখনও সে আগে এসেছিল কি না, কি কি খেতে সে ভালোবাসে। রক্তে সঙ্গীতের স্পন্দন রাহুলের শৈশব থেকেই ছিল। বাবা তাঁর আগ্রহ দেখে বিখ্যাত সরোদিয়া আলি আকবর খাঁর কাছে কলকাতায় ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তবলাও খুব ভালো বাজাতেন পঞ্চম। শচীনকর্তার বিখ্যাত গান 'ভুলেছি নিজের মনে'তে পঞ্চমের সরোদ ছিল। 'কটি পতঙ্গ' ছবিতে সুর দিয়ে লক্ষ কোটি শ্রোতার মন জয় করে নিয়েছিলেন। 'কিনারা' ছবিতে রাহুলের সুরে বাবা গান গেয়েছেন। 'অমর প্রেম' ছবির গানগুলোর কথাও আমরা কেউ ভুলতে পারিনা।

বাবার খ্যাতি যখন দিগন্ত ছোঁয়া তখন সন্তান তাঁর পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণার পথ বেছে নেয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সার্থক সাঙ্গীকরণ পঞ্চম যা করেছেন, কোন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সে নিয়ে মহাভারত রচনা করতে পারেন। শুধু ভাবলে মনটা বিষণ্ণতায় আচ্ছাদিত হয়, শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধের উজ্জ্বল উদাহরণ শচীনকর্তার ছেলে রাহুল, কেন জানিনা, পিচ্ছিল পথে হেঁটেছেন একটু বেশি। একটা দুরন্তপণার শখ ছিল। নিত্যনতুন গাড়ি চালাতে চাইতেন। এমন জোরে গাড়ি চালাতেন যে সবাই ভয় পেয়ে যেত। সংসারজীবনে কোনদিনই সুখের দেখা পাননি। অস্থিরতায় জীবন কেটেছে। কখনও খ্যাতি আর প্রশংসার বন্যায় ভেসে গিয়েছেন, কখনও পরিচিত লোকেরাই অবহেলা ভরে দূরে ঠেলে দিয়েছে। ছোট্ট রাহুলের স্মৃতি বড়ো সব সঙ্গীত দিকপালদের মানসপটেই আঁকা রয়েছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বলতেন না নইলে, '...রাহুল যে এতবড় সঙ্গীত পরিচালক হবে তা আমি কল্পনাও করিনি। প্রচণ্ড কষ্টও হয়, রাহুল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।' রাহুলের প্রথম বাংলা গানের গীতিকার ছিলেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাহুল সুর দিয়েছিলেন। গানের ভুবনের অদ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর সেই গান গেয়েছিলেন। আগে 'কটি পতঙ্গ' ও 'কিনারা' ছবির কথা বলছিলাম। তারও আগে 'পড়োশন' বা 'ভূতবাংলা' ছবির কথা বলতে হয়। পুলকবাবু যখন বই লিখলেন 'কথায় কথায় রাত হয়ে যায়', একটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন আমাদের। শচীনকর্তার বাড়িতে গিয়েছেন পুলকবাবু। রাহুল এল একসময়। শচীনকর্তা পুলকবাবুর আধুনিক গানের কথায় রাহুলকে সুর দিতে বললেন। রাহুল বাংলা গানের জগতে কেমন যেন যেতে চাইতেন না। বাবাকে বলতেন মাঝে মাঝে, '...আপনি আমাদের থেকে অনেক অনেক মডার্ন। কিন্তু বাংলা গান আমার আসেনা। ও আমি গাইতেও পারব না, সুর করতেও পারব না।' খেতে খুব ভালোবাসতেন রাহুল। তেল বেশি দিয়ে রান্না করা খাবার খেতেন। বাগদা বা গলদা চিংড়ি, ধনে পাতা দিয়ে পাবদা মাছ, তেল-কই মাখা মাখা—এসব খুব ভালোবাসতেন (কোন বাঙ্গালি না ভালোবাসে, হয়ে ওঠেনা, এই যা!)

খানিকটা বেহিসেবি জীবন, সংসার জীবন, কোন অধ্যায়েই সুখের হয়ে উঠল না। প্রথম স্ত্রী রীতা প্যাটেলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। অদ্ভুত একটা সংসর্গ এমন প্রতিভার বুকের ভেতর বিরামহীন বিষ ঢালতে থাকে। অনেক অনেক পরে তাঁর জীবনে আশা ভোঁসলে এলেন। তবু পঞ্চম সুখের সন্ধান পাননি। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'একদিন গান নিয়ে ওর সান্তাক্রুজের বাড়িতে বসেছি। দুর্ধর্ষ পঞ্চম হারমোনিয়াম একটু বাজিয়েই বলে ফেলল, 'ধ্যাৎ, যেটাই বাজাই মনে হয় এ সুরটা হয়ে গেছে। জোর করে সুর করা যায় না। স্পনটেনিয়াস ব্যাপারটা হচ্ছেনা। আমি একটা ধুন বানিয়ে কাল ঠিক এই সময়ে আপনার সঙ্গে বসব। ভদ্রতায়, আতিথ্যে এবং সময়নিষ্ঠায় পঞ্চম অদ্বিতীয় ছিল।'

এই পঞ্চম জীবনের শেষদিকে অবহেলায় জীবন কাটিয়েছেন। নিজের করা সুর। অন্য সুরকারের নাম ছাপিয়ে বাজারে সেই সব গান বেরোচ্ছে। দেখছেন পঞ্চম, মনের ভেতর হাহাকার। কি করবেন। শুভার্থীরা বলতেন, 'নিজের নাম দিওনা, ফ্লপ করে যাবে।' কেন তাঁর সুর এখন আর মানুষ চাইছেনা? বলতেন পঞ্চম, পরিচালক 'ছবিতে গানের সিচুয়েশনই বানাতে জানেন না। আমি গান বানাব কী করে?' বিয়ের পদ্যের মত গান। 'কী করে, ও সব গান হিট করবে? কোনও নতুন স্ক্যানিং, নতুন ছন্দই আমি বার করতে পারিনা। সেই একঘেয়ে সিক্স এইট বা টু ফোর (দাদরা বা কাহারবা) করতে হয়। আর মিটার? ইউ মিন গানের মিটার? ওঁদের কাছে গানের মিটার আর কিলোমিটার এক। কোনও তফাত নেই।'

তবুও কী এমন সব কথায় সুর দিয়ে যেতে হবে? জানতে চাইলে বলতেন, আগে এত ব্যস্ত থাকতাম যে আমার গান আমি নিজেই ভাল করে শোনার সময় পেতাম না। এখন এই সুযোগটা পাচ্ছি। এটাই আমার আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই এখনও জেনেশুনে ওসব গানের সুর করে যাচ্ছি।'

উত্তরটাই কেমন বেসুরো ঠেকে না কি? তবে যে মানুষ অগণন সৃষ্টিতে একসময় ঘর ভরিয়েছেন, তাঁর কোন উত্তর নিছক বেসুরো বললেই পরিত্রাণ মেলেনা।

একটা বড়ো মনের পরিচয়ের কথা পাঠকের কাছে পেশ করা যাক। একবার একটা ছবির গানের বাজেট রেকর্ডিং-এর কারণে বেড়ে যায়। ছবির পরিচালক বা প্রযোজক কেউই বাড়তি টাকা নিয়ে আসেননি। মাঝে মাঝে এমনটা হয়। মিউজিসিয়ানদের বোঝাপড়া মেলাতে সময় লেগে যেতে পারে। উপায় আছে উদ্ধারের। অনেকেই হামেশা করে থাকেন। দু'চারজন মিউজিশিয়ান কমিয়ে দেন। ফলে যোগবিয়োগ করে টাকা ঠিক থেকে যায়। পঞ্চম এমন পরামর্শ পেয়েও গ্রহণ করেননি। সব মিউজিশিয়ানদের রাখতেন। নিজে টাকা কম নিতেন।

পঞ্চমের সুর করা অনেক গান ক্যাসেটে আজও বন্দী হয়ে রয়েছে। কেউ কেউ গচ্ছিতের মালিকানা নিয়েও চাপান উতোর করছেন। ১৯৯১ সালে প্রথমে পঞ্চমের হার্ট অ্যাটাক হয়। ঐ বছরেই লণ্ডনে গিয়ে বাইপাস সার্জারি করেছিলেন। খাওয়া দাওয়ার নানা বারণ ছিল।

কেউ নেই পাশে। কে বারণ করবে? অনিয়ম চলতই। ১৯৯৪ সালের ৩রা জানুয়ারি শক্তি সামন্তের বাড়িতে খেতে যান। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরে আসেন। ভোর দেড়টায় বুকে ব্যথা! ঠিক তিনটে চল্লিশ মিনিটে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আশা ভোঁসলে তখন আলাদা থাকেন। খবর পেয়ে পৌঁছেছিলেন। চিকিৎসকেরাও সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি কারও অধীনেই ছিল না। শেষ বিদায় জানাতেই হয়েছে। মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়েসে এই মৃত্যু আমাদের মেনে নিতে ইচ্ছে করেনি। তবু আমরা তাঁর সুরের অনায়াস চলনের কথা ভুলতে পারিনা। কতো গুণের অধিকারী ছিলেন। খেতে ভালোবাসতেন যেমন, রাঁধতেও পারতেন খুব ভালো। চমৎকার মাউথ অর্গান বাজাতেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'বোম্বাই কা বাবু' ছবির গানগুলিতে তিনি মাউথ অর্গান বাজিয়েছেন। সেই গান কার না মনে পড়ে? 'হ্যায় আপনা দিল তু আওয়ারা।' 'পিয়াসা' ছবি তৈরি হয় যখন, পঞ্চমের বয়েস এমন কি? প্রথম হিন্দি ছবিতে সুর দিলেন। অভিনয়ও করেছিলেন, 'তিসরি মঞ্জিল' রাহুলকে ভিন্নতর স্রষ্টার জগতে পৌঁছে দিয়েছিল। আজ শচীনকর্তা নেই। পঞ্চম নেই। আর কেউই নেই। থাকলে তাঁদের জীবনের আরও নানা কথা আমরা জানতে পারতাম। তবে ইতিহাসে অনুসন্ধানী চরিত্র মাঝে মাঝে দেখা যায়। ওঁরা আরও বেশি ইতিহাস তুলে এনে দুই সংগীত স্রষ্টার মাধুর্য বাড়িয়ে তুলবেন, বলতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

বাংলা ও হিন্দী চলচ্চিত্রে শচীনকর্তার সুরারোপিত গান

১৯৩৭	—	রাজগী
১৯৪০	—	রাজকুমারের নির্বাসন
১৯৪২	—	জীবন সঙ্গিনী
১৯৪৩	—	ছদ্মবেশী
॥		মাটির ঘর
১৯৪৪	—	অভয়ের বিয়ে
॥		মাটির ঘর
॥		জজ সাহেবের নাত্নী
॥		অশোক
॥		স্বামী-স্ত্রী
১৯৪৬	—	শিকারী
॥		এইট ডেজ
॥		দো ভাই
১৯৪৭	—	দিল কা রাণী
॥		চিতোর বিজয়
১৯৪৮	—	বিদ্যা
১৯৪৯	—	কমল

১৯৪৯		শবনম	
১৯৫০	—	অফসর	হিন্দী ও বাংলা
॥		মশলা	হিন্দী ও বাংলা
॥		সমর	হিন্দী ও বাংলা
॥		প্যার	হিন্দী ও বাংলা
১৯৫১	—	বাজী	
॥		বাবর	
॥		বুজদিল	
॥		এক নজর	
॥		নও জোয়ান	
॥		সাজা	
১৯৫২	—	জাল	
॥		লাল কুনওয়ার	
১৯৫৩	—	আরমান	
॥		বাবলা	
॥		জীবনজ্যোতি	
॥		শাহনশাহ	

১৯৫৪ — অঙ্গার
|| চল্লিশ বাবা এক চোর
|| রাধা কৃষ্ণ
|| ট্যাক্সি ড্রাইভার
১৯৫৫ — দেবদাস
|| হাউস নং ৪৪
|| মদ্‌ভরে নয়ন
|| মুনীমজী
|| সোসাইটি
১৯৫৬ — ফানটুশ
১৯৫৭ — মিস্ ইণ্ডিয়া
|| নও দো গ্যারা
|| পিয়াসা
|| পেইংগেষ্ট
১৯৫৮ — চলতি কা নাম গাড়ি
|| কালাপানি
|| লাজবন্তী
|| সিতারোঁ সে আগে
|| সোলবা সাল
১৯৫৯ — ইনসান জাগ উঠা
|| কাগজ কা ফুল
|| সুজাতা
১৯৬০ — আপনা হাত জগন্নাথ
|| বোম্বাই কা বাবু
|| বেওয়াকুফ
|| এক কে বাদ এক
|| কালাবাজার
|| মঞ্জিল
|| মিয়া বিবি রাজী
১৯৬২ — বাত এক রাত কী
|| ডাঃ বিদ্যা
|| নটি বয়

১৯৬৩ — বন্দিনী
|| মেরি সুরৎ তেরী আঁখে
|| তেরে ঘর কে সামনে
১৯৬৪ — বেনজীর
|| জিদ্দী
|| কয়েসে কহুঁ
১৯৬৫ — গাইড
|| তিন দেবীয়াঁ
১৯৬৭ — জুয়েল থীপ্
১৯৬৯ — আরাধনা
১৯৭০ — জ্যোতি
|| প্রেমপূজারী
|| ইসক্ পর জোর নহী
|| তালাশ
১৯৭১ — শর্মিলী
|| নয়া জমানা
|| গ্যাম্বলার
|| তেরে মেরে সপনে
|| জিন্দগী জিন্দগী
১৯৭৩ — জগনু
|| ছুপা রুস্তম
|| ফাগুন
|| অভিমান
|| অনুরাগ
|| ইয়ে গুলিস্তা হামারা
|| উস পার
|| সাগিনা
১৯৭৪ — প্রেম নগর
|| চুপকে চুপকে
|| মিলি
১৯৭৫ — বারুদ
|| চৈতালী

---

* এই তালিকায় 'ছবি মুক্তি পাওয়ার বছর' উল্লেখ করা হয়েছে। 'ছবি নির্মাণ' সেই বছর বা তার আগের কোন বছরেও হতে পারে।

শিল্পী যখন শচীনকর্তা ঃ হিন্দুস্থান রেকর্ডের তালিকা

এইচ ১১ — ডাকলে কোকিল
এই পথে আজ এস

এইচ ২১ — বধূ এলো মধুরাতে
তুমি তো বধূ এলে না

এইচ ৫১ — ও কালো মেঘ বলতে
এই কাননের ফুল নিয়ে

এইচ ১২০ — স্বপন না ভাঙ্গে যদি
আজ রাতে কে

এইচ ১৩৭ — যদি দখিনা পবন
আলো ছায়া দোলা

এইচ ১৩৯ — ঝুলনে ঝুলিছে শ্যামরায়
বইব না আর উজান

এইচ ১৯৮ — প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে,
মন দুখে মরিব

২২৪ — কণ্ঠে তোমার দুলবে
এই মহুয়া বনে

২৬৬ — ওরে সুজন নাইয়াঁ
নিশীথে যাইও

২৯৩ — স্বপনে দেখেছে গিরিরানী
বিদায় দাওগো মোরে

৩০৫ — তুমি নি আমার বন্ধু
বন্ধু বাঁশী দাও মোর

৩৩৯ — বল বল বল বধূ
জাগার সাথী মম

৪১২ — মম মন্দিরে এলে কে
নতুন ফাগুন যবে

৫২৫ — তোমারি সাথে সুরে
পরদেশে কেন গো

৫৮৮ — ওরে বন্ধুরে মনের কথা
সাজে নওল কিশোর

৬২৭ — তুমি যে ছিলে মোর
জাগো মম সহেলী

৬৫৮ — তুমি যে গিয়াছ
প্রেম যমুনার পাড়ে
৭০৬ — চম্পক জাগো জাগো
কাঁদিব না ফাগুন গেলে
৭৩০ — মেঘ ঝরে যায়
ছিল মাধবী রাতি গো
৭৫০ — বুঝি আমার প্রাণ যায়
আমার মিলন মালাটি
৮৩১ — প্রেমের সমাধিতীরে
আমি ছিনু একা
৮৩৯ — কুহু কুহু কোয়েলিয়া
মেঘলা নিশি ভোরে
৮৮৯ — প্রিয়া আজো নয়
গোধূলির ছায়া পথে
৯২২ — তাজমহল
চলো চলো
৯৩০ — অবোধ মেয়ে
কি মায়া লাগলো চোখে
৯৪৬ — বাঁশরীয়া রে
আমার কি হলো
৯৬৯ — চোখ গেল চোখ
পদ্মার ঢেউ রে
৯৮১ — উদাসীরে বিদেশীরে
কে যেন কাঁদিছে
৯৯৭ — মলয়া চল ধীরে
কোকিলারে গেও না
১০০১ — ধীরে সে যানা বাগিয়ানমে
কোন্ নগরিয়া যাওরে
১০১৫ — জনম দুখিনী সীতা
বাংলার মেয়ে
১০৪৬ — কথা দাও, দাও সাড়া
মধু বৃন্দাবনে
১০৫৫ — যবে অলোকের ফুল
ফিরে গেছি বারে বারে
১০৬৮ — বন্দর ছাড়ো
নতুন উষার সৈনিক
১০৮৬ — কাল সাগরের
শ্যামরূপ ধরিয়া
১০৯৪ — পীলে পীলে
শ্যাম শুনো মেরে
১০৯৯ — ললিতা মরমি
পিয়া সনে মিলন পিয়াস
১১৪৫১ — ফুলের বনে যাক ভ্রমর
কে যাবি বল বৃন্দাবনে
১১৪৬১ — নয়ন মোর দরশ
প্রীতমে হয়ে বদনাম
১১৪৯৪ — ঝন ঝন ঝন মঞ্জীর
পোহালো রাতি জাগিয়া
৫৪৮ — অব মৈয় শরণ তুমারী
মেরে প্রীতম পেয়ারে
৫৫৩ — গৌররূপ দেখিয়া হয়েছি
পিঞ্জরায় পাখীর মত
১১২১৯ — রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে
তুমি শ্যামের বাঁশী
১১১১৬০ — প্রিয় রজনীগন্ধাবনে
ধিক ধিক তোর এ জীবনে
১১৭৯ — বালম্ মুঝসে রুঠকে
মেরে যৌবন কি
১২০১ — ভুলায়ে আমায় দুদিন
কে আমারে পিছু ডাকে
১২১১ — রিম ঝিম রিম ঝিম
নয়না কা

১২১৬ — গায় যে পাপিয়া
আজ দোল দিল কে
১২৩১ — ফুল গেঁদুয়া না মারো
তুম হে বড়ে চিত্‌চোর
১২৯৯ — কোন আলেয়ারে বন্ধু ভাবি
বধূগো এই মধুমাস
১৩২০ — গুণধাম আমাদের
নীরবে আঁখি জলে ভরে
১৩২১ — গুণধাম আমাদের
দেশকী জনতা তুমহে
১৩২৮ — এই চৈতী সন্ধ্যা যায় বৃথা
কেন হায় স্বজন ভাঙ্গায়
১৩৪০ — প্রেম যমুনায় হয়ত কেউ
হায় কি যে করি মন নিয়া
১৩৪৮ — বাঁশী তোমার হাতে
কে দিল ঘুম ভাঙ্গায়ে
১৪৩৮ — মরমিয়া রে উদাস
বাসরের ফুল গেল যে

শিল্পী যখন শচীনকর্তা ঃ এইচ. এম. ভি. রেকর্ডের তালিকা

৪৫ এন ৮৩৫৪৩	—	সেকি আমার দুশমন দুশমন্
		কি করি আমি কি করি
৭ ই পি ই ১০৮৭	—	গানের কলি সুরের ডুরিতে
		সুবলরে বলো বলো
		শোন গো দখিনা হাওয়া
		বর্ণে গন্ধে ছন্দে
৭ ই পি ই ১১২৮	—	বিরহ বড় ভাল লাগে
		ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা
		রাতের আতরে ভিজাইয়া
		কালসাপে দংশে আমায়
ই সি এল পি ২২২৮	—	বাজে না বাঁশী গো
		আমি পথ চেয়ে রব
		মালাখানি ছিল হাতে
		আঁখি দুটি ঝরে হায়
		আজো আকাশেরও পথ
		শ্রীমতি যে কাঁদে

মন দিল না
তুমি নেই আর কে
সেই যে দিনগুলি
ঝিলমিল ঝিলমিল
বাঁশী শুনে আর
ও জানি ভোমরা
ই সি এল পি ২৩২৭ — তুমি যে গিয়াছ
যদি দখিনা পবন
তুমি তো বধূ জানো
কাঁদিব না ফাগুণ
প্রেম যমুনার পারে
প্রেমের সমাধি তীরে
আলোছায়া দোলা
নিশীথে যাইও ফুলবনে
মধু বৃন্দাবনে
রঙ্গিলারে
ঝন ঝন মঞ্জীর বাজে
আমি ছিনু একা
৪৫ এন ৮৩৪৯৮ — না আমারে শশী চেয়ো না
রাধার ভাবে কালা হইলা গোরা
তাকডুম তাকডুম
কে যাস রে ভাটিগাঙ গাইয়া

শিল্পী যখন শচীন কর্তা ঃ এইচ. এম. ভি. ক্যাসেটের তালিকা

অবিস্মরণীয় শচীন দেববর্মণ

STHV 842461

SM 942004*

বাজে না বাঁশি গো ; মালাখানি ছিল হাতে ; আজও আকাশের পথ বাহি ; মন দিল না বঁধু ; তুমি আর নেই সে তুমি ; সেই যে দিনগুলি ; ঝিলমিল ঝিলমিল ; ও জানি ভ্রমরা।। ঘুম ভুলেছি ; বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে ; বনে ফাগুন, মনে আগুন ; কে যাস্ রে ভাটি গাঙ বাইয়া ; বাঁশি শুনে আর কাজ নাই ; আঁখি দুটি ঝরে হায় ; আমি সইতে পারি ; দূর কোন পরবাসে।

***শিরোনাম ঃ 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই'**

গোল্ডেন আওয়ার

STHV 843242

বাজে না বাঁশি গো ; আমি পথ চেয়ে রব ; মালাখানি ছিল হাতে ; আজও আকাশের পথ বাহি ; সেই যে দিনগুলি ; ঝিলমিল ঝিলমিল ; মন দিল না বঁধু ; তুমি আর নেই সে তুমি ; ও জানি ভ্রমরা কেন ; দুর কোন পরবাসে ; বনে ফাগুন মনে আগুন ; শ্রীমতী যে কাঁদে ; শোন গো দখিণ হাওয়া ; বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে , বিরহ বড় ভালো লাগে ; তাক্‌দুম তাক্‌দুম বাজাই ; কে যাস্ রে।

চয়নিকা

ক্যাসেট নং ১

STHV 842644/47

বাজে না বাঁশি গো ; মালাখনি ছিল হাতে ; আজও আকাশের পথ বাহি ; মন দিল না বঁধু ; তুমি আর নেই সে তুমি ; সেই যে দিনগুলি ; ঝিলমিল ঝিলমিল ; ও জানি ভ্রমরা।। ঘুম ভুলেছি ; বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে ; বনে ফাগুন, মনে আগুন ; কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া ; বাঁশি শুনে আর কাজ নাই ; আঁখি দুটি ঝরে হায় ; আমি সইতে পারি ; দুর কোন পরবাসে।

ক্যাসেন নং ২

না না আমারে শশী চেওনা ; গানের কলি সুরের ডুরিতে ; রাতের আতরে ; টাকডুম টাকডুম বাজাই ; শ্রীমতী যে কাঁদে ; যে না জানে বিরহের মানে ; কথা দিয়ে এলে না ; গৌররূপে দেখিয়া হইয়াছি পাগল।। তুমি এসেছিলে পরশু ; কালসাপে দংশে আমায় ; নিটোল পায়ে ; বিরহ বড় ভাল লাগে ; ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা ; আমি পথ চেয়ে রব ; শোন গো দখিন হাওয়া ; কি করি আমি কি করি।

ক্যাসেট নং ৩

আলো ছায়া দোলা, নিশীথে যাইও ফুলবনে ; মধু বৃন্দাবনে ; রঙ্গিলা রে ; ঝন ঝন ঝন ঝন মঞ্জীর ; আমি ছিনু একা ; ও কালো মেঘ বলতে পারো।। তুমি যে গিয়াছো ; যদি দখিনা পবন ; তুমি তো বন্ধু জানো ; কাঁদিব না ফাগুন গেলে ; প্রেম যমুনার পারে ; জাগো মম সহেলি গো ; প্রেমের সমাধি তীরে।

ক্যাসেট নং ৪

ওরে সুজন নাইয়া ; প্রেম যমুনায় হয়ত ; বঁধু গো এই মধুমাস ; গোধূলির ছায়াপথে ; মলয় চল ধীরে ; চোখ গেল চোখ গেল ; মেঘলা নিশিভোরে।। তুই কি শ্যারে বাঁশি ; হায় কি যে করি ; প্রিয় আজও নয় ; মম মন্দিরে এলে কে ; কথা কও দাও সাড়া ; কুহু কুহু কোয়েলিয়া ; পদ্মার ঢেউ রে।

বর্ণে, গন্ধে ছন্দে, গীতিতে

STHV 842273

না না আমারে শশী চেওনা ; বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে ; গানর কলি সুরের ডুরিতে ; রাতের আতরে ; টাকডুম টাকডুম বাজাই ; শ্রীমতী যে কাঁদে ; যে না জানে বিরহের মানে ; কথা দিয়ে এলে না।। তুমি এসেছিলে পরশু ; কালসাপে দংশে আমায় ; নিটোল পায়ে ; বিরহ বড় ভাল লাগে ; ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা ; আমি পথ চেয়ে রব ; শোন গো দখিন হাওয়া ; কি করি আমি কি করি।

মিউজিক অফ এস. ডি. বর্মণ

একটি সুর দুটি গান, ৪র্থ খণ্ড

SPHO 842977

রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা রে। শচীন দেববর্মণ ; আন মিলো আন মিলো—'দেবদাস'। মান্না দে ও গীতা দত্ত ; মন দিল না বঁধু। শচীন দেববর্মণ ; জানে কেয়া তুনে কহী—'পিয়াসা'। গীতা দত্ত ; ঘুম ভুলেছি নিঝুম নিশীথে। শচীন দেববর্মণ ; হাম বেখুদী মেঁ—'কালাপনি'। মঁহম্মদ রফি ; ও জানি ভ্রমরা। শচীন দেববর্মণ ; জানি তুম তো ডোলে—'ডঃ বিদ্যা'। লতা মঙ্গেশকর।। আলো ছায়া দোলা। শচীন দেববর্মণ ; পবন দিওয়ানে না মানে—'ডঃ বিদ্যা'। লতা মঙ্গেশকর ; বাঁশি শুনে আর কাজ নাই। শচীন দেববর্মণ ; নিদ চুরায়ী চেন চুরায়ে—'অনুরাগঞ্জ। লতা মঙ্গেশকর ; আমি ছিনু একা। শচীন দেববর্মণ ; তেরে বিন শুনে নয়ন হামারে—'মেরি সুরত তেরি আঁখে।' লতা মঙ্গেশকর ও মহম্মদ রফি।

মিউজিক অফ এস. ডি. বর্মণ

একটি সুর দুটি গান, ৫ম খণ্ড

SPHO 842990

শোন গো দখিন হাওয়া। শচীন দেববর্মণ ; খাই হ্যায়রে হামনে কসম। লতা মঙ্গেশকর ; বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে। শচীন দেববর্মণ ; ফুলোঁ কে রংগ্ সে। কিশোরকুমার ; গানের কলি সুরের ডুরিতে। শচীন দেববর্মণ।। মেহবুবা তেরি তস্‌বির। মহম্মদ রফি ; কে যাস্ রে ভাটি গাঙ বাইয়া। শচীন দেববর্মণ ; শুনরি পবন। লতা মঙ্গেশকর ; না আমারে শশী চেওনা। শচীন দেববর্মণ ; যা যা যা। কিশোরকুমার।

শিল্পী যখন শচীন কর্তা ঃ এইচ. এম. ভি. কমপ্যাক্ট ডিস্কের তালিকা

গোল্ডেন আওয়ার

CD NF 142228

বাজে না বাঁশি গো ; আমি পথ চেয়ে রব ; মালাখানি ছিল হাতে ; আজও আকাশের পথ বাহি ; সেই যে দিনগুলি ; ঝিলমিল ঝিলমিল ; মন দিল না বঁধু ; তুমি আর নেই সে তুমি ; ও জানি ভ্রমরা কেন ; ঘুম ভুলেছি ; বাঁশি শুনে আর কাজ নাই ; দূর কোন পরবাসে ; বনে ফাগুন মনে আগুন ; শ্রীমতী যে কাঁদে ; শোন গো দখিন হাওয়া ; বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে ; বিরহ বড় ভালো লাগে ; টাকডুম টাকডুম বাজাই ; কে যায় রে।

দি ইনকম্‌পেয়ারবে্‌ল্‌ শচীন দেববর্মণ

CD NF 142020

বাজে না বাঁশি গো ; আমি পথ চেয়ে রব ; মালাখনি ছিল হাতে ; আঁখি দুটি ঝরে হায় ; শ্রীমতী যে কাঁদে ; মন দিল না বঁধু ; তুমি আর নেই সে তুমি ; সেই যে দিনগুলি ; ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ; বাঁশি শুনে আর কাজ নাই ; ও জানি ভ্রমরা কেন ; ঘুম ভুলেছি ; বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে ; বনে ফাগুন মনে আগুন ; টাকডুম টাকডুম বাজাই ; শোন গো দখিন হাওয়া ; কে যাস্‌ রে ভাটি গাঙ বাইয়া ; বিরহ বড় ভালো লাগে ; আমি সইতে পারি ; তুমি এসেছিলে পরশু ; না না আমারে শশী চেয়ো না ; দূর কোন পরবাসে।

এক নজরে শচীনকর্তার জীবনপঞ্জি

জন্ম ঃ অক্টোবর ১, ১৯০৬, কুমিল্লা, ত্রিপুরা

পরিবার ঃ বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মণ, মা নিরুপমা দেবী। পাঁচ ভাই, চার বোন। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শচীন দেববর্মণ।

ছাত্রজীবন ঃ ইউসুফ স্কুল
পঞ্চম শ্রেণী থেকে কুমিল্লা জিলা স্কুল
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা
ম্যাট্রিক পাশ ঃ ১৯২০ সাল
আই. এ. পাশ ঃ ১৯২২ সাল
বি. এ. পাশ ঃ ১৯২৪ সাল

কলকাতায় আগমন ঃ ১৯২৪ সাল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি ঃ ১৯২৪ সাল

পড়া ছেড়ে দেন ঃ ১৯২৫ সাল

১৯২৫ সাল ঃ কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু।
পরে বদল খাঁ ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

বেতারে প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন ঃ ১৯২৬/২৭ (আনুমানিক)

১৯৩০ সাল ঃ	বাবা নবদ্বীপচন্দ্রের জীবনাবসান ঘটে।
১৯৩২ সাল ঃ	'হিন্দুস্থান মিউজিকাল প্রডাক্টস'-এ প্রথম রেকর্ড করেন। এক পিঠে 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই' (গীতিকার ঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়) উল্টো পিঠে 'এই পথে আজ এসো প্রিয়া কোরোনা আর ভুল' (গীতিকার ঃ শৈলেশ দত্তগুপ্ত)
১৯৩৪ ঃ	এলাহাবাদে অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ।
১৯৩৫ ঃ	ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সাথে একই সম্মেলনে ঠুংরী পরিবেশন করেন।
১৯৩৮ ঃ	কুমিল্লা হাইকোর্টের জজ সাহেব কমলনাথ দাশগুপ্তের দৌহিত্রী শ্রীমতি মীরা ধরগুপ্তের সাথে পরিণয়।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা ঃ 'রাজগী' প্রথম ছবি। মোট তেরোটি বাংলা ছবিতে সুর দেন। প্রথম হিন্দী ছবি 'শিকারী'।

১৯৩৯ ঃ	২৭ জুন একমাত্র সন্তান রাহুল দেববর্মণের জন্ম।
১৯৩৯ ঃ	'সুরের লিখন' সঙ্গীত পুস্তিকা রচনা করেন।
১৯৩৯-৪০ ঃ	ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান। লোকসঙ্গীত শাখার সভাপতি ছিলেন।
১৯৪৩ ঃ	কলকাতায় বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ। উদ্বোধক রবীন্দ্রনাথ। সভাপতি মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আলাউদ্দিন খাঁ ছিলেন।
১৯৪৪ ঃ	মুম্বাইতে চলে যান। 'ফিল্মিস্তান' এর সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরপর বেশ কয়েকটি 'নবকেতন' প্রযোজিত ছবিতে সুরদান করেন।
১৯৪৭ ঃ	'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ' এ রেকর্ড শুরু।
১৯৫৩/৭৪ ঃ	ফিল্ম-ফেয়ার পুরস্কার (ট্যাক্সি ড্রাইভার/অভিমান)।
১৯৫৮ ঃ	সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার।

১৯৫৯ : 'পিয়াসা' ছবিতে সুরারোপের জন্য 'এশিয়াড ফিল্ম সোসাইটি' পুরস্কার অর্জন।

১৯৬২ : হেলসিঙ্কি. ফিনল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক।

১৯৬৪ : 'ক্যায়সে কঁহু' ছবিতে সুরদানের জন্য সুরশৃঙ্গার সংসদ্ কর্তৃক 'সন্ত হরিদাস' পুরস্কার প্রদান।

অভিনয় : 'ছদ্মবেশী', 'ছায়া'।

কলকাতায় বাড়ি : ১এ বসন্ত রায় রোড, গানের স্কুল 'সুরমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন।
১০, হিন্দুস্থান রোড, কলকাতা।
সাউথ এণ্ড পার্কে নিজের বাড়ি তৈরি করেন।

নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা : 'সতীতীর্থ', 'জিপসী'।

প্রয়াণ : ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৫



এই ছিলেন শচীনকর্তা....

'ত্রিপুরার রাজবাড়ির রাজকুমার হয়ে জন্মেছি প্রাচুর্যের যুগে। বিলাস-ব্যসন, ঐশ্বর্য-বৈভব, শৌখিনতা, আদবকায়দা দেখেছি অফুরন্ত আমাদের বাড়িতে। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গুরুজনেরা আমাদের শৈশব থেকেই সচেতন করে দিতেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে আমরা তাঁদের যারা সাধারণ লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করি। আমি তাঁদের এ আদেশ কোনদিনও মেনে চলতে পারিনি। কেন জানিনা জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালোবাসতাম। আর বড়ো আপন লাগত সেই সহজ সরল মাটির মানুষগুলোকে যাদের গুরুজনেরা বলতেন 'সাধারণ' লোক। যাই হোক, অসাধারণের দিকে না ঝুঁকে আমি ওই সাধারণ লোকেদের মাঝেই নিজেকে নিঃশেষে বিলি:: দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলাম শৈশব থেকেই। আমার এই আচরণ ও স্বভাব রাজপরিবারের কেউ পছন্দ করতেন না।'



এই ছিলেন শচীনকর্তা....

'ত্রিপুরা সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, সেখানকার রাজবাড়িতে রাজা, রানী, কুমার, কুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই গান গায়। গলায় সুর নেই, গান গাইতে পারে না এমন কেউ নাকি সেখানে জন্মায় না। ত্রিপুরার ধানের ক্ষেতে চাষীরা গান গাইতে গাইতে চাষ করে, নদীর জলে মাঝিরা গানের টান না দিয়ে নৌকা চালাতে জানে না, জেলেরা গান গেয়ে মাছ ধরে, তাঁতিরা তাঁত বুনতে বুনতে আর মজুরেরা পরিশ্রম করতে করতে গান গায়। সেখানকার লোকেদের গানের গলা ভগবান প্রদত্ত। আমি সেই ত্রিপুরার মাটির মানুষ—তাই বোধহয় আমার জীবনটাও শুধু গান গেয়ে কেটে গেল।'